পরিবেশক :

ইউনিভার্সাল বুক ডিপো

৫৭ বি, কলেজ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশ :
রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী
বৈশাখ, ১৩৬৮।

প্রকাশক :
ওয়াই মল্লিক
১১০।এ, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা—৭

প্রচ্ছদ শিল্পী :
খালেদ চৌধুরী

মুদ্রক :
আব্দুল আজিজ আলআমান
বঙ্গ আজাদ প্রেস
১২, বলাই দত্ত ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং

বাইণ্ডার :
মিনি বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্

দাম পাঁচ টাকা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

ইলিশ মারির চর

এই লেখকের আর একটি বই

॥ বুভুক্ষা ॥

আষাঢ়ের অমাবস্যার গভীর রহস্য-ভরা কোটালের মুখেই নাম্‌লো আকাশ। হুড় হুড় গুড় গুড় শব্দ। মুষল ধারে নেমেছে বর্ষা। বিদ্যুতের তলোয়ার চিরে-ফেড়ে দিচ্ছে সারা আকাশটাকে মুহূর্তে মুহূর্তে। ঝাপ্‌টা এসে আছড়ে পড়েছে বার বার বিষম আক্রোশে। পাক্‌ খেতে খেতে ফুলে ফুলে দুলে দুলে ছুটেছে জোয়ারের ঘোলা পানি। হুড় হুড় খল্‌ খল্‌ শব্দ চারদিকে। পাড় ভেঙে পড়ছে কোথাও ঝপাং করে'। বিদ্যুতের আলোয় দ্যাখা যায় ইলিশের জাল ফেলে ভাসতে থাকা কালো কালো নৌকো গুলো। দ্যাখা যায় ওপারের গাছপালার বৃষ্টি-ভেজা শুদ্ধ কালো রেখাটা। মাঝে মাঝে সট্‌ সট্‌ করে' জল্‌তে থাকে বয়ার মাথার লাল আলো গুলো। পুব পারের বুক জুড়ে অনেকটা দূর পর্যন্ত জ্বলে বিরলা কোম্পানির চটকলের আলোর মালা। বিরাট ঐরাবতের মতো দুটো শুঁড় আকাশে তুলে আছে জেটিঘাটের ওপরে দুটো ক্রেন। জেটির পাশে ভিড় করে' আছে কতকগুলো পাট-কয়লা-বওয়া লঞ্চ আর গাদা বোট। কার-খানার বাবু সাহেবদের মনোরম কোঠাবাড়ী। এদিকে পাঁচটা চিম্‌নী-ওয়ালা লালরঙা পাওয়ার হাউসের ঘর। তারপর তিন ফুটকে পোলের পাশের হাট বাজারের দোকানপাট। আরো দক্ষিণে পুঁটে মাঝির খোল, কালী মন্দিরের চুড়ো, খেজুর আর ফণী মনসার ঝোপ। নল খাগ্‌ড়া আর শরখড়ির একটানা কালো রেখা। এক ফটুকে পোলের ধাপে ধাপে সেই মাঝ রাতের গহিন অন্ধকারে ছেঁড়া ছাতা বা তালপাতার পেখে মাথায় দিয়ে বসে আছে পাজারী মেয়েপুরুষেরা কখন ভাঁটা পড়লে জাল উঠ্‌বে—তার অপেক্ষায়। তারপর বিরাট একটা অংশ জুড়ে বুক-শিউরে-ওঠা ধ্বস্‌ নাম্‌ছে প্রতি বছরে বছরে, ইলিশ মাঝির চরের বুকে এগিয়ে চলেছে ধান জমিকে গ্রাস করতে করতে। পোর্ট কমিশনের হাজার শক্ত বাঁধুনিকেও সে ভ্রূক্ষেপ করেনা। এই ভাঙা চরের মাঝখানে আছে পাঁচটি

খেজুর গাছ ঘেরা সবুজ ঘাসওয়ালা একখণ্ড জমি। গ্রীষ্ম বর্ষা সারা বছরই সেখানে বসে থাকে কোপ্‌নী-আঁটা প্রায় উলঙ্গ এক মেড়ুয়া সন্নীসী—ধুনি জালিয়ে। পুঁটে মাঝির খোলের ওখানটাতেই আবার শ্মশান ঘাট। লোকে বলে সন্নীসী মড়ার মাংস খায়। শ্মশানটা ভেঙে না-পড়াই যে তার মাহাত্ম্যের প্রকাশ তা সবাই জানে বলেই সন্নীসীর পোয়া বারো। ফল মূলটা আর গাঁজাটা জোটে তার।

ইলিশ মারির চরের ঘাটের মুখে দোকানপাট, ভাঙা ফুটো নৌকো, অশথ গাছের সারি, কাছারী, হাট, টালিখোলার কারখানা, 'ষাতে'র মেলা বসবার বিরাট শূন্য চর; একটু ভেতরের দিকে চওড়া কাঁচা রাস্তার পাশে ডাকঘর, আবগারী পুলিশের ফাঁড়ি, গাঁজা মদ আফিমের দোকান, তারপর আছে গরু ছাগল নিয়ে ঘরসংসার পেতে বসা শরীর বিলাসিনীরা। তিন কটুকে স্লুইস্‌ গেটের পাশে যেখানে বাজার বসে সেখানেও থাকে চারটি। নেই শুধু বিরলার নতুন বাজারের আশে পাশে। সেখানে ঘুরে বেড়ায় রাজ্যের কাবুলীর দল। ইলিশ মারির চরের আসল মানুষরা হলো জেলে। তাদের পাড়াটা একটু ভেতরের দিকে—ঝাঁকবন্দী বাড়ী। গাব গাছের ভিড়। তল্‌লা আর বাশ্‌নী বাঁশের ঝাড় চারদিকে। জাল শুকোবার ভারা। জালে গাবের কষ্‌ দেবার গাম্‌লা বসানো বাড়ীর সামনে। চোঙ্‌ খোলার ছাওয়া হুম্‌ড়ি-খাওয়া কুঁড়েঘর। ভাঙা ফুটো নৌকো আছে উপুড় হয়ে সারার অপেক্ষায়। সারা গাঁয়ে 'শুকৃটি' মাছের উৎকট গন্ধ। ইলিশের মরশুমে পাড়া মাৎ করে ভাজা ইলিশের গন্ধে। পুরুষরা তখন বেঁটিয়ে চলে যায় গাঙে। প্রৌঢ়া আর বুড়োরা যায় ইলিশের বাজ্‌রা মাথায় নিয়ে পাজারী হয়ে গঞ্জে হাটে বাজারে। যুবতী বৌয়েরা থাকে ঘরে, কখন জোয়ার শেষ হলে তাদের মদ্দমানুষরা মদ গিলে মহিষা-সুরের মূর্তি নিয়ে ফিরবে কে জানে। তাদের ঠাণ্ডা করতে হয়। নাকাল হয়ে পড়তে হয় তাদের উৎকট ফুর্তি সামলাবার বেলা। ট্যাঁক ভর্তি ওদের টাকা। চোখ দুটো কুঁচের মতো লাল। হাতে দেড়সের সাতপোয়া ওজনের কাজল-গৌরী ইলিশ। এ-মাছ তারা কিছুতেই বেচবে না। ঘরের মাগছেলেয়া খাবে। দারুণ তার আস্বাদ। তেল বেরোয় কল্‌ কল্‌ করে। তবে দশ বারোটা জাল আর নৌকো খাটছে যার, সেই মহাজনের

আলাদা। তাকে দিতে হয় সবকিছু। মাছ, টাকা, মান, ইজ্জৎ, মায় জীবন পর্যন্ত। সে-রকম মহাজনই বা ক'জন আছে সারা ইলিশ মারির চরে? মাত্র দু'জন। তারিণী মাঝি আর ভরব-দি মাঝি। এক-জন হিন্দু আর একজন মুসলমান। তাদের বখরা জাল নৌকোর ভাড়া হিসেবে আড়াইটা। বাকিটা দাঁড়ি মাঝিদের। চারটে মাছ পাও, মহা-জনের আড়াইটা, বাকিটা হবে সাড়ে তিন বখরা; দু'জন দাঁড়ির দু'বখরা, একজন মাঝির দেড় বখরা। মহাজনের হাত দিয়েই হবে সে-ভাগ বাঁটোয়ারা। কোন্ বছরে কিরকম মাছ হয় বিধাতা জানে। সবই ভাগ্যের ব্যাপার। বদর গাজি আর বরুণ দেবের মানত পুজো দিয়েই জালে যায় ওরা। মাছ বেশী পড়লে দাম কম হোকনা, তাতেই পোষায় বেশী। নইলে মাছ 'আক্কারা' হলে হাঁড়ি শিকেয় ওঠে—আশায় আশায় মহাজনের দোকানে চলে যায় থালা ঘটি বাটি; ধরে আমাশা, পেটের অসুখ, ইন্-ফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া। টো টো করে' জাল ফেলে রোদে রোদে ঘোরাই সার হয় তখন। কিন্তু এ-বছরে বুঝি বাবা বদর গাজি আর বরুণ ঠাকুরের দয়া হবে! ঢল নেমেছে আষাঢ়েই—বর্ষণ শেষে শুরু হয় ইলশে গুঁড়ি।

গদাখালির মাল্লা মাঝিরা ইলিশ মারির চরের লোকদের সঙ্গে এখন আর তেমন দহরম মহরম দেখিয়ে কথা বলে না। নৌকোর পাশ দিয়ে নৌকো যাবার সময় বিষ চোখে তাকায়।

বলে, "কে হে, কার নৌকো?"

উত্তর দেয় জোয়ান বয়সের ডাকা-বুকো জয়নদ্দি মাঝি, "কেন হে, বখরা চাই নাকি?"

ওরা আর কথা বলে না। আবার হেঁকে বলে জয়নদ্দি, "দেখো হে, জাল। সেমলে, ভরব-দি চাচার জাল, চেনোতো তাকে?"

ওরা সুর বদলে বলে, "গঙ্গা মায়ের দয়ায় কেমন হচ্চে বলো।"

"তোমাদের?"

"মন্দ নয়, উ-বারে চৌত্তিশটা হয়েচে।"

"মোদেরও ল'গোণ্ডা একটা।"

"ই-মোরশোমটা বোধ হয় ভাল যাবে!"

"সে-কথা যাক্ শালা,—মাল-টাল আছে কিচ্ছু ?"

ওরা হাসে। বৃষ্টির ঝাপটার শব্দে কি যেন বলা কওয়া করে শোনা যায় না। ক্রমে ক্রমে ওরা দূর থেকে দূরে সরে যায়।

কানাই বলে, "শালারা ক'গোণ্ডার কথা বললে র‍্যা জয়নদ্দি ?"

হরেন একটু বাড়িয়ে বলে, "তিন কুড়ি সাড়ে তিন গোণ্ডা।"

কানাই বলে, "সে এ্যাগন নয় চাঁদ, উ-শালার বাপ-দাদার আমলে ছ্যালো।"

জয়নদ্দি বলে, "মুইও বলে' দিইচি তেমনি !...আয় বাবা আয়—আরো জোরে আয়—আগাশ ভেঙে পড়। দোহাই বাবা বদর গাজি, যেন দয়া পাই তোমার !" তারপর আস্তে বলে, "ও কেনো, বোধ হয় শালা গেঁতেচে আজ বেশী রে ! ত্যাখ 'সেতে' হাত ঠেকিয়ে।"

'সেতে' অর্থাৎ জালের মূল দাড়িটাতে হাত দিয়ে পরখ করে কানাই আর হরেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। সাড়া বোঝে।

জয়নদ্দি বলে, "বোতলটা শেষ করি আল্লার নাম করে'। যা হয় হবে। শালা, মাহাজন তরব-দি চাচার বৌয়ের কাছে মোর গয়না গুনো কড়ারি বন্ধকে সব গেল ! আল্লা যেত্তি মুখ তুলে চায় দেনা খালাস করে' আর ক'টা গয়না ছেড়িয়ে লিজেই একটা লৌকো করবো উ-বছরে। কানাই-হরেন তোরা থাক্‌বি চেরকাল মোর লৌকোয়। জালটা তো তৈরি হয়ে এলো পেরায় !"...

রাত তখন বোধ হয় দুটো। ভাঁটার টান পড়েছে গাঙে। বৃষ্টি ধরে গেছে। কালো মেঘে ঘুঁটে আছে গোটা আকাশটা। একটা তারারও ত্যাখা নেই। গভীর স্তব্ধতায় ডুবে আছে গহিন রাত। জাল টান্‌তে শুরু করেছে জয়নদ্দিরা। সমস্ত আশায়ের চিজ্ এখনো ডুবে আছে পানির তলায়। কি আছে, কি পড়েছে, কে জানে !

তিনজনে জাল টেনে তুলছে নৌকোয়। ভাঁটার টানে ওরা ভেসে চলেছে দক্ষিণে। জাল উঠ্‌তে উঠ্‌তে হয়তো পৌছবে গদাখালির ঘাট ছেড়ে নলদাড়ির গঙ্গায়। সেখান থেকে পাড়ি মেরে ফিরে আস্‌বে আবার ইলিশমারির চরে কিংবা তিন কটুকে পোলের কাছে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে নিরাশ হয়ে পড়ে ওরা। প্রা আদ্দেক জাল উঠে এসেছে—একটা মাছেরও দেখা নেই।

জয়নদ্দি বলে, "সে-কি হে, নেশা যে ছুটে যাবার কল্! কুতু সুমুন্দি টোট্কা করলে নাকি! নাকি, বাসি গায়ে নৌকোয় উঠিচিস্ কেউ?"

কানাই বলে, "ঐ শালার কাজ তাহালে, বৌ সোমত্ত আছে, যেন"...

"এই রে, একটা, দুটো, পাঁচটা এক জায়গায়—দে বাবা বদরগাজি, স'পাঁচ আনার বাতাসা মানসিক কনুনু"...আবেগে আনন্দে কাঁপ্তে থাকে জয়নদ্দির গলা। পাঁচটা মাছ উঠেছে নৌকোয়। তারপর আর নেই। শূন্য জাল। একেবারে শেষে ওঠে গোটা দশেক। সব মিলিয়ে হয় পনেরোটা। মুখ আর পিঠের দাঁড়া লাল, পেটের মাঝখান দিয়ে লম্বা কালো রেখাওয়ালা কাজল-গৌরী পড়েছে মাত্র একটা। কালকে প্রথম জালে একটাও পড়েনি ও-মাছ। প্রথম মাছটা মহাজনকেই দিতে হবে। নইলে কে নেবে আর কার মন খারাপ হবে? মাছ রাখ্তে হয় যে-যার বখরার রাখুক্।

ওরা ইলিশমারির চরের ঘাটেই নৌকো ভিড়োলে। জ্যান্ত মাছগুলো আছাড় কাছাড় খাচ্ছে নৌকোর খোলের মধ্যে। অন্ধকারের জীবগুলো কে জানে কোথা থেকে যেন নিমিষেই মন্ত্রবলে ছুটে এলো আড়বাঁধির ওপর থেকে একেবারে নৌকোর কাছে। মেয়েমানুষও আছে কতকগুলি। দর-দস্তুর করে ওরা; জয়নদ্দি যেন চেনে না এখন ওদের কাউকে। অন্যমনস্ক হয়ে থাকে আর হুঁকো টানে।

একটা পাজারী মেয়ে বলে, "মিন্‌ষে যে কথাই কয়নে রে! বলি কত্‌কে হবে—কত্‌কে হলে মন উঠ্‌বে?"

জয়নদ্দি বলে, "তিন টাকা সের, লেবে?"

"পঞ্চাশ ট্যাকা কুড়ি দাও তো লিই, সের দরে পারবো নিকো।"

"সেদিন আর নেই লো বুবু! সেদিন গয়ায় গ্যাচে। ত্যাখন লোকে বল্‌তো 'দাড়ি মাঝির পরনে ট্যানা, আর পাজারী মাগীর কানে সোনা!' একটা মাছে তুমি আড়াই টাকা লেবে আর বেচ্‌বে কত্‌কে? এক সের পাঁচ-পো'র কম তো মাছ নেই।"

"তিন ট্যাকা সের দরে নিলে আমাদের কি লাভ থাকবে? এই 'সাড়া' 'আড়' জেগে তোমাদের আশায় মুখ চেয়ে বসে আছি, 'তা'পর এক হাঁটু কাদা-দোড় ভেঙে ছুটতে হবে সারাদিন কোথায় কুন্ হাট-বাজারে—আমাদের 'মুয়ে'র পানে তোমাদেরও চাইতে হবে।"

জয়নদ্দি রাজি নয়। আরো কয়েকজন এসে দরদস্তুর করে। শেষে নৌকো নিয়ে চলে আসতে যায় তিন কটুকে গোলের দিকে। সেখানেও না সুবিধে পায় সকালে বিরলাপুরের বাজারে বসে বেচ্‌বে হরেন কি কানাই যে-হোক্। নৌকো ছেড়ে দিলে পদী পাজারিণী চিল্লাতে থাকে, "ও মাঝি, যেউনি, ফেরো। শুনে যাও একটা দর, তোমার দরই 'অইলো'!"

আবার নৌকো ভিড়োয় জয়নদ্দি। ঝাঁকা নিয়ে কাছে আসে পদী। তার হ্যারিকেনের আলোতে বিড়ি ধরায় হরেন। কানাই তাকায় পদীর চেহারাটার দিকে। শক্ত বাঁধুনি আছে মেয়েটার। কুচ্‌কুচে কালো। সাদা সাদা গোল গোল দুটো চোখ। মাথায় কোঁচ্‌কানো খোলা চুলের রাশি ঝাঁপিয়ে পড়েছে পিঠ বেয়ে পাছা পর্যন্ত।

জয়নদ্দি বলে, "লও, টাকা ফ্যালো। তিন কুড়ি টাকার দরে।"

"ইঃ! মিন্‌ষের হাঁকাই ছেড়ে থাঁকাই দর! ঐ পঞ্চাশ ট্যাকা, যা বলনু এগ্যে।" চোখের মোহিনী বান ছাড়ে পদী পাজারিণী, বেসামাল করে গায়ের কাপড়। আলো অন্ধকার নিয়ে বাতাসে দোল খায় হ্যারিকেনের আলোটা। জয়নদ্দি একবার তাকায় ওর দিকে যেন কেমন চোখে।

বলে, "না গো পদ্মরাণী, মেয়ে মানুষের পয়লা যৈবনের দাম যেমন, মোদের এই পয়লা মাছের দামও তেমনি!"

চোরা চাউনী হেনে অদ্ভুত এক ভঙ্গি করে' পদী বলে, "মিন্‌ষে যেন এক 'সক্‌বো'! হয়েচে, তোলো মাছ!"

ওর ঝাঁকাটা ধরে সঙ্গের বুড়ী মতো মেয়েটা। হরেন মাছ তোলে একটা একটা করে'। অগাধ পানির মাছ উপরে এসে মারা গেল কতক্ষণের মধ্যেই আছাড় কাছাড় খেয়ে।

পদী বলে, "মোটে চোদ্দটা?"

"হাঁ হাঁ, দাম কষো। দও, দু'কুড়ি দু'টাকা।"

পদী নাইকোঁচড়ের গিঁট্ খুলে টাকা বার করে' গুণতে থাকে কতক্ষণ ধরে'। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে কানাই চুপ করে'। বাতাসে নাচ্‌তে উড়তে থাকে পদীর মাথার চুল গুলো।

"নাও, ধরো।"

জয়নদ্দি টাকা নিয়ে গুণে ত্যাখে আড়াই টাকা হিসাবে চোদ্দটার দাম পঁয়ত্রিশ টাকা দিয়েছে।

বলে সে, "পদ্মরাণী মেয়েমানুষ হলে কি হবে, মোদের মতন বিশটা মদ্দকে নাকে দড়ি দিয়ে নাচাতে পারে! দও, টাকা দ্যালো।" হাত বাড়িয়ে দেয় জয়নদ্দি পদীর উদ্ধত বুকটার কাছে।

গলায় অনুনয়ের সুর এনে পদী বলে, "আর পারবোনি দাদা, নক্ষী দাদা, তোর পায়ে ধরি!"

ওর সঙ্গের বুড়ী মেয়েটা বলে, "দে ধম্মের বাবারা, আমরা হনু 'ওজে'র খদ্দের! অতো কামড় কল্লে কি চলে?"

পদী চট্ করে' টেনে তুলে নেয় মাছের বাজরাটা। ফিরে পড়ে পালিয়ে আস্তে গেলেই খপ্ করে' আঁচলটা চেপে ধরে জয়নদ্দি। একটান মেরে কাছে এনে কর্কশ গলায় বলে, "ভাতার-কেলে মাল না? ফ্যাল্ মাগী, মাছ রেখে যা।"

হঠাৎ যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে পদী। আঁচল ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, "মিন্‌ষের ব্যাভার ত্যাখ্! মারে বুঝিন্! ধর মাসি আলোটা, তুলে ধরতো এট্টু! ট্যাকার 'পিচেশ' মিন্‌ষেরা! নাও, এই চার ট্যাকা, ধরো!"

"দ্যালো আর দু'টাকা।" বলে জয়নদ্দি। "আমার বাবা-কেলে জাল নয়, নৌকো নয়।"

"বাবারে বাবা! গলায় পা তুলে দিয়ে মেরে ফেল্‌বে! নাও, আর একটা ট্যাকা।"

"আর একটা।" নরম হয় না জয়নদ্দি।

"আর পারবোনি!" ঝাঁজিয়ে উঠে বলে পদী।

ওর কানের ওপরে মুখ এনে তার সঙ্গে নিকে সেঁধোবার কথাটা বলে জয়নদ্দি ফিস্ ফিস্ করে' হেসে হেসে। পদী চোখ পাকিয়ে চোরা হাসি মাখিয়ে বলে, "দূর ওলাউঠো!"

ঝপাৎ ঝপাৎ করে' ওরা পানি ভেঙে চলে গেল। পদীর মাথায় ইলিশের বাজরা। তার মাসির হাতে হ্যারিকেন। তাদের বড় বড় চারখানা পায়ের আর দেহের ভূতুড়ে কালো ছায়াটা পৃথিবী ছাড়িয়ে দুলতে দুলতে যেন আকাশ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছচ্ছে। জয়নদ্দি তাকিয়েছিল একটু অন্যমনস্ক হয়ে।

কানাই বললে, "পদ্মরাণী না কাল-নাগিনী !"

জয়নদ্দি বলে, "হুঁ !"

চরের ওপর থেকে হেঁকে বলে কে যেন, "মাছ আছে নাকি হে—ও মাঝি !"

"না হে—ভায়রা ভায়ের শ্বশুরের ছওয়াল !" শ্যালক সম্বন্ধের কথাটা অবশ্য একটু আস্তে বলে কানাই।

জয়নদ্দি বলে, "লে চল্। লৌকোয় কে থাকবি ?"

"হাঁ, এখন আবার এ্যার লোক এসে থাক্‌বেখন।" বলে হরেন আগে-ভাগেই ; পাছে বলে তাকে, তুই থাক্।

"জাল যেত্তি চুরি যায় ?" শংকিত হয়ে বলে জয়নদ্দি। চারদিকে জমাট অন্ধকার। টান খেয়ে কল্ কল্ শব্দে সাগরের দিকে ছুটে চলেছে ভাঁটার পানি। চুপ করে' বসে-দাঁড়িয়ে থেকে মুখ চাওয়া-চায়ি করে তিন জনে।

জয়নদ্দি বলে, "হরেনের ঘরে সোমত্ত বৌ। ওকে রেখে গেলেই বা ভরসা কিসের ? মোরা গেলেই উ-শালা পালাবে ! কানাই, তুই থাক। চ', এগ্যে দু'গেলাস 'সাদা পানি' টেনে লিইগে উড়ের পাশি খানাটা থেকেন্। মাছটা হাতে করে' লে হরেন, সুমুদ্দির বাপকে দিয়ে যেতে হবে।"

ওরা নেমে পড়ে নৌকো ছেড়ে। নৌকোটাকে ভাল করে' বেঁধে রেখে চর ছেড়ে উঠে এসে আড়বাঁধির ওপরের তালপাতার ছাউনী-দেওয়া ছোট্ট কুঁড়ে ঘরটাতে ঢোকে। হ্যারিকেনটাতে জোর দিয়ে হাই ভেঙে উঠে বসে উড়ে তাড়িওয়ালাটা। ভিজে মাটিতে থেব্‌ড়ে বসে পড়ে ওরা তিন জনে।

জয়নদ্দি বলে, "ঢালোদিনি চাচীর বাপ, কড়া মাল থাকে তো এক ঝাঁপা।"

কানাই শুধোয়, "চাট নেই কিচ্ছু ?"

উড়েটা বলে, "ছোলা সেদ্ধ আছে।"

"দও, ভাই দও শালা, প্যাটের জ্বালা মেটাই এখন। 'ঝাঁপা'তে কুলোবে, না হয় এক 'ডাব্‌রি' দও।"

উড়েটা একটা কলাপাতায় চাট্টি ঝাল কট্‌কটে ছোলা সিদ্ধ ঢেলে দিয়ে এক পোয়া কাঁচের গ্লাসে করে' তাড়ি ছেঁকে দেয় ওদের প্রত্যেককে। পাৎলা দুধ-ঘোলা গাঁজা-কোটা কড়া গন্ধওয়ালা তাড়ি। খায় হাসে আর অসংলগ্ন কথা বলে তিন জনে। পাশিওয়ালাকে যত খারাপ গালই দাও ও শুধু হাসবে

উদার ভাবে। কথায় বলে 'শুঁড়ির নেই কান আর মুচির নেই নাক'। কুড়ি গ্লাস তাড়ির ডাব্রি ভাঁড়টা শূন্য হলে ট্যাঁকের সাতটা পাক্ খুলে টাকা বার করে জয়নদ্দি। বলে, "কতো দাম হলো চাচীর বাপ?"

"চোদ্দ আনা।" বলে উড়েটা।

হঠাৎ আকস্মিক ভাবেই উড়েটাকে একটা থাব্ড়া মারতে যায় জয়নদ্দি, "দোব শালাকে এক থাপ্পোড়!"…আর অমনি ভয়ে ধপ্ করে' বসে কাত হয়ে পড়ে উড়েটা। অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে ওরা তিনজনে।

জয়নদ্দি বলে, "শালা গলাকাটা হচ্চিস্ বাংলা দেশে এসে। দশ আনার তাড়ি, ক'আনার পানি রে শালা? চার আনার ছোলা এই ক'টা তোর বাপ দেখেচে? আচ্ছা লে—একটা টাকাই লে। দোয়া কর! কাল যেন বেশী মাছ পড়ে। নৌকোর দিকে চোখ রাখিস্।"

পাশিখানা থেকে বেরিয়ে মাছটা হাতে নিয়ে হরেন কানাই আর জয়নদ্দি তিনজনেই বাড়ী চলে আসে। অন্ধকারে চল্‌তে চল্‌তে উদ্দাত্ত স্বরে জয়নদ্দি 'সংগীত' আরম্ভ করে। পা তখন তাদের টল্‌ছে। পথ ক্রমে হয়ে উঠ্‌ছে যেন অসমতল। সে গাইছে:

"আর খাবো না তালের তাড়ি
নামাজ বয়ে যায়,
নামাজ বয়ে যায় গো চাচা
নামাজ বয়ে যায়॥
তালের তাড়ি খেলে পরে অঙ্গ ঘুরে যায়।
যে ব্যাটা রাখলে দাড়ি সে বলে হারাম তাড়ি
ল্যাঠা বাধায় পুলুশ ফাঁড়ি
ফুর্তি করা দায়।—
আর খাবোনা তালের তাড়ি
চাচা নামাজ বয়ে যায়॥"…

জয়নদ্দি বলে "হাঁ র‍্যা ঐ, নেশা হয়েচে তোদের?—মাছটা বাঁধি ভাঁড়া—পড়ে যাবে কোথা!" বসে পড়ে জয়নদ্দি। অন্ধকারে হাৎড়ে হাৎড়ে মাছের কান্‌কোর ভেতর দিয়ে গামছার একটা খুঁট ঢোকাতে চায় আর বলে, "কইরে শালা, তোর গাল কই?"

হরেন হাঁ করে' বলে, "এই যে!"

হঠাৎ হেসে মাটিতে গড়াগড়ি খায় জয়নদ্দি। তারপর হাসি থাম্লে মাছটা হাৎড়ায় তিনজনে। গেল কোথায়? ভূতে নিল নাকি? কানাই বলে, "এই যে শালা, বাইতে ছ্যালো গজায়। ধরে কোমরে বেঁধিচি, গামছার ভেতরে করে'।—চ' এবেরে।"

ওরা চলেছে, টলে টলে, অন্ধকারভরা রাস্তায় আছাড় কাছাড় খেতে খেতে। ব্যাঙেরা ডেকে চলেছে একটানা ঐকতানে। বাবলা ঝোপের গভীর অন্ধকারে বিচিত্র শোভায় মিটমিট করে' জ্বলছে লক্ষ লক্ষ জোনাকী। পনেরো মিনিটের পথ আসতে ওদের প্রায় ঘন্টাখানেক লেগে যায়। নিজেদের দোর গোড়ায় এসে চ্যাঁচায় জয়নদ্দি, "মা দোর খোল্।"

"ফিরলি বাবা এত্খনে? রাত যে পুইয়ে গেল একদম। 'আজান সুয্য'র তারাটা পচ্চিম দিগে একাবারে হেলে পড়েচে—'ঝুজ্কো' (ভোর) হয়ে এলো বলে' কথা।" কথা কইতে কইতে জয়নদ্দির মা বুড়ী বাঁশের বাঁখারীবোনা আগড়ের দোরের হুড়কো বেড়াটা খুলে দেয়। দোরটা ঠেল্লে খড় খড় করে' শব্দ হয়। কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে' ওঠে পাশের বাড়ীতে। কানাই-য়ের কথা শোনা যায় তার বাড়ী থেকে: "ভাত নেইতো আমড়া খাবো র‍্যা শালী? গরুর চামড়ার মতন শুক্‌নো শুধু রুটি কুন্ শালা খেতে পারে এখন ছিঁড়ে ছিঁড়ে?"

কানাইয়ের বৌয়ের গলা শোনা যায়: "আমরা বোধহয় 'পরমান্ন' করে' খেয়ে আছি? তাড়ি ঢুকিয়ে নেশা করে' এসে এবেরে চ্যাঁচাতে শুরু করেচে।"

কানাই কি যেন বলে আর শোনা যায় না। গুম্ গুম্ করে' কিলোচ্ছে নাকি বৌকে?

জয়নদ্দির বৌ ওঠে। আলো জ্বালে। মাথার চুল গুলো দু'হাতে সাম্‌টে খোঁপা বাঁধে। তারপর খেজুর পাতার চাটাই চাপা দেওয়া হাঁড়িকুড়ি গুলো খুলে ভাত 'থসাতে' বসে। জয়নদ্দি একটা ডিবরী হাতে নিয়ে যায় গা হাত ধুতে পুকুর ঘাটে। এসে খেতে বস্লে, বুড়ীমা বলে, "মাছ পড়ে ছ্যালো হাঁ-র‍্যা জয়নু?"

জয়নদ্দি বলে, "মোটে পনেরোটা।"

বুড়ী বলে, "কি জানি বাবা, ত্যাখন তোর বাপ জালে যেতো, মাছ বেচে ফিরতে বেলা আটটা-ন'টা বেজে যেতো। মাছ পড়তো জালে 'ঝাঁক্সি' গাঁথা হয়ে। টেনে তুলতে পাত্তুনি নাকি। টাকায় একবার ষোলটা মাছ গেল! লোকের দোরে দোরে জোর করে' ঢেলে দিয়ে আসতো মেছুনী মাগীরা। সেসব মাছ কোথা গেল আজ! লোককে বললে বলবে গল্প কথা! তা নয়, মানুষের পাপে দরিয়ার মাছের 'বরকত'ও খোদা কমিয়ে দিচ্ছে।"

নেশা তখনো ভাল করে' কাটেনি জয়নদ্দির। তরকারীর বাটিতে হাত না দিয়ে মাটিতে হাৎড়ালে বার দুই! ওর বৌ শকিনা শুধু দেখ্‌লে আর হাসলে মনে মনে। এবার ডালের বদলে যখন গ্লাসের পানি ঢেলে নিলে জয়নদ্দি নিজের পাতে না-হেসে উঠে আর পারেনা শকিনা।

জয়নদ্দি বলে, "দের শালা! নিদ ধরেচে মোকে এখন, ডাল না ঢেলে পানি ঢেলে বসে আছি পাতে!"

বুড়ী বিরক্তিতে গজ্ গজ্ করে' ওঠে, "বৌ তুই কি-লা? লজ্জাও পায়নে, হাস্‌তিচিস্ তাই দেখে? মদ্দমানুষ কোত্থেকে খেটে খুটে এলো, যত্ন করে' খাওয়াবি, না···যাহোক্ বাবা ভাল মানুষের মেয়ে—দে-না লো বৌ, পাতে ঢেলে দুলে। মোর মদ্দমানুষকে মুই নিজে হাতে তুলে খেইয়িচি জালে থেকে এলে।"

বৌ শকিনা বলে, "ওর কথা ছেড়ে দওদিনি মা তুমি। নিদ ধরেচে, না, তাড়ি পাগুলে দিয়ে এয়েচে ভাঁড় খানেক! কেন উ-চিজ খেলে কি হয়? ওই 'দিন কতেকের নবর চবর ডাঁড়ি মাঝির কড়ি'!"

বুড়ী বলে, "বৌ তুই অতো মোল্লামুচুল্লির পানা 'বয়ান' ঝাড়িস্‌নি বাবু—মদ্দমানুষদের খাটুনীর শরীল, নেশাভাং না-করলে চলে?"

জয়নদ্দি বলে, "উ-শালী কি তা বুঝ্‌বে?"

খেয়ে উঠে এসে ঘরের মধ্যে শুয়ে পড়ে সে। শকিনা হাঁড়ি পাতিল গুলো ঢাকা-চাপা দিয়ে এসে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে স্বামীর পাশে। ঘুমন্ত ছেলেটাকে আস্তে আস্তে একটু সরিয়ে দেয় দেওয়ালের দিকে। নেশাখোর স্বামীর ঘুম খারাপ। চেপে চুপে মেরে ফেলতে পারে বাচ্চা ছেলেটাকে। সারারাত ধরে' পানিতে ভিজে ভিজে মাছের মতো ঠাণ্ডা করে' এসেছে দেহটা।

শকিনা শুধোয়, "কটা মাছ পড়লো আজ জালে? ক'টাকা পাওনা হবে মোদের?"

"পনেরোটা মাছ পড়লো আজ মোটে। 'কউতি' দেখে মনে হয়ে ছ্যালো বোধ হয় আজ গাঁথ্‌বে অনেক। কাজল-গৌরী পড়ে ছ্যালো একটা, তরবদির জন্তে এনে রেখেচে কানাই। চল্লিশ টাকা আছে মাছ বেচা।"

"সে কতো?"

"দু'কুড়ি।"

"কত পাওনা হবে মোদের?"

"ধরনা ওর আদ্দেক কুড়ি টাকা আর পাঁচ টাকা মাহাজনের। বাকী পনেরো টাকা তিন বখরা।" মনে মনে কতকখন ধরে' হিসেব করে জয়নদ্দি। বাম গুরুমশায়ের পাঠশালের যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ শেখা অঙ্ক গুলো একটু ঝালিয়ে নিলে সে। তারপর বল্‌লে, "পাঁচ টাকা করে'।"

"আর জলপানি?"

"সে এক টাকা তাড়ি খেয়ে ঝেড়ে দিইচি তিনজনে।"

"তবে!" ফুঁসিয়ে ওঠে শকিনা। "মুখে পচা গন্ধ বেরিয়েচে। তাড়ি গাঁজা তামুক মদ আফিং দোক্তা খইনি সিদ্ধি বিড়ি হাল-হারাম কোত্তার গু সব খাবে।"

"খাই আমার রোজগারের পয়সায় খাই, তোকে রোজগার করে' খাওয়াতে হয়?"

"আমার বাঁ পা কেঁদে গ্যাচে! তবে আমার কানের পারশি মাকৃড়ি আর খাডানা গুনো ছেড়িয়ে দও—আরো কদ্দিন সুদ গুণ্‌বে মাহাজনের বৌয়ের কাছে? নাকি আগের সেই গোট, তাবিজ, দড়া, হাঁসুলির মতন সুদের কড়িতে বিকিয়ে যাবে ই-কটাও? বাব্বা, তাহালে উপায় রাখ্‌বো তোমায়।"

"হাঁ হাঁ হবে—সব হবে। ই-বছরে ইলিশের মোরশোম ভাল। গদরগাজি যেত্তি দেয় তো ছাপ্পড় ফাড়কে দেবে। ভাত হবে, গয়না হবে, জাল তো করেই ফেলিচি। আর"...

"বলো বলো, লৌকোও হবে!"

"তা আল্লার মেত্তি মরজি হয়"...

"থাক্ থাক্। ভূতের 'মুয়ে' আর 'লা ইলাহা' শুনে কাজ নেই। নামাজ রোজা করেচ জীবনে কক্ষনো যে আল্লার ভরসা করো?"

"তুই খুব করিস্! লে লে বক্ বক্ করিস্নি—নিদ যেতে দে।"

কেউ আর কোন কথা বলে না। চুপচাপ চারদিক। হাঁড়িকুঁড়ি রাখা বাঁশের মাচাটার মধ্যে ছিট্‌কে ইঁদুরটা খুড় খুড় করে' শব্দ করে। ডালের বড়ি গুলো বয়ে বয়ে নিয়ে পালাচ্ছে নাকি? 'হেই হেই' করে' বার কয়েক তাড়া দেয় শকিনা। ছেলেটা উঠে কাঁদতে আরম্ভ করে। উঠে ওপাশে যাবার সময় স্বামীর পায়ে লাথি লেগে গেলে লজ্জায় জিব কেটে তার পায়ে হাত ঠেকিয়ে সালাম করে' এসে ছেলেকে বুকে টেনে নিয়ে দুধ দেয়।

ঘরের পেছনের পথ দিয়ে গুম গুম্ করে' কারখানার লোক চলেছে এবার। পাতকোয়া ডাকছে কুক্ কুক্ শব্দে। আবার বৃষ্টি এলো ঝম্ ঝম্ করে'। নাক ডাকছে জয়নদ্দির। ঘুম আসেনা শকিনার চোখে। কাঁথাটা এখনো সেলাই করতে রয়েছে অতোখানি, আজ দুপুরের পর একটু বস্‌বে। হরেনের বৌ সিন্ধুর কাছে পাড় চেয়ে রেখেছে, দেবে বলেছে, আজ আন্‌বে গিয়ে। সিন্ধু! মেয়েটাকে বেশ দেখতে! মাগুরে রং। পাছা ঝাঁপানো চুল। কিন্তু চোখের নটিপটি নেই একটুও। খিল্ খিল্ করে' হাসে সদাই। 'চেটো' মেয়ে। ছেলে-পুলে হয়নি এখনো। খালের মুখে কাপড়ের 'ফেটি' পেতে দুপুরে জোয়ার উঠ্‌তে 'কেঁকো' ধরছিল কাল। কাঁকড়ার কচি কচি বাচ্চা, পিঁয়াজ ঝাল দিয়ে পোড়া পোড়া করে' চচ্চড়ি করে' খায় নাকি! সিন্ধু বলে, "খুব ভাল লাগে লো দিদি, একদিন খেয়ে দেখিস্ ভুল্‌তে পারবিনি।"

শকিনা থুথু ফেলে বলেছে, "থো! হারাম চিজ, ঐ নাকি খায় মানুষ! তোদের মুখে আর কিচ্চু বাদ নেই। গেঁড়ি শামুক ক্যাঁকড়া 'জেয়োল' (কাছিম)· সব খাস্।"

"তোরা তেমনি গরু খাস্।"

"সেটা বোধ হয় গোবরের চেয়েও খারাপ জিনিস?"

"ছি! মা গো—! ওয়াক্! থু—থু—থু!"

শকিনার শাউড়ী বল্‌লে, "যার যা রুচি মা। 'আপ রুচি খানা, পর রুচি পরনা'। হিঁদুরা খাসী পাঁটা খায়; গরু ওদের খেতে নেই। মোদের তেমনি উট ভেড়া খাসী গরু মোষ সব খেতে আছে, শূয়োরটা আবার মানা। ওরা

'কেঁকো' খায়, উ-আর কি রকম লাগ্‌বে, 'মেভা' মাছের চচ্চড়ির পানাই লাগ্‌বে। এই যে গলা লিহেড়ে মাছ চচ্চড়ি কল্লে কি রকম লাগে—সেই রকম।"

সিন্ধু মাথা নেড়ে বলে, "হাঁ চাচী, তোমার কথাই ঠিক।"

শকিনা শুধু ছেলেকে মাই দিতে দিতে সিন্ধুর যৌবনমুখর উদ্দাম জোয়ার-ভরা দেহখানার দিকে এক নজরে তাকিয়ে থাকে। ভিজে কাপড়টা এঁটে সেঁটে আছে ওর দেহে। বুক দুটো কি নিটোল আর সুন্দর!, কোমরটা কি সরু! ও যখন চলে পেছনটা কি রকম এদিক ওদিক নড়ে। খঞ্জন চোখে আগুন জ্বলে যেন ধক্ ধক্ করে'। শকিনা ভাবে, তারও কি ছিল না একদিন অমনি? দেহভরা যৌবন। মন ভরা আকাঙ্ক্ষা। দীর্ঘশ্বাস ফ্যালে শকিনা। স্বামীর গায়ে হাত দেয়। তারপর মাতৃস্নেহের আদরের মতো স্বামীর বুকে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। ঘুমে ঘুমেই ঘুরে শোয় জয়নদ্দি। বিড় বিড় করে' কি যেন বলে। স্বপ্ন দেখ্‌ছে। বুকের মধ্যে শকিনা চেপে ধরে তাকে। ঝম্ ঝম্ করে' আরো জোরে বৃষ্টি আসে। বাইরের দাওয়া থেকে ভাঙা ভাঙা কথা শোনা যায় শাউড়ীর—"আর ই-পানির ঝট্‌কায়···গেল সব ভিজে পয়মাল হয়ে···মাঝখান্‌টাতেও পানি পড়ে পড়ে ভিজে ঢেউ হয়ে গ্যাচে কতখানি! একে 'ধুপ' (রোদ) হয়নে রে বাবু···'খ্যাতার' (কাঁথার) মড়া পচা 'গোন্দ'··· মুখ লুকুনে মিন্‌ষে আমার ঘর ছেয়ে গ্যাচে? চোঁং খোলা···খেয়েচে আর ফুর্তি উড়িয়ে মরেচে—একশো টাকা হলে এক কুট্‌রী টিনের ঘর হয়ে যেত ত্যাখন্··· বাপ-কেলে জমিটুকু গেল, লৌকো গেল, জাল গেল, গরু গেল···আভাগীর বেটা মোর ভাল লোক ছ্যালো"···

ঘস্-স্-স্-স্···করে' বিছানার খেজুর-পাতা-বোনা চাটাইটা দাওয়ার মাঝামাঝি টেনে আনে বুড়ী। শকিনা জানে, শোবে না এখন আর উনি। বসে থাক্‌বে দেওয়াল ঘেঁষে। বক্ বক্ করবে একাই পুরোনো দিনের সব কথা মনে করে'। আকাশে বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে। গুড় গুড় গুড় গুড় করে' ডাক্‌ছে আকাশ। বান বজ্রে নাব্‌বে নাকি! খেজুর-আঁটি কুঁচোচ্ছে বুড়ী দাঁতি দিয়ে কট্ কট্ শব্দে। পান খাবে এবার। দোক্তাও খেতে পারে বটে!

সাড়ে চারটের ভোঁ হয় বিরলা জুট মিলের। কলের লোক চলেছে হড় হড় করে ছুপ্' দাপ শব্দে ঘরের পেছনের পথ ধরে'

কানাইয়ের বৌ—মালতীর মা লক্ষ্মী, এক সের চাল, চারটে আলু, দু'ঝিনুক নুন, আর এক শিশি ছাঁচি তেল ধার নিয়ে গ্যাছে আজ পনেরোদিন হবে। দেবার নাম নেই। কাল আবার সাঁজের বেলা এয়েচে, 'দিদি এক বাটি চাল ধার দেবে? মিন্‌ষে জাল থেকে এসে কিছু খেতে পাবে নে।'—"চাল নেই"—স্পষ্ট বলে' দিয়েছে শকিনা। আর দিলেই বা কি! ভাল ঢেঁকি ছাঁটা চাল নিয়ে গিয়ে দেবে তো পুরোনো গচ্‌পড়া মোটা কোটে কাঁকরওলা চাল: ভাবা পচা গন্ধ। হয়তো একসেদ্ধ আউশ। মন্দটা, চার পাঁচটা ছেলে, বাপ আর বৌটাকে নিয়ে নাকাল হয়ে পড়েছে। দেনায় ডুবে আছে মহাজনের কাছে। বৌটা যায় তরবদির চরকা ঘুরোতে। জাল বুনে দিতে। গাবের কষ্‌ দিতে জালে। কিংবা শুকটি মাছের বোঝাগুলো সাঁজের বেলা ঢেলে শিশিরে দিয়ে এসে আবার হাড় কন্‌কনে সেই শীতের ভোরে যেয়ে বস্তাবন্দী করে' দিয়ে আসে। নয়তো গোয়াল কাড়া—ঘুঁটে দেওয়া—খড় কুঁচোনো। সিন্ধুটাও যায় ওর সঙ্গে কখনো সখনো। তবে কাজকাম করে না। যায় বাজার হাট করতে তরবদির দোকানে। এমনি ইচ্ছা করে' তরবদির বৌয়ের এক আধটা ফাই-ফরমাস শুনেও আসে। কেন যায় তা কি আর বুঝতে বাকি আছে শকিনার। মালতীর মা বলে, "চোখের কি কোনো চামড়া আছে দিদি ওর। মন্দ যায় জালে আর উ-যেন পাঁয়চারি করে' বেড়ায় সাত গাঁ। আর হাসেনের বাপের সাথে কি ইয়ারকি—ঢলাঢলি। আধবুড়ো মাহাজনটাও তেমনি।"...

"কে জানে বুন! খোদা জানে কার মনে কি আছে!" বলে শকিনা। হাজার কথায় ভেজালেও ভেজেনা শকিনা। চাল দেয়না সে। দিলে দেবে কোত্থেকে? তাছাড়া তাদেরও তো এমন কিছু নেই যে 'ঝোর' (নালা) দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

তবু বলেছিল লক্ষ্মী, "আটা থাকে তো দু'টিন দও নাহলে, কাল দিয়ে যাবো। ছেলেমেয়ে শুনো শুকিয়ে রয়েচে—আর বুড়ো শশুরটা মোটে খিদে সইতে পারেনে—খুন্ খুন্ করে' কাঁদে।"

শকিনা আর কিছু বলে না। ঘরের ভেতর থেকে আটার হাঁড়ি বার করে' এনে আটা মেপে দেয় দু'টিন।

লক্ষ্মী বলে, "আর দু'টিন দিবি দিদি—দিলে বড্ড ভাল হয়!"

তাও দেয় শকিনা। শুধু বলে, "গম ভাঙানো আটা। কণ্টোলের কেনা আটা দিলে লুবুনিকো।"

"আচ্ছা। কাল গম তুলে ভাঙিয়ে দিয়ে যাবো দিদি।" চলে গেল লক্ষ্মী। বড় দুঃখী মেয়েটা। দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে শকিনার। উঠে পড়ে এবার সে। ভোরের আলো ফুটে উঠেছে চারদিকে।
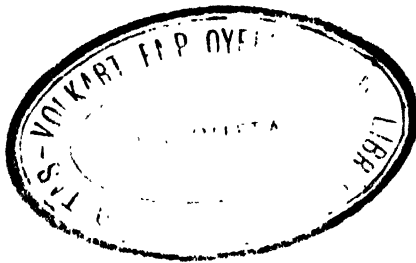
অনেকটা বেলা হলে বাসি মড়ার মতো মুখ করে' ওঠে জয়নদ্দি। কানাই আর হরেন ডাকছে তাকে মহাজনের কাছে হিসেব আর টাকা দিতে যাবার জন্যে। শকিনা বস্‌তে জায়গা দিয়েছে ওদের দুজনকে একটা থলে বিছিয়ে। জয়নদ্দির মা ছেলেটাকে কি যেন খাওয়াচ্ছে আদর করে' করে' দাওয়ার একদিকে।

জয়নদ্দি লাল কুঁচের মতো চোখ দুটো রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে বলে, "মাছটা পেঠিয়ে দিইচিস্ তো সকালে?"

কানাই বলে, "মালতী দিয়ে এয়েচে যেয়ে।"

বিরক্ত হয়ে বল্‌তে বল্‌তে ঘাটের দিকে মুখ ধুতে যায় জয়নদ্দি, "ষোল বছরের সোমত্ত মেয়েকে শালা পাঠাস্ কেন মাহাজনের বাড়ীতে—নিজেরা যেতে পারিস্‌নি?"

কানাই মাথা গোঁজে বোধ হয় লজ্জায়। শকিনা তার দিকে তাকিয়ে নেয় একবার।

বুড়ী বলে, "হাঁ বাবা কানাই, তোর মেয়েটাকে এবেরে বিদেয় করবার যোগাড় ভাখ। বড্ড কেলা-গাছ-পানা হয়ে' উটেচে।"

"কোন্ দিকে কি করি চাচী, এমনি দিন এনে দিন খেয়ে কুলোয়নে—তার আবার বে'!"

"উ-কথা বললে কি চলে বাছা"—বলে জয়নদ্দির মা—"দেনাপাত্তি করেও বিয়ের কয়তে হবে। উ-তো ঘরে রাখবার চিজ নয় যে ঘরে থাকবে দু' দশ বচ্ছর। মেয়ে হলো বাপের মাথায় বাজ। উ পড়বেই এক সময়। আর যে দিন-কাল পড়েচে—ভয় হয় বাবা।"

জয়নদ্দি এসে বলে, "তা সেই গদাখালির নন্দ হাজরার ছেলেটার সাথে দে-না, ছেলেটাকে তো দেখিচিস্?"

"ট্যাকা কোথা? দু'শো ট্যাকা পণ চায়। জেলের ছেলে, গাঁজে ভাঁড় টেনে খায়, সে আবার সোনার আংটি, বোদাম, পা-গাড়ী সাইকেল চায়! তাহালে কোথেকে পারবো? আছিপুরের সেই মেধো মাঝি আমার জামাই হতে চায়—মালতীকে তার খুব পসন্দ। কিন্তন হলে কি হবে, মালতীর মায়ের অমত।"

হরেন বলে, "কেন?"

"বরের বয়েস অনেক। আমার বাবার বয়েসী হবে বোধহয়! মাথার চুল পেকে গ্যাচে। তবে বুড়োটার নিজের নৌকো জাল আছে। পাঁচ বিঘে ধান-জমি আর দু'কুটুরী টিনের ঘর আছে।"

জয়নদ্দির মা বলে, "না বাবা, বুড়ো বরে মেয়ে দিস্নি। হাজার থাক্ তার। মেয়ের সুখ হবেনে। আহা, অমন মেয়েটা!"...

গেঞ্জিটা গায়ে চড়িয়ে গামছাটা কোমরে বেঁধে নিয়ে জয়নদ্দি বলে, "চ-' সব।" ছেলেটাকে কোলে নিয়ে একটু নাচায় হাসায় তারপর মায়ের কাছে দিয়ে দেয় তাকে। ছেলে কিন্তু হাত বাড়ায় বাপের সঙ্গে যাবার জন্যে। বলে, "দাবো!"

শকিনা বলে, "যাওনা ছেলেটাকে নিয়ে—একটু ঘুইরে নিয়ে এসো না।"

"দে তবে—দে তো মা—পক্ষীরাজের ঘোড়াটাকে কাঁধে করে' ঘুইরে নিয়ে আসি মাহাজনের বাড়ী থেকে।"

ছেলেকে কাঁধে নিয়ে 'বাকুল' থেকে তিনজনে বেরিয়ে যাবার সময় জয়নদ্দির গায়ে প্রায় একটা ধাক্কা মেরে দিয়েই ঢোকে এসে হরেনের বৌ সিন্ধু।

জয়নদ্দি ছিল পিছনে, তাই ওদের চোখ এড়িয়ে যায়। জয়নদ্দি হাসে মনে মনে। উত্তর দেয় না কোনো কিছু। কিন্তু একটুখানি গিয়ে হঠাৎ বলে সে, "এইরে! হরেন, ধরতো খোকাকে, আসল চিজ্ যে ফেলে এইচি,—টাকা!"

হরেন জয়নদ্দির ছেলেটাকে নিলে জয়নদ্দি চলে আসে আবার বাড়ীতে।

সিন্ধু এসে বসেছে দোলাতে। হাতে তার রঙিন পাড়। শকিনা রান্না করছে। জয়নদ্দির মা খেজুর-চাটি বুন্‌তে বসেছে।

জয়নদ্দি বলে, "শকি, টাকাটা কোথায় রাখলি র‍্যা?"

শকিনা বলে, "টাকা তো দিলে! ঐ তো তোমার ট্যাকে খোঁসা রয়েচে।"

"এ্যাঁ! হাঁরে! তাইতো!"

আড় চোখে তাকিয়ে একবার কটাক্ষ হানে সিন্ধু। অর্থ তার যেন এই যে কেন এসেছ তুমি তা আমার আর জান্‌তে বাকি নেই।

জয়নদ্দি চলে যাবার সময় একটু মুচ্‌কি হেসে বলে শকিনা, "ছাখো আবার কোনো কিছু ফেলে গ্যালে নাকি!"

দোরগোড়ায় একবার থম্‌কে দাঁড়ায় জয়নদ্দি।

সিন্ধু বলে, "মনটা ফেলে রেখে যাচ্চে 'বেন' (বেয়ান) তোমার কাছে—তাই টান পড়তেচে মাঝে মাঝে বেই মশায়ের।"

"আমার আর কি আছে যে মন টান্‌বে? না, 'বেন'কে দেখে টাকা কোথা বলে' খুঁজ্‌তে আসার একটা ছুতো। মদ্দমানুষদের মুই চিনিনি, একটা ছেলের মা হয়ে গেনু।"

দোরের বাইরে এসে কথাটা শুনে লজ্জা পেয়ে পালিয়ে আসে জয়নদ্দি।

কাছে এলে কানাই বলে, "পনেরোটা মাছের কথা বল্‌বি, না দশটা বল্‌বি?"

"উঃ!" কানাইয়ের মুখের দিকে একবার তাকায় জয়নদ্দি। তারপর কিছু না বলে' মাথা হেঁট করে' চল্‌তে থাকে। এক সময় বলে, "বেইমানী যে-শালা করবে মোর কাছে থাক্‌লে তার পোষাবেনে।— হ্যাঁ র‍্যা বেই, তোর বউটার পরনে দেখনু লাল পেড়ে একটা নীল শাড়ী। আবার রাঙা টক্‌টকে একটা বেলাউজ গায়ে। কবে কিনে দিলি র‍্যা?"

হরেন উত্তর দেয়, "ওর বড় বোনাই নাকি দিয়ে গ্যাচে কাল সৈঁজের বেলা।"

"শালা যাত ছ্যালো!"

"না, দিয়েই নাকি চলে গ্যাচে। অনেক কাজ তার। কাপড়ের দোকান আছে। এমনি দেখতে এয়ে ছ্যালো শালীকে।"

"হুঁ!" বলে গম্ভীর হয়ে চল্‌তে থাকে জয়নদ্দি। পথের পাশের বন থেকে ফুল-সমেত লবঙ্গ লতার একটা ডগা ছিঁড়ে দেয় হরেন জয়নদ্দির খোকাকে। ভাটার টানে গাঁয়ের দিকে কুল্ কুল্ করে' ছুটে চলা খালের ঘোলা পানিতে রাজ্যের জেলের ছেলেমেয়েরা 'কেঁকো' ধরছে সাঁকোটার নীচে। খালের দু'পাশে হরকোচ বন। গেঁয়ো, বনঝাঁমা আর তে-কাঁটালের জঙ্গল। সাঁকো পেরিয়ে এলে একটা বালিয়াড়ী পতিত জায়গা। বনঝোপ ঘেরা। বুনো বেত উঠেছে করমচা গাছের মাথায়। তার পাতায় পাতায় বাসা বেঁধেছে লাল পিঁপড়েরা। তারপর বাঁশবন। তল্‌লা, বাঁশ্‌নী। গেঁটে তেল্‌কো আর জাওয়া এক আধ ঝাড়। একদিকে অনেকখানি বস্তি নেই। বিশ বিঘের পুকুরটার ধার দিয়ে পথ। চারদিকে ঘাটে ঘাটে মেয়েরা। গলা খাঁকারী দেয় জয়নদ্দি। রাস্তায় কাদা কোথাও শুক্‌নো, কোথাও আবার এক হাঁটু। অবশেষে ওরা এসে পৌঁছোয় তরবদি মাঝির বাড়ীর সামনে। মুদী দোকানে লোকজনের ভিড়। একটা কাৎ করা নৌকো সারছে দু'জন মিস্ত্রি। গোয়ালের গরুগুলো বাইরে বার করে' বাঁধছে তরবদি মহাজন। খাটো চেহারা। মুখে 'কপ্‌চানো' ছোট্ট একটু দাড়ি। পরনে মাদ্রাজী লুঙ্গি। কুঁতকুঁতে চোখ। প্রায় ন্যাড়া মাথা। কপালে একটা কালো দাগ। কান ভর্তি লোম। নাকটা মোটা আর একটু বসা। লোমভরা কালো এলো গা। অতিরিক্ত পান চিবোনোর দরুন কষ্ ধরা তেঁতুলবিচি দাঁত আর কোল্‌কে মোটা ঠোঁট সব লালে লালে একাকার।

ওদের দেখে মহাজন হেসে বলে, "হেঁ হেঁ জয়নদ্দি যে!"

" 'সেলামালেকোম্' চাচা!" সালাম জানায় জয়নদ্দি।

" 'আলেকোম সালাম'। দলিজে বস্ সব। তামুক খা। ই-মোরশোমের হাওয়া কি বলঝিনি?"

গরু বাঁধ্‌তে বাঁধ্‌তে কথা বলে যায় তরবদি। ওর বছর দশেকের মেয়েটা পিতলের বাল্‌তি আর সরষের তেলের শিশি এনে দিতে বাছুর ছেড়ে গাইয়ের পালানে দুধ পিয়িয়ে নিয়ে মেয়েকে বাছুর ধরতে দিয়ে বালতি নিয়ে দুধ দুইতে বসে। গাইটা বেশ তেজী। চোঁক্ চাঁক্ করে' দুধ পড়ে বালতিতে।

তরবদি বলে' যায়, "পনেরোটা নৌকো মোর খাটুতেচে গঙ্গায়—আর পনেরোগাছা জাল—মাছ কি শালা কম ওঠে ? লোকের ইমান নেই। · মুই কি আবার একজন করে' লোক দোব তোদের সঙ্গে। পাজারীরা কি বলেনে মোকে কে কতো মাছ পায়—আর কত্‌কে ব্যাচে মাঝিরা। দুনিয়ায় সব শালা চোর! তবু 'যে নেই সেই নেই' তোদের বারো মাস। পদী পাজারিণী এসে বলে, 'আড়ো সড়ু চাল নেই ? কি দোকান তোমার ? কাটারীভোগ, চামারমনি দাদকিনির চেইতেও আরো সরু চাল চায়! তাই বল্‌তে ছেম্ব, ঐ তক্তাপোষের তলায় আড়ো সড়ু চাল পড়ে আছে দেখতে পাচ্চ—ঐ যে, জুতো!···মাগী আড়ো সড়ু চাল চায়! চার টাকা মাছ ব্যাচে তিন টাকার দরে কিনে, হবেনে কেন ? শালা মাঝিদের তো ই-ক'মাস আর তাড়ি মদের গুঁতোয় হুঁস থাকেনে—যা হলো হলো"···

জয়নদ্দি ফিস্‌ ফিস্‌ করে' বলে, "আস্‌তে না-আস্‌তেই বয়ানটা শুন্‌তিচিস্‌ তো কানাই ? মাছ ঝেড়ে দিতে চাস্‌—উ-শালা সব খবর রাখে।"

দোওয়া শেষ হলে বিরলাপুরের চা-দোকানের লোককে দুধ মেপে দেয় তরবদি। ছ'সের। সমস্ত। বিকালেও হবে চারসের। তখন আধ সেরটাক্‌ রাখে কচি ছেলেদের জন্যে। না রাখলে নয় নেহাৎ তাই।

"দে টাকা দে, ক'টা মাছ পড়ে ছ্যালো ?" কোমরের গামছায় হাত পুঁছে বার কয়েক শুঁকে নিয়ে হাত পাতে মহাজন।

জয়নদ্দি তাকে একটা বিড়ি দিয়ে নিজে একটা বিড়ি ধরিয়ে বার দুই টেনে দাঁতে চেপে বলে, "পনেরোটা। চোদ্দটা বেচিচি। একটা কাজল-গৌরী তোমার বাড়ী দিইচি। একটা জলপানি। আর এক টাকা কম দিয়েচে পদী পাজারিণী।"

বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে বলে তরবদি, "কতো করে' দিইচিস্‌ ত্যাই বল্‌ ?"

রূঢ় চোখে জয়নদ্দি তাকায় একবার মহাজনের দিকে। গম্ভীর হয়ে বলে, "বাট টাকার হিসেবে।"

যে গরু দুধ দেয় তার লাথি খেতে তরবদির আপত্তি নেই।

টাকা নিয়ে গুণ্‌তে গুণ্‌তে বলে তরবদি, "হুঁ! তা এক টাকা কম দিলে কেন ? চাল্লিশ আছে—তাহলে তোদের পনেরো টাকা আর মোর জাড়াই

বখরায় পঁচিশ টাকা।"

জয়নদ্দি বলে "হিসেব করে' কার কতো পাওনা হয়েচে তুমি চাচা নিজেই দিয়ে দও।"

"এর আর হিসেব কি, পনেরো টাকা তিনজনে পাঁচ টাকা করে'। তুইও তো ওদের সমান নিস্? ব্যাস্—হয়ে গেল। তা হঁ্যা র‍্যা জয়নদ্দি, ইমান ঠিক রেখিচিস্ তো?…ঠিক পনেরোটা মাচ পড়ে ছ্যালো তো? নাকি বেশী, তোর ছেলেটাকে কোলে নিয়ে সত্যি কথা বলতিচিস্ তো?"

রাগে গা হাত কষ্‌ কষ্‌ করে জয়নদ্দির। কানাই চিভোড় চুলকোয় খষ খষ্‌ করে' আর হরেন ভাবে তরবদির গলাটা যদি সে টিপে ধরতে পারে তো বেশ হয়।

জয়নদ্দি বলে, "স্থাখো চাচা, অন্ত লোককে তুমি যা খুশী বলো বলবে কিন্তু আমাকে বলোনি। অমন হারাম চিজ্‌ মুই খাইনি।" রাগে উঠেই পড়ে জয়নদ্দি। তরবদি হাত ধরে' তাকে বসায়। —"আরে বাবা বস্‌ বস্—রাগিস্ কেন? কথার কথা বলচু একটা। তোকে মুই জানিনি? তোর বাপও এই রকম ছ্যালো, একরোকা মানুষ, চুরি কত্তুনি। 'বাপের হাত তুই রাখবি'।"

"না চাচা বাপের হাত রেখে আমার দরকার নেই। তার মতন মাহাজনের হাতের মার আমি খেতে পারবোনিকো। আর তার বাপের কি ছ্যালোনি? জমি জাল নৌকো সবই ছ্যালো। সেসব আজ কোথা?"

তরবদি বোঝে জয়নদ্দি কেমন করে' তাকে কথার মারে চাব্‌কালে। তার বাপের সর্বস্ব যে তারাই গ্রাস করেছে তা আর কে না জানে! তবু হেসে হেসে বলে, "হে হে বাবা, সে এককাল—আর এখন এককাল! মাহাজনের কথায় তারা উঠ্‌তো বস্‌তো—তাদের ভয়-ভক্তি ছ্যালো—ইমান ছ্যালো। —তা তুইও চেষ্টা করলে—সৎপথে থেকে নৌকো জাল সব করতে পারিস্।"…আড় চোখে বিদ্রূপ কটাক্ষ হানে তরবদি ওর মুখের দিকে চেয়ে। তারপর বলে, "কিরে কানাই, ঝিমুচ্চিস্ যে—দোকানের টাকাকড়ি গুনো দিবি?"

"দোব চাচা, তুবনি সে-একটা কি কথা হলো! ভারী ঘোরশোরটা আসুক না—দুটো বেশী মাছ পড়লে ত্যাখন কেটে নিও।"

"হরেনের ব্যাপার ? বউ তো খুব বাজার নিয়ে যাচ্ছে।—হ্যাঁ র‍্যা, কাল সেঁজের বেলা কে তোর ভায়রা-ভাই না কে যেন গেল তোদের বাড়ী ? দোকানে বিড়ি কিন্‌লে—শাড়ী দেখনু তার বগলে ?"

"কি জানি চাচা, কুন্ শালা এয়ে ছ্যালো ভগমান জানে।"

জয়নদ্দি তাকায় একবার তরবদির দিকে। শকুনের মাথায় ঢিল্ মারলে যেমন টুক্ করে' মাথাটা নীচু করে' নেয়, তরবদ্দিরও হলো সেই দশা।

তবু বলে, "তোর বৌকে কে কি দিয়ে যায় তুই জানিস্‌নি জান্‌বে ভগবান ?" তারপর অন্যমনস্ক সুরে অন্যদিকে তাকিয়ে বলে, "তাকে কত চাল কেলা খাওয়াস্ ?"

অন্য নৌকোর লোকেরা এলো সব একে একে। খাতা নিয়ে রোজের জমা লিখতে বস্‌লো তরবদি। মাঝির নাম ধরে' ডাক্‌তে লাগলো—কতো মাছ ? কত টাকা ? …'যজ্ঞেশ্বর বারুই—দশটা মাছ—আড়াই টাকা করে'—পঁচিশ টাকা—তার আদ্দেক সাড়ে বারো আর তিন টাকা দু' আনা, পনেরো টাকা দশ আনা আমার। পীরু মেছো—বারোটা মাছ—ধীরেন মোড়ল—আটটা মাছ—পয়রদ্দি মল্লিক—ন'টা মাছ"…

মাছের হিসেব শেষ হলে জয়নদ্দি ছেলেকে কাঁধে তুলে নিয়ে চলে আসতে গেলে তরবদ্দি ডাকে : "হেই নইমদ্দির বেটা—দাঁড়া—তোর ছেলের জন্তে চাট্টি মুড়ি নিয়ে যা।—ওমা রাহিলা, চাট্টি মুড়ি এনে দেতো"—হাঁক পাড়ে তরবদ্দি মেয়ের উদ্দেশে।

দোকান থেকে বাজার গুলো করে' নিয়ে আবার তিনজনেই ফেরে এক সঙ্গে। সাড়ে তিন টাকায় পাঁচসের চাল কিনেছে কানাই। আর ডাল আলু লঙ্কা পিঁয়াজ। জয়নদ্দি প্রতি মাসে বিরলা বাজারের বেচারাম জানার দোকান থেকে ধান কেনে দেড় মন করে'। বাইরে থেকে কাঁচা আনাজ কেনে কখনো কিছু কিছু। ঝাল মশলার খুচরো টুকিটাকি খরচটা করে শুধু তরবদ্দির দোকান থেকে। বেশী দেনা ফেলে রাখে না। কিন্তু হলে কি হবে গয়নাগুলো যে কড়ারে রেখে একে একে তরবদ্দির বৌয়ের 'গন্ধো' চলে যাচ্ছে সে-খেয়াল কি আর নেই জয়নদ্দির ? তরবদ্দির বৌ ফুলসন বিবির অনেক 'ট্যাকা পয়া'। মুরগি, ডিম, হাঁস, বক্‌রী, ঘুঁটে, ঝাঁটাকাঠি,

সংসারের আরো পাঁচটা নানান্ জিনিস বেচা পয়সা জমে জমে তার মূলধন হয়েছে নাকি পাহাড় সমান। সেই টাকায় সে গ্রামের অভাবী লোকদের দু-পাঁচ টাকা দিয়ে থালাটা-বাটিটা, গয়নাটা-গাঁটিটা কড়ারী সুদে বন্ধক রাখে। অনেকেই আর ছাড়াতে পারে না। সেসবও জমেছে তার কাছে কাঁড়ি কাঁড়ি। জয়নদ্দি ভাবছিল চল্তে চল্তে। সুদ খায় আবার নামাজও পড়ে তয়বদ্দি! কাবুলীদের মতো যেন। কাঁধে বসে বসে ছেলেটা জয়নদ্দির কান দুটো পাকাতে থাকে মনের আরামে।

কানাই বলে, "ওই শালারা যে অতো কম কম মাছের হিসেব ধরালে উ-কি ঠিক জয়নুদ্দি?"

"আল্লা জানে দাদা। মোদের ইমান ঠিক রাখি আর না! ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করে' কি লাভ! বেইমানী করলে আবার মাছ পড়েনে—জান্লি?"

হরেন বলে, "শালা মাহাজন যেন মোদের দিকেই বেশী 'আক্কোরোশ'।—তোকে মুড়ি আন্তে বল্লে, আন্লিনি যে?"

"হাঁ, তুইও যেমন! ঐ রকম একটু বল্তে হয় বেশী মাছ পেইচি বলে'—আজকে বেটার 'মাওলা'র দিন আছে তারিণীর সাথে। উল্টোপাল্টা তিন নম্বর মাওলা ঠুকেচে খালি তারিণী। সেই পুঁটে মাঝির চর লিয়ে গণ্ডগোল।"—হরেন বলে, "জেল হয় শালার!"

জয়নদ্দি হেসে ওঠে হো হো করে'। বলে, "যেত অন্যায় করুক্ টাকা থাক্লে জেল হয় হাঁ র‍্যা শালা? টাকা থাক্লে তোর কোলের বৌ কেড়ে লিয়ে গেলেও তুই কিচ্ছু বল্তে পারবিনি। ত্যাখন সমাজ ছ্যালো—বিচার ছ্যালো—এ্যাখন আছে আইন-আদালত, পুলুশ-ফাঁড়ি। নাহলে তোর বউকে"...হঠাৎ সাম্লে যায় জয়নদ্দি। কিন্তু কথাটা শেষ না-করলেও হরেন বা কানাইয়ের বুঝতে বাকি থাকে না কিছু।

একটু পরে জয়নদ্দি বলে, "মোদের মাহাজন হলো শেয়তানের কুস্তো-ভাই, ওর কথায় যে বিশ্বাস করবে সে শালা তার বাপ শালা। ঐ যে বল্লে কাল সেঁজের বেলা হরেনদের বাড়ী হরেনের ভায়রা-ভাই এসে ওর বৌকে কাপড় দিয়ে গ্যাচে—উ-সব বাজে কথা। উলুবেড়ে যেয়ে তোর ভায়রা-

ভাইয়ের সাথে ন্যাগা করে' কথা ভজিয়ে আয়, যেতি ঠিক হয় মুই দুটো কান কেটে ফেল্‌বো।"

হরেন কিছু বলে না। গুম্ হয়ে থাকে। এমন প্রতিজ্ঞার প্রমাণ না-করাও যেন মহা অন্যায়।

খাল ধারের ওপার দিয়ে কানাই আর জয়নদ্দি চলে যায়।

মনে বিষের গরল নিয়ে এসে বাড়ীতে ঢোকে হরেন। প্রথমে বাড়ীর মধ্যে দেখতে পায়না সে সিন্ধুকে। গামছায় বাঁধা বাজার গুলো ফেলে রাখে দাওয়াতে। তবে কি এখনো ফেরেনি নাকি জয়নদ্দিদের বাড়ী থেকে? দোর খোলা তবে? খিড়কীর দিকের আগড়টা খুলে বাইরে আসে। কলা গাছের জঙ্গল; করমচা, কদ্‌বেল আর নিম জামরুলের জড়াজড়ি করা গাছপালা ভর্তি পিছনের খিড়কীটা নীরব। দোয়েল পাখী শিস্ দিচ্ছে কোথায় যেন বন ঝোপের মধ্যে। আস্তে আস্তে ঘাটের দিকে আসে হরেন। এসে ভাখে গলাজলে এলো গা ভাসিয়ে চুপ চাপ বসে আছে সিন্ধু। কতক্ষণ দাঁড়ায় হরেন। একই ভাবে বসে বসে পানি নাড়ে সিন্ধু। কি যেন ভাবছে সে গভীর মনোযোগে। হরেন একটু কাদা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিয়ে লুকিয়ে পড়ে কলাবনের আড়ালে। টাপুস্ করে' ঘাই লাগার শব্দ হয়। চম্‌কে ওঠে সিন্ধু। সচকিত হয়ে গায়ে মাথায় কাপড় দেয় প্রথমে। তারপর উঁকি ঝুঁকি মারে এদিক সেদিকে। কোনো কিছু দেখ্‌তে না পেয়ে আবার বসে পড়ে। হরেন আবার একটা ঢিল্ ছোঁড়ে।

এবার কোনো দিকে না তাকিয়ে হেসে বলে সিন্ধু, "ন্যাকামো করতে হবেনে। ভূতের খাবা আবাগে।"

হরেন চুপ করে' থাকে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে সিন্ধু। কিন্তু কই—কেউ তো আসে না? একটা ডুব দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে আসবার আয়োজন করছে দেখে হরেন চলে আসে বাড়ীর মধ্যে। এসে গামছার বাজার গুলো খুলে ছড়ায় চারদিকে। তারপর খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বিড়ি টানে ফুস্ ফুস্ করে'। ভিজে কাপড়ে চট্ পট্ শব্দ তুলে খিড়কীর দোর ঠেলে এসে বাড়ীতে ঢোকে সিন্ধু। এক চোখ তাকায় হরেন। অন্যদিন হলে তাকিয়েই থাকতো। কিংবা ছুটে গিয়ে বুকে করে' তুলে এনে হেন তেন করে' একাকার করে' ফেল্‌তো সে।

বিরক্ত হয়ে নাকে কাঁদতো সিন্ধু। আজ যেন বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে শুধু এই কথা ভাবতে গিয়ে যে এতো প্রেম এতো ভালবাসা এতো সোহাগ সব তাহলে ছলা কলা? মন ভরানো প্রাণ মাতানো সিন্ধুর ওই ভরাযৌবন তাহলে আজ ভীমরুলের বাসা শুধু? তবু ওর ওপরে কেমন যেন মমতা হয়। পাছে সে সৌখিন ঠুনকো কাঁচের মতো একটু আঘাতেই ভেঙে কুঁচো কুঁচো হয়ে যায়—অকেজো হয়ে গেছে বলে' ফেলে দিতে হয় বাড়ীর বাইরে—কিংবা নিজের মূল্যহীনতার অপমানে সরিয়ে নেয় সে নিজেকে—তাই হরেন সংযত মনে ভাবে কতক্ষণ, কিছু বলবার আগে। কেননা, ওকে সে সত্যিই ভালবাসে। ও বিহনে রাত তার হয়ে যাবে মিথ্যা—দিন হয়ে যাবে শূন্য—ব্যর্থ। জীবন হয়ে যাবে ফাঁকা—ধূ ধূ মরুভূমি।

সিন্ধুও কোনো কথা না বলে স্বামীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কাপড় ছাড়ে। কাপড় শুকোতে দেয়। সেই নতুন শাড়ী আর ব্লাউজ। হরেনের একবার মনে হয় একটা চ্যালা কাঠ দিয়ে বেশ করে' ফাটায় মাগীটাকে। মনে হয় শাড়ী ব্লাউজ দুটোকে চচ্চড় পড়পড় করে' ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে' আগুনে ধরিয়ে-পুড়িয়ে দেয়। কিন্তু কিছুই বলে না হরেন। কাঁদতে ইচ্ছে করছে শুধু। গরীব বলে' তার ভালবাসার কোন দাম দেবে না মেয়েটা? চাল ডালগুলো মিশিয়ে একাকার করে হরেন বসে বসে। শুধু তাই নয়, জিরে মরিচ ধনে কালাজিরে মৌরী পোস্তা সব একাকার করেছে ঢেলে খুলে হাত দিয়ে নেড়ে নেড়ে। তাজ্জব হয়ে শুধু তাকিয়ে থাকে তার দিকে সিন্ধু। মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি মদ্দটার।

চিবুকে তর্জনী ঠেকিয়ে সবিস্ময়ে বলে সিন্ধু, "কি হচ্চে কি উ-শুনো!" কোনো কথা বলে না হরেন। টস্ টস্ করে' চোখের পানি পড়ে তার চাল ডাল গুলোর ওপরে। আরো বিস্মিত হয় সিন্ধু। কাছে আসে সে। গায়ে হাত দিয়ে ঠেলা মেরে বলে, "কি হয়েচে, কেউ কিচ্চু বলেচে? মাহাজন মেরেচে?"

কোনো কথা বলে না হরেন! ধীরে ধীরে উঠে চলে যায় অন্নদাদের বাড়ীর দিকে। পিছনে পিছনে দোর পর্যন্ত এসে দাঁড়ায় সিন্ধু। মাথা গুঁজে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে চলেছে অমন করে'—মনে হয় যেন মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে—কি

হয়েছে—মরবে নাকি—কোনো কথা বলে না কেন? ঘাটে কে তবে ঢিল ছুঁড়লে? তরবদি হলে তো ম্যাথা করতো? নাকি তার সঙ্গে ওর ম্যাথা হয়ে গেছে? বচসা মারামারি হয়নি তো? না, এখনই বা আস্‌বে কেন হাসেনের বাপ? সে হলো ধূর্ত ধড়িবাজ লোক। মাছ বঁড়শীতে গেঁথে খেলাতে ভাল-বাসে। —কিন্তু হায়! হায়! মন্দটা করে' গেল কি? এখন চাল ডালগুলো বাছবে কেমন করে'? মাথায় হাত দিয়ে বসে বসে ভাবে শুধু সিন্ধু। কুলোয় তোলে তারপর সেগুলো। চালতে আরম্ভ করে চালুনীতে। রেঁধে দিলে খেয়ে তবে যে জালে যাবে। ওদের বোধহয় এতক্ষণ রান্না বসে গেছে। মন্দমানুষটার কি হলো তা কে জানে! কাঁদে কেন? টস্ টস্ করে' চোখের জল পড়লো! তার সঙ্গে কথা কয় না। রাতে আস্‌তে যখন থেকে সে কাপড়ের কথা বলেছে তখন থেকেই প্রায় চুপ করে' গেছে। তবে কি জান্‌তে পেরেছে নাকি? সে যা নয় তাই হয়তো বিশ্বাস করে' বসে আছে। মন্দরা হুট্ করে' একটা যাই-তাই ভেবে বসে' থাকে মেয়েমানুষদের ব্যাপারে। কিন্তু সিন্ধু জানে ওর সবটাই ফাঁকা। একটা রঙীন বেলুনের মতো। সে বুঝে ফেলেছে, তরবদি মাঝি তাকে খেলাতে চায়—খেলিয়ে খেলিয়ে হাল্লাক করে' পায়ের তলায় টেনে আন্‌বে। কিন্তু সে গুড়ে বালি! সিন্ধুও খেল্ জানে। তাকেই সে নাকে দড়ি দিয়ে বাঁদর নাচ নাচাবে!…

"ধিৎকার করে' মারলে যেন!" বিরক্ত মেজাজে বকে সিন্ধু একা একা। "ই-চাল ডাল কি আর আলাদা করা যায়? এখন কোথা চাল পাই?" দোর-টাতে চাবি এঁটে পাড়া থেকে একবাটি চাল ধার করে' এনে তাড়াতাড়ি রান্না বসায় সিন্ধু। রান্না হতে হাঁড়ি নামিয়েছে যখন তখন এলো হরেন। তেমনি মড়ার মতন মুখ করে'। পাঁচিলের গায়ে এক চিল্‌তে চাল নামানো ছোট্ট রান্না ঘরটা থেকে চুপ করে' তাকিয়ে থাকে সিন্ধু। হরেন ধোয়া ধুতিটা পরে' সার্টটাও গায়ে গলালে দেখে উঠে আসে সিন্ধু, সামনে দাঁড়ায়, বলে, "নাইবেনে খাবেনে, যামজোড়া পরে' নবাব সেজে কোথা বেরোনো হচ্চে? জালে যাবেনে?"

কোনো কথা বলে না হরেন। তার দুটো কাঁধ ধরে' নাড়া দেয় সিন্ধু, "কি গো, কথা কি মুখ থিক্তে 'হরে' গেল নাকি? কি এমন ঘাট করেছু?" কোনো

কথা না বলে' মাথা গুঁজে বেরিয়ে চলে যায় হরেন।

জয়নদ্দি আর কানাই জোটে তার সঙ্গে রাস্তায় তে-মাথানিতে। তাদের সঙ্গে আছে আজ আবার কানাইয়ের বাপ—মাহিন্দ বুড়ো। হরেন কি তাহলে জালে যাবে না আজ? কোথায় যাবে? চম্‌কে ওঠে হঠাৎ সিন্ধু। ভয় হয় তার। তবে কি তার বড় ভগ্নিপতির কাছে যাচ্ছে নাকি, উলুবেড়ে? ছি ছি ছি, বড় দাদাবাবু কি মনে করবে তাহলে? সে তো আসেনি! মিথ্যে কেন তার নাম বলতে গেল? তরবদি যে সেই কথাই শিখিয়ে দিয়ে গেল! ঐ কাপড়ের লোভ সে সামলাতে পারলে না? এখন ঐ কাপড় গলায় দিয়ে ঝুলে মরতে ইচ্ছে করছে যে তার! সে ভাবলে অন্য কথা: তার স্বামীর গতর-মাটি-করা খাটুনির ঠিক মতো দাম দেয় না ওই বেইমান মহাজন। উপরন্তু দোকানে ধার থায় বলে' বাকি টাকার অংকো ইচ্ছা মতন বাড়ায়--লোভ দেখিয়ে যদি তার দেওয়া জিনিসে কিছু খেসারত আদায় করতে পারে মন্দ কি! নাহলে পীরিত? ঐ বুড়োটার সাথে? কি আছে ওর শরীরে?—তবে টাকার কুমীর লোকটা…

কিন্তু…কি বল্‌বে সে এখন হরেনকে?

কাঁথাটা বগলে নিয়ে জয়নদ্দির বৌ এলো হঠাৎ। তার কোল থেকে ছেলেটাকে নিয়ে নাচাতে হাসাতে আরম্ভ করলে সিন্ধু।—"চাটাইটা বিছিয়ে নে বস্ 'বেন'। আমার এখন মেয়েরই ঠ্যাখা নেই তার আবার বেন! কইগো আমার জামাইবাবু! কইগো—ও বাবা, শাউড়ীর মুখে পা দেয়?"

চাটাই বিছিয়ে কাঁথা মেলে বসে' জয়নদ্দির বৌ শকিনা বলে, "বেই কে আজ জালে গেলনি, হাঁ-লা? জামাজোড়া 'পিঁদে' গেল কোথা?"

"ভগমান জানে!…মুখে যমের ট াটি পড়ে গ্যাচে কাল ভোর থিঙে!"

"ঐ নতুন কাপড়জামা কোথা পেলি-লা,—কে দিলে?"

ছেলেটা তখন দু'হাতে তার হবু শাউড়ীর চুল পাক্‌ড়ে কানে ধরেছে কাম্‌ড়ে। সিন্ধু 'মাগো' 'মাগো' করছে যত ততই সে আরো ধরছে বাগিয়ে। শকিনা তাড়া দিয়ে ছেলেকে ছাড়িয়ে নেয়। "বস্ হারামি, মন্দ হইচিস্ যেতি বাপের সাথে জালে যেতে পারিস্‌নি?" ছেলেটা কীল্ তোলে আর ভেংচি কাটে তার মারে।

সিন্ধু বলে, "ওমা! ওমা! উ-কিগো! কোথেকে শিখ্‌লে গো?"

"দাদি শিখিয়েচে!"

সিন্ধু ছেলেটার রকম দেখে হেসে গড়িয়ে একাকার হয় তাকে বুকে টেনে নিয়ে।

শকিনা বলে, "ছাখ,—সুঁই ফুঁটুবে লো পিঠে!—আবার পানি এলো—কি 'আগাশ' রে বাবা!"

"আসুক না—তোর ভাতারের জালে বেশী মাছ পড়বে!"

শকিনা বলে, "কই, বল্লিনি তো কে কাপড় দিলে? 'বেই' নাকি?"

সিন্ধু বলে, "না।"

"তবে?"

"কাল সেঁজের বেলা আমার বড় 'ভগ্যানপোত' এসে দিয়ে গ্যাচে।"

শকিনা কিছু বলে না কতকখন। ধাগা চালিয়ে দেয় নিজের কাঁথায়। তারপর বলে, "কাল এসেই চলে গেল ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে?"

"ত্যাখন কোথা জল হোচ্ছ্যালো না? জল এলো তো ভারি রাত্তিরে।"

"হরেনও গ্যাচে কথা ভজাবার জন্যে উলুবেড়ে। তাকে ধরেও আন্‌বে সাথে করে'।"

"আসুক না।" জোর দিয়ে বল্‌লেও গলাটা কেমন যেন ভাঙা ভাঙা লাগে সিন্ধুর।

আর কোনো কথা বলে না শকিনা। একমনে ধাগা চালিয়ে যায় কতক্ষণ। সিন্ধু তাকায় তার মুখের দিকে ঘন ঘন। এইসব চক্রান্তের মধ্যে আছে নাকি এ মেয়েটা? কিন্তু তার বড় দাদাবাবু যদি আসে, যে রকম রাগী লোক—মেরেই হয়তো শেষ করে' ফেল্‌বে। শালী হলে কি হবে, সেই তো মানুষ করেছে প্রায় তাকে। বাপ ছিল না সিন্ধুর। সে-ই বাপের মতন দেখেছে শুনেছে—বিয়ে দিয়েছে।

চুপ করে' গুম হয়ে বসে থাকে সিন্ধু। আড়চোখে দুয়েকবার তার দিকে তাকায় শকিনা। বলে, "চাল ধার আন্‌লি কেন রূপোদের বাড়ী থিকে?"

সিন্ধু বলে, "চাল ডাল জিরে ধনে পানের মশালা সব মিশিয়ে রেখে গ্যাচে! ঘাটে চান করতে যেয়ে গলা ডুবে বসে ছেলে হাত পায়ের ধুলা

জল্‌তে ছ্যালো বলে, কে দেখি ঢেলা ছুঁড়লে দু-দুবার। আমি ভাবনু, মালতী বুঝিন্‌—ঐ তো আসে ই-টা সি-টা চাইতে,—দেখি, কেউ নেই—ভাবনু, পাড়ার কুনো ফোচ্‌কে ছোঁড়া কি হাসেনের বাপ নয়তো? চান সেরে উঠে এসে দেখি তোমার দেওর বসে আছে দাবাতে। আর চাল ডাল-গুনো সব এক সাথে মিশোচ্ছে! হাঁ গা বুন, উ-কি মন্দমানুষ, কি হচ্চে বল্‌তে আবার কাঁদতে রইলো—বলি, মাহাজন মারলে নাকি! একটা রা কাড়ে না—চলে গেল মাথা গুঁজে—ফের এসে না-খেয়ে না-দেয়ে জামা-কাপড় পরে' নবাব সেজে চলে গেল!"

শকিনা বলে, "ওষুধ ধরেচে এ্যাদ্দিনে!"

"কিসের ওষুধ?" সভয়ে শুধোয় সিন্ধু!

কিছু বলে না শকিনা। ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়ে। বেয়ানকে পান দেয় সিন্ধু। এক সময় শকিনা বলে, "তোকে আজ বড্ড মারবে লো! গাঁয়ের সব্বাই জানে তুই তরবদির সঙ্গে আচিস্। হরেন শুধু বিশ্বেস কত্তুনি—বল্‌তো উ ঐ রকম পানা এট্টু—লোকে ভাবে হয়তো খারাপ—কিন্তু মাহাজনের কথায় তারও সে বিশ্বেস গ্যাচে। তোকে কাল তরবদি দিয়ে গেল কাপড় আর তুই বল্‌লি মোর 'ভগ্যিনপোত' দি' গ্যাচে? তোর ভেতরে পাপ না-থাক্‌লে একজনের কাপড় নিয়ে আর একজনের নাম বলিস্? পাপকে কেউ ছাপাতে পারে?"

ধরা পড়ে সিন্ধু। ভীত বিহ্বল হয়ে পড়ে যেন। বলে, "হাঁ দিদি, তুই কি করে' জান্‌লি বল্! ঐ তারেই মন্দর আমার অতো ঘুম্‌ঘুমানি? কিন্তু এই তোর মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করচি বোন, আমি কুনো অন্যায় কাজ করিনি ওর সাথে। ওকে শুধু নাকাল করি। কাল ওরা জালে চলে যেতেই এলো মাহাজন। দোর বন্ধ ছ্যালো। ডাক্‌লে, 'ও কল্‌না, জালে চলে গেলি নাকি?' আমি ত্যাখন মিছে মিছে আঁধারের সাথে কথা কইতে শুরু করে" দিনু, 'না কাকী, সবদিন কি লোকের সমান যায়!' তারপর চুপ। দোর গোড়ায় এনু হাতে কাটারীটা নিয়ে। দেখি, হাসেনের বাপ। ভয়ে ভয়ে বল্‌লে, 'কার সঙ্গে কথা বল্‌তে ছ্যালে?' ফিস্ ফিসিয়ে বল্‌নু, 'ফুলোর ঠাগ-মা—শুয়ে আছে।' বল্‌লে, 'এইটা লও, কাপড় বেলাউজ!' আমি বল্‌নু,

"কিসের ?' বল্‌লে, 'এম্‌নি ?' বল্‌নু, 'খুব যে দয়া! গোড়া কেটে ডগায় জল! কই দও'—আগড়ের পাশ দিয়ে হাত গলাতে মুখ লুকুনে মিন্‌ষে আমার, ধরলে হাতটা চেপে, বল্‌লে, 'এসো—দোর খুলে বাইরে এসো—কথা আছে।' বল্‌নু, 'চ্যাঁচাবো, ছাড়ো বল্‌চি, তুমি না মাহাজন, 'নেমাজ' করো, ছাড়ো!' বল্‌লে, 'তবে কাপড়টা লও!' মুশ্‌কিল, না নিলে আবার হাত ছাড়েনে। তাই নিলুম। আর হাতটাকে ভেত্‌রে টেনে এনে দিনু এক কামড়! বল্‌লে 'কল্‌না জিগেস করলে বলো তোমার ভগ্নিপোতের কথা—তার কাপড় দোকান আছে।' আমি বল্‌নু, 'জিগেস করলে বল্‌বো যে মাহাজন কাল সেঁজের বেলায় এসে দিয়ে গ্যাচে!' ও বল্‌লে, 'না, খবরদার!' বল্‌নু, 'তবে তোমার বৌকে কাল দেখিয়ে আস্‌বো ?' বল্‌লে, 'তাহলে ঝাঁটা খেতে হবে তার হাতে আমাকে।' তারপর দেখি উ-মিন্‌ষে দোরটা খোল্‌বার আজ্ঞাম করচে, বুঝতে পেরেচে বোধ হয় কেউ নেই বাড়ীতে। রূপোর ঠাগ-মার নাম করিচি শুধু ভয়ে পড়ে—মিছে মিছে—ওর ব্যাভার দেখে বুক শুকিয়ে গেল, ডাকনু, 'ও কাকী, ওঠোতো গা, ত্যাখোতো কে যেন দোর ঘড় ঘড় করতেচে···ও রূপো'···আস্তে একটা হাঁক্ দিতেই দৌড় মারলে মিন্‌ষে পড়ি তো মরি করে'! কাপড়টা এনে লম্পের সাম্‌নে খুলে খুলে দেখ্‌নু, মন্দ নয়, বেলাউজটাও ভাল,"···

শকিনা বল্‌লে, "তা হরেনকে সব কথা বল্‌লিনি কেন খুলে? ভগ্নিপোতের নাম বল্‌তে গেলি কেন ?"

সিন্ধু বলে, "ঐটি ভুল হয়েচে দিদি! কাপড়টা নিয়ে ছেনু এই যে, অক্তে বলি উ-হারামি লোকটা তো অতো করে' খাটায়, ঠিক-ঠিক দাম দেয়নে,—তারপর দোকানের বাকি টাকা যেতি ই-হাপ্তায় দশ থাকে উ-হাপ্তায় পড়লেই বাজার করো আর না-করো, বারো টাকা হয়ে গ্যাচে! তা উ-যেতি সেই 'লোস-কানে'র খেসারত দেয়, লুবুনি কেন ?"

হাসে শকিনা, বলে, "বলিহারী তোকে! বাব্বা! মেয়ে মানুষের প্যাটে প্যাটে এ্যাতো বিদ্যে! বিদ্যে তোর বার করবেখন আজ। কাপড়টা আস্তে আস্তে দিয়ে আস্‌গে যা ভরবদির বৌকে। এখনো 'লিস্তার' আছে।"

সিন্ধু বলে, "আর উ-মিন্‌ষে যেতি তোর দেওরকে মারে রেগে মেগে—

বেডি কাজ না দেয় কি হবে?"

"উ-কাজ দেবার কে? কাজ দেবার না-দেবার ভার মাঝির—তোর বেইয়ের। সে লৌকো লিয়েচে। আর লৌকো না-দেয় তুনিয়ার আর লৌকো নেই? তারিণী তো খোষামোদ কত্তেচে কতো। ভরবদির লৌকোও ছেড়ে দেবে দেবে কত্তেচে। একশো টাকায় জমা লেবে তারিণীর লৌকো—জালটা তৈরি হয়ে গেলেই। তু'পাটা তো মোটে বাকি। মোর শাউড়ী বুন্‌তেচে বসে বসে।"

সিন্ধু বলে, "তবে এক্ষুনি কাপড়-বেলাউজটা ফেলে দিয়ে আসি—সে মাহাজন মিন্‌ষেও নেই আজ—'মাওলা'য় গ্যাচে।"

"যা এক্ষুনি। বেশ করে' কষুনি দিয়ে বলেও আয় মাগীকে।"

সিন্ধু আধ ভিজে কাপড়-ব্লাউজটা টেনে নিয়ে আঁচলের তলায় পুরে চলে গেল দোর খুলে।

বসে বসে কাঁথা সেলাই করতে লাগ্‌লো শকিনা। ছেলেটা ঘুমোচ্ছে, উপুড় হয়ে পড়ে। ভাব্‌তে থাকে সে, সিন্ধুটা সত্যিই তাহলে ভাল? খোদা জানে কার ভেতরে কি আছে! তবে ভরবদি যে লোক ভাল নয় তা সবাই জানে। তার সঙ্গে মেশে কি করে' সিন্ধু? ভয়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে শকিনার গায়ে।

সিন্ধু এসে বল্‌লে, "দিয়ে এইচি নাকের ডগায় ধরে'। বলি মদ্দ তোমার সাধ করে' দিয়ে এয়ে ছ্যালো—তা একবার পরে' তার মান রেখেচি। মানী লোকের মান তো! না রাখ্‌লে চলে? কপাল ঠুকে ঠুকে নেমাজ পড়ে' কপালে দাগ করে' ফেলেচে আর পরের মাগের দোরে যেয়ে বেলাউজ দিয়ে আসে কেন? কেন, আমার মদ্দমানুষ কাপড় কিনে দেয়নে আমাকে? শুনে, মাগী তো চুপ! রাগে গুম্ হয়ে আছে। আধ্‌না কথা কয়নে। শুধু বল্‌লে, 'আসুক্ একবার মাওলা' করে' ঘরে।"

শকিনা বল্‌লে, "তাহালে লেবেখন মাগী একচোট। বাব্বা, যে জাঁহাবাজ মেয়ে উ!"

সিন্ধু বলে, "তা, হাঁ-লা বোন, মিন্‌ষে আমার তাকে নিয়ে এলে কি বলবাখন?"

"সে আমি আছি। আমাকে ডাকিস্।" ভরসা দেয় শকিনা।

তারপর সিন্ধু ছুটি খেয়ে নিয়ে শকিনার কাঁথায় থাগা দিতে বসে। দুজনে মিলে ঘণ্টা দুই তিন পরে কাঁথাটা শেষ করে।

সিন্ধু বলে, "চ' বোন, তোদের বাড়ী; জালটা বরঞ্চ বুনে শেষ করি তিন-জনে মিলে।"

"চ'। মালতীর মাকেও ডাক্লে হয়। বলবাখন দু'টিন আটা দোব। ওর বড্ড হাত চলে লো।"

"সে মাগীকে তো ভরবদিদের বাড়ী দেখনু। এয়েচে বোধহয় এতক্ষণ।"

শকিনা আর সিন্ধু, লক্ষ্মীকে ডেকে নিয়ে এসে ইলিশের জাল নিয়ে বসে।

জয়নদ্দির মা বলে, "বাবা, একলা বসে-বসে কোমর পিঠ ধরে' গেল। বৌয়ের আর ভাখা নেই।"

লক্ষ্মী জালটা নেড়ে-চেড়ে দেখে বলে, "এইতো হয়ে গ্যাচে বল্লে হয়। শুধু ক'ফাঁদ বুনে জুড়ে-জাড়ে নিলেই হয়। এক ফিরি বুন্তে কতক্ষণ যাবে? 'সেত' কাছি আর চাকা বাঁধ্বে মরদরা। কাল তারিণীর একখানা নতুন জাল 'জাহাদ' (জাহাজ) বাঁটুতে পারেনে—মাস্তরে ছ' 'বাম' (বেঙ,—দুই বাহু দুদিকে প্রসারিত করলে যতখানি হয়) দিয়ে চোঁড়া ছেড়ে ছ্যালো কারখেনার উ-পাশে। পঞ্চাশ বাট বাম জল সেখেনে।"

জয়নদ্দির মা বলে, "বাবা! নতুন জাল, এক কাঁড়ি টাকা দাম—ভাহালে মাহাজন রাগ করবেনে?"

ওদের হাতে কেঁড়ে নালি চলতে থাকে দ্রুত। ফাঁদের পর ফাঁদ বেড়ে চলে ক্রমে। তার সঙ্গে গল্প। পুরোনো দিনের মাছ মারার কাহিনী। জয়নদ্দির মা বলে বেশ। সাগরে যাওয়ার সেই পুরোনো গল্প। সবাই জানে। তবু ওর বলার গুণে সবাই চুপ করে' শোনে।

সিন্ধুর শ্বশুরের কাণ্ডটাও বলে। নৌকা গড়বার লোভে পড়ে ভাসা কাঠ ধরতে গিয়ে কেমন করে' সেই জ্যান্ত কাঠ তাকে বার দরিয়ার দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা বট গাছের কাছে ডুবে গেল বড়্বড়্ করে' আর সেই বট গাছের ডাল ধরে সে উঠে পড়তে জ্যান্ত কাঠটা তার সঙ্গীকে নিয়ে আছাড়-পাছাড় খেয়ে তাকে আক্রমণ করতে গেলে কেমন করেই বা সেই গাছের

ওপরে প্রাণ বাঁচিয়ে পরের দিন হেঁটে হেঁটে পালিয়ে এসে বরুণ ঠাকুরের পুজোয় পাঁটা বলি দিয়ে চুমকে এক সরা কাঁচা রক্ত খেয়ে ছিল সেই সব গল্প। অপূর্ব ভাবা পায় যেন জয়নদ্দির মায়ের গলায়।

সিন্ধুর কিন্তু মন পড়ে থাকে ঘরের দিকে। তার নিজের মনের ওপরে। কখন এসে কি কাণ্ড বাধাবে মিনুযেরা কে জানে!

॥ ৩

কানাইয়ের বাপের যুক্তি ভাল। একবার জাল দিয়ে ছ'বেও, জল ছাড়িয়ে নৌকো সরে' আসতেই বলে, "জাল তোল জয়নদ্দি, ঐ ত্যা' 'জাহাদ' আস্তেচে —এ্যাতো জলে জাহাদ 'বাঁটা' (পার করা) যাবেনে ছ'বাম দিয়ে—কেটে দেবে।"

"তারপর মাছের কি হবে?"

"মাছ পড়েচে রে বাবা, মাছ পড়েচে—শুশুকও নয়—পাঁঙাসও নয়।"

জয়নদ্দি বলে, "কেন হীরেপুরের চড়ার দিকে এট্টু সরে গেলে হতোনি? এখন ভরা জোয়ার। ফের জাল তুলে ছেড়িয়ে গুচিয়ে উল্টো পিনে সেই গদাখালি যেয়ে আবার জাল নামাতে সময় থাক্‌বে?"

রুগ্ন বুড়ো কানাইয়ের বাপ রেগে উঠে বলে, "তোর বাপ ছ্যালো পাকা মাঝি, তেবু সে আমার সাথে তর্কো নাগে নে। তুই আমার চেয়ে বুঝিস্, না?"

"যেতি মাছ না-পড়ে কাকা তোমার বখরা কাটান্ ই-ক্ষেপে।"

"তাই তাই।"

কালো মেঘের চাঁওড়টা মাথার ওপরে সরে আসতেই বৃষ্টি এলো ঝিম ঝিমিয়ে। জাল তুলতে আরম্ভ করলে জয়নদ্দি। সে চাকাগুলো ধরে' গুছোয়, কানাই ধরে জাল আর কানাইয়ের বাপ রাখে চোঁঙাগুলো গুছিয়ে। জোয়ারে ভেসে চলে নৌকো। 'মহাবীরে'র বয়া ছাড়িয়ে ম্যাগাজিন লাইনের সোজা এসে পড়ে সমস্ত জাল তুল্‌তে তুল্‌তে। মাত্র পাঁচটা মাছ পড়েছে। অন্য নৌকোর

মাঝি পয়রদ্দি মল্লিক হেঁকে শুধোয়, "এখন জাল তুল্লে কেন হে ?"

জয়নদ্দি উত্তর দেয়, "শুশুক পড়ে জাল ছিঁড়ে দিয়েচে।"

ওরা শুনে হাসে।

রাগ হয় জয়নদ্দির কানাইয়ের বাপের ওপর। বলে, "খালি খাম্‌খাই কাকা জাল তোলালে, এট্টু চড়ায় সরে' গেলেই জাহাদ বেরিয়ে যেতো। ক্যাল্‌—জাল নাবা কানাই। গাঁয়ের মতিগতি পাল্‌টেচে গো কাকা—সেদিন আর নেই। এখেনে পঞ্চাশ বাট বাম পানি—ডহর আছে,—শালা, মোহনার মুখে বছর বছর চড়া পড়লে কি মাছ ওঠে ? দেখি এই ডহরে মাছ গাঁথে কি না—দে কানাই চোঁঙায় যেত বাম দড়ি আছে ছেড়ে দে।"

জালের তলায় বাঁধা মাটির চাকা গুলো একে একে ফেল্‌তে থাকে জয়নদ্দি। কানাইয়ের বাপ জাল ছাড়ে আর কানাই লম্বা দড়িতে চোঁঙা বেঁধে বেঁধে ছেড়ে দেয়। নদীর একেবারে 'খোরে' চলে যায় জাল। সারি দিয়ে ভাস্‌তে থাকে চোঁঙাগুলো, বিরাট একখানা সমুদ্রগামী জাহাজ চলে যায় প্রপেলারের ভীষণ গর্জন তুলে তুলে। ঢেউয়ের পাহাড় ওঠে একটু পরেই। মোচার খোলার মতো নাচতে থাকে যেন অতো বড় নৌকোখানা। তীরের বুকে আছাড়-কাছাড় খায় ঢেউগুলো। বৃষ্টি থেমে যেতে ইল্‌শে গুঁড়ি ওড়ে বাতাসে। সোনার আলোয় ঝল্‌মল্‌ করে ওপারের গাছপালা। ওপারে চড়া—এপারের কোল ঘেঁষেই গভীর। পাড়ের ভাঙা খাঁজ, গভীর গর্ত আর উঁচুনীচু ঢিবি, গাছপালা সবই ন্যাখা যায়। কোথাও-বা খালের মুখে জেলের মেয়েরা ফেটি জাল পেতে কুঁচো মাছ ধরছে। জোয়ারভরা সারা নদীটাই ছেয়ে গেছে নৌকোয় নৌকোয়।

জয়নদ্দি বলে, "গলার ভেতরটা শুক্‌নো কাঠ হয়ে গ্যাচে কাকা, ভাঁড়ের মালটা ঢালো এবেরে।"

পাটাতনের নীচে আংটায় টাঙানো ভাঁড়টা বার করে' এনে তাড়ি ছাঁক্‌তে ছাঁক্‌তে বলে কানাইয়ের বাপ মাহিন্দ মাঝি, "নেশাটা য্যাখন ধরিচিস্‌ তোরা, ছুটো একটা গাছ 'পাশ' করে' খেলেই তো পারিস্‌ বাবা, পয়সাও বাঁচে, আর উঁড়ের পাশি দোকানের এই মালে কতো জল দেওয়া।"

জয়নদ্দির গেলাস আলাদা। কারণ, সে আলাদা জাতের লোক। কানাই

কিন্তু জাতের পরোয়া করে না। সে বলে, "পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষের সময় জাত শালা ছ্যালো কোথা?"

কিন্তু ওর বাপ মাহিন্দ, বুড়ো মানুষ, কবে মরে-হেজে যায়, তাই জাতটা না-মেনে পারে না। আর জয়নদ্দির নাকি ধেরাপিত্তি আছে। কিন্তু ঐ যতক্ষণ নেশা না হয়—বুদ্ধিটা আচ্ছন্ন না হয়—হোলে, ঢালায়ই শুধু অপেক্ষা—কার গেলাস—কার ভাঁড়, কিছু জ্ঞান থাকে না—সব তখন একাকার।

পয়লা গেলাসটা গলায় ঢালে জয়নদ্দি। তারপর বুড়ো, কানাইকে দিতে গেলে সে বাপের সম্মান রাখবার জন্যে বলে, "তুমি এগ্যে নও বাবা, আমাকে শেষবেলা এট্টু না হয়..."

ছেলের বিনয়ে খুশীই হয় মাহিন্দ। তাই বলে' অবুঝ নয় সে, বলে, "খেলে কি হবে রে বাবা, অগ্নির সে-তেজ কি আর আছে আমার এখন? পেট খারাপ করে। কাছা খুলতে তর দেয়নে!"

জয়নদ্দি হেসে উঠে বলে, "একেবারে সররররররর"...

বুড়ো লজ্জা চেপে মিটমিটি করে' হাসতে হাসতে তাড়ি ঢেলে নিয়ে দেয় ছেলের হাতে। ছেলে তা বিনা দ্বিধায় নিঃশেষ করে।

মেঘের কালো ছায়া ভেসে চলে পাক্ খেয়ে খেয়ে ছুটে চলা ঘোলা পানির ওপর দিয়ে।

মনের আনন্দে গান ধরে জয়নদ্দি:

"সখি পিরীতি সেঁকুল পালা
জড়ালে কাপড়ে ছাড়ানো বিষম জ্বালা।"...

সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় তার সিন্ধুর কথা। তার সঙ্গে মনে হয় শকিনা, হরেন আর তরবদির কথাও। আচ্ছা, তরবদি কি নেশা করে? করে। তবে মাতাল হয় না। চোখ দুটো লাল কুঁচ্ হয়ে থাকে কেন নাহলে মাঝে মাঝে? বৌটাও ওর বিছ্ছিরি। দৈত্ড়ি...আর তার শকিনা?...

হঠাৎ বৃষ্টি নামে আবার হালকা এক পশলা। বেপরোয়া উল্লাসে হাল কষ্তে কষ্তে নৌকোর গলুইয়ে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে' গান গায় জয়নদ্দি। কানাইও গায়। বুড়োও গুন্ গুন্ করে। তারপর জোয়ারের বেগ কমলে ওরা জাল তোলে আছিপুরের কাছ পর্যন্ত গিয়ে।

অবাক হয় জয়নদ্দি। আনন্দে লাফালাফি শুরু করে কানাই।

মাহিন্দ বলে, "কি বাবা, বুড়োর কথা খাটলো ?"

জয়নদ্দি বলে, "এ্যাঃ! বুড়োর কথায় মহাবীরের জেটির কাছে জাল নাবানো হোল, না, মোর বুদ্ধিতে ? তুমি বলে' ছ্যালে না সেই ইলিশ মারির চরের উ-দিক পানে যেয়ে জাল এড়ে আসতে ? তাহলে দ্যাখ, কেনো, শালা ডহরেই মাছ ছ্যালো—এ্যাদ্দুর চড়ার দিকে জাল টেনে আসাই 'বিরথা'। পয়লা চোটেই শালা ছাপ্পড় ফাড় দিয়া—খবরদার, কুন্‌খেনে জাল দিইচি কেউ ফাঁস করবিনি। লে গুণে দ্যাখ্"...আকাশের দিকে তাকায় জয়নদ্দি। তাল তাল মেঘ ছুটেছে হু হু করে' উত্তর-পশ্চিমে।

জাল সরিয়ে গুছিয়ে রাখতে রাখতে পাটাতনের কাঠ হড়্‌কে গিয়ে মাহিন্দ বুড়ো পড়লো হুম্‌ড়ি খেয়ে গলে' নৌকোর খোলের মধ্যে।

জয়নদ্দি বলে, "দ্যাখ্‌রে বাবা, বুড়ো মেরে খুনের দায়ে পড়ি বুঝিন্ শেষ বেলা! লেগেচে তো ? শুধু হাঁপাহাঁপি, সবখানে কাজ হয়নে ?"

কোঁ-কোঁ-করতে-থাকা বুড়োকে নড়া ধরে' টেনে তোলে জয়নদ্দি। কোমরে লেগেছে নাকি বড্ড। কানাই একবার তাকিয়ে নিয়ে মাছ গুণ্‌তে থাকে—রাম দুই করে' গোণা শেষ হলে বলে, "দু'কুড়ি চারটে !"

সবিস্ময়ে বলে জয়নদ্দি, "দু-কু-ড়ি চার-টে। মানে চুয়াল্লিশ! আর ত্যাখন পড়েচে পাঁচটা। ইয়া আল্লা, ইয়া মাওলা—দোহাই বাবা বদর গাজি! চল্, ডাঁড় ধর দুজনে—ইলিশ মারির চরে চল্—সেখেনে ভাল খদ্দের পাবো।"

মাহিন্দ বলে, "সব হিসেব দিবি বাবা, মাহাজনকে ?"

জয়নদ্দি বলে, "হঁা। ধাপ্পাবাজি নেই মোর কাছে। সে হলো 'হারাম' খাওয়া। ধরো যেতি না পড়তো। আল্লা মন বুঝ্‌বার লেগেই হয়তো"...

কানাইয়ের মতো লোকও মনের সুখে বলে, "তা সত্যি।"

জয়নদ্দি বলে, "কেন হে সুমুন্দি, দু'বখরা পাবি বলে' আজ ?"

কানাই বলে, "সত্যি ভাই, জাল নৌকো নিজেদের হলে দিনে কত্তো রোজগার হয়।"

জয়নদ্দি বলে, "হবে হবে। জাল তো মোর হয়ে এলো বলে', আর

লোকো ? জমায় লোবো তারিণীর কাছ থেকে। শালা তরবদির 'অণ্ডরে' থাক্‌লে কুনোদিন সুখ হবেনে। আমাদের সব লিয়েচে উ-শালা। — শেয়তানের গোলামী করতে মনে কষ্ট হয়।"

মাহিন্দ বলে, "সব কার না নিয়েচে ? ওর বাপের দুটো লোকো ছ্যালো। আজ ক'গণ্ডা লোকো আর জাল হয়েচে ? দিনে কত উপায় ! জলে জল বাড়ে।"

জয়নদ্দি, পয়রদ্দিকে কাছাকাছি লোকো ভিড়োতে দেখে হেঁকে বলে, "ও দাদা, কতগুনো গাঁথ্‌লো ?"

পয়রদ্দি বলে, "শুন্‌লে জান ঠেণ্ডা ! মোটে এগারটা। তোমার ?"

"তোমারই ঐ গণ্ডা পুরু।"

পয়রদ্দি বুঝলো, হয়তো বারোটা। তাই বললে, "গায়ে জ্বর ! ই-রকম মাছ পড়লে চটকলে যেয়ে বদ্‌লি কাজে লাগতে হবে।"

"যা বলেচ। জেলের ছেলেরা গ্যাচে তো সবাই। ক'জন আর জাত-ব্যবসা কত্তেচে।"

"তবু মাছ কই ?"

জয়নদ্দি বলে "বড় সমিস্তের কথা দাদা ! গঙ্গাকে চারদিক থেকে বাঁধ্‌লে তার কোটালের টান কমে চড়া পড়ে যায়। আর জাহাদের যে ঠ্যাল্‌ বাড়তেচে, মাছ আস্‌বে কি করে' ? সোতের টান কমে কমে শেষে চড়া পড়ে জাহাদ চলাও বন্ধ হয়ে যাবে। শহরে ত্যাখন জাহাদ যাবে কি করে' ? গাঁঙ্‌ কেটে আর একটা গাঁঙ্‌ বাহাল্‌ করবে ?"

পয়রদ্দি বলে, "মোরা হনু এক পয়সার আদা-ব্যাপারী, অতো জাহাদের খবরে দরকার নেই। চ' এখন লোকো ভিড়ুই।"

রাজ্যের নৌকো এসে ভেড়ে ইলিশ মারির চরে। হাঁকাহাঁকি চেঁচামেচি ছুটোছুটি করে পাজারীরা। পদী ছুটে আসে জয়নদ্দির নৌকোর কাছে। নৌকোর বাড়ে বুক চেপে ঝুঁকে পড়ে ছাখে। তার নড়া ধরে সরিয়ে দেয় জয়নদ্দি।

"সরো সরো…নৌকো বাঁধুক্‌…'আড়ো সড়্‌' চাল কিন্‌তে যেয়ে আকি মাহাজনকে সব বলে করে আলো মোরা কতো মাছ পাই আর কতো দরে কাকে

বেচি? শালী মাগী তুমি তার কড়ে হয়েচ?"

ক্যার ক্যার করে' ওঠে পদী, "কুন্ খাল-ভরা, মুখপোড়া আটাশের ব্যাটা বলে র‍্যা? তার মুখে নুড়ো জেলে তুবুনি? তোমাদের কথা কক্ষনো বলি?"

নৌকোর কাছিটা ওপারের খুঁটোয় জড়িয়ে ফাঁস্ দিয়ে এসে কানাই, হাঁটু জলে কাপড় তুলে দাঁড়ানো পদীর গায়ে পানি ছিটিয়ে দিয়ে বলে, "তা কক্ষনো বলে? তুমি হলে যে মোদের ইয়ে, মানে পীরিতের কাল লাগিনী ঠাগ্‌রোণ!"

"এই মুখপোড়া—দেখলে গা! ও মাহিন্দ খুড়ো, দেখলে তো তোমার ছেলের ব্যাভার? ভিজিয়ে কি করলে গা, এঁ্যা—নোট যেতি ভেজে মাছের দাম দেবার সময় দেখবেখন, হ্যঁা!"...

অন্যসব খুচরো পাজারীরা এসে দর কষে' কষে' যাচ্ছে। জয়নদ্দি একদাম ধরে বসে আছে গলুইয়ের ওপরে উবু হয়ে। শাম্‌লা কালো, ছে লম্বা জোয়ান পুরুষ। ভরাট পেশী বহুল চেহারা। নাকটা তীক্ষ্ণ। চোখ দুটো কিছু বড় বড়। কিন্তু গোল নয়, চেরা লম্বা মতো আর অস্বাস্থ্যকর কালো রেখায় ভোবা। সপ্তা খানেকের দাড়ি সারা মুখে। বড় বড় কটা রঙের চুলগুলো ঝুলে পড়েছে মুখে। কানাই উঠে কাজল-গৌরী তিনটে নিয়ে তার বাপের হাতে দিয়ে বলে, "যাও বাবা, নিয়ে যাও। বেলা গ্যাচে। 'আন্না' করলে যেয়ে খেয়ে এট্টু ফিরিয়ে ফের তো-জালে আস্‌তে হবে।"

জয়নদ্দি বলে, "তিন বাড়ী তিনটে দিও খুড়ো; তোমাদের মোদের আর হয়েনদের।"

অন্যসব নৌকোর মাছ উঠে গেলে তবে মাছ তোলে কানাই। জয়নদ্দি বলে, "শালা, কুড়ি একুশটা নৌকোয় মাত্তেরে তিন বাজরা মাছ! খুচ্‌রো পাজারীরা কেউ পায়নে—টাকা গিলে বসে আছে আগে থেকে 'বিল্লা' বাজারের ব্যাপারীদের কাছে—আড়াই টাকার দরেই তাই বেচে দিতে হচ্চে! শালা, ব্যাপারীরা আবার একশো টাকার নোট কানে খুঁসে আসে—লোভ ছাখায়—হে হে"...

জয়নদ্দি উবু হয়ে বসে বসে চিত্তোড় চুল্‌কোচ্ছিল যব্‌যব্ করে'। ওর কাপড় সাঁটার বহর দেখে কানাইয়ের মতো লোকেরও চোখে লজ্জার হাসি আর ভিরস্কার ঝিকিঝিকি খেলছিল। পদী আড়ে আড়ে তাকাচ্ছিল জয়নদ্দির

দিকে। কানাইয়ের সঙ্গে চোখোচোখিতে তা ধরা পড়লে বলে পদী, "কাপড় পরার ব্যাভার ত্যাখো মিন্‌ষের—ছ্যা!"...

জয়নদ্দি বলে, "কাল থিঙে পদীরাণী আমি সায়েবদের মতন কাটাপোষাক করে' আস্‌বো! জেলে বলে কি মানুষ নয়? পদীরাণী, কাল তুমিও ঘোড়-তোলা জুতো আর সিল্কের শাড়ী পিন্দে এসো। কেউ যেতি কিছু বলে মনের দুঃখে দুজনে মাহাজনের এই নৌকোয় করে' ভাগ্‌বো কোথাও!"

পদী লজ্জা পেয়ে বলে, "গলায় দড়ি জুটুক্ তোমার!"

কানাই মাছ তুল্‌তে তুল্‌তে বলে, "পদী-দিদি আমাদের কাছ থিঙে রোজ মাছ নিচ্চে, কতো লাভ কত্তেচে—কই, একদিন বাড়ীতে নেমতন্ন করে' খাইয়েচে?"

"খাওয়াবো খাওয়াবো, মাথার দিব্যি রইলো, যেয়ো একদিন, খাওয়াতে পারি কিনা দেখবে।" তেজের সঙ্গে বলে পদী। মুখে যেন তার খই ফোটে।

জয়নদ্দি ঠোঁট উল্টে ব্যঙ্গ করে' বলে, "হুঁ হুঁ, যেয়ো একদিন! বলি ক'জন—কানাই একলা? কখন, গহিন 'আত্তে'—য্যাখন গাঁয়ে জুয়ার 'নাগে'?"

"সক্‌বো মিন্‌ষে! গাল দোব বল্‌চি, পদীর মুখতো জানোনি!"

জয়নদ্দি বলে, "জানিনি আবার! পচা—থুঃ!" হি হি করে' হাসে জয়নদ্দি। পদী পানি ছিটিয়ে ভিজিয়ে দেয় তাকে। অন্য নৌকোর লোকেরা 'হরি বোল হরি' করে' ওঠে। জয়নদ্দি লজ্জা পায়।

আস্তে বলে, "শালীকে চুবিয়ে মারবো নাকি রে! দাও, দাম ক্যালো—সাঁজ হয়ে আস্‌তেচে।"

লালে লাল হয়ে উঠেছে তখন অস্তমান সূর্যের রক্তিম আভায় মেঘ আর নদীর পানি। হাসছে গাছপালাগুলো। ভাঁটার টানে ছুটেছে কেরি নৌকো-কটা। ছবির মতো লাগে যেন কুচ্‌কুচে কালো বয়েস-না-ভোলা পদী মেছুনী-কেও। কবে ওর বিয়ে হয়েছিল তা ও-নিজেই জানে না। লোকে বলে ওর স্বামীটা নাকি নল দাঁড়িতে রাত্তিরে মাছ মারতে যেয়ে 'শিরর চাঁদা' সাপের কামড়ে মারা গিয়েছিল। সেই থেকেই পদী বিধবা। স্বামী নিয়ে ঘরসংসার করলে দশটা ছেলেমেয়ে হয়ে যেতো এতোদিনে—ও কবেই হয়তো বুড়ী হয়ে যেতো কিন্তু আঠারোর যৌবন ওর দেহে এমন আঁট-সাঁট হয়ে আসর পেতে বসেছে যেন

নড়বার আর নাম নেই !

জয়নদ্দি বলে, "দু'কুড়ি ছ'টা মাছের দাম হলো তোমার গে যাও—এক কুড়িতে যাট টাকা, দ্বিগুণে...ছয়ে শোন্য শোন্য আর ছ'দ্বিগুণে বারো মানে একশো কুড়ি আর ছেচল্লিশটার পঁয়তাল্লিশটাই ধরো—একটা জলপানির জন্যে আদ্দেক দাম—তাহলে পঁয়তাল্লিশকে তিন দিয়ে গুণ করলে...কানাই-দা খাতা পেন্সিলটা দেতো মোর ফতুয়ার পকোট থিঙে।"

কানাই টোঁঙ্যের মধ্যে ঢুকে ফতুয়ার পকেটে হাত দিয়ে ছোট খাতা আর দেড় ইঞ্চিটাক্ একটা উড্‌পেন্সিল বার করতে গিয়ে দুটো বিড়ি পায়। খাতা দিয়ে বিড়ি ধরায়। পদী কোমর চাগিয়ে উঠে বসে নৌকোর কিনারায়। সিন্ধু চন্দন-পেলব পলি-মাখা পা দু'খানা নাড়তে থাকে গিরিমাটিঘোলা পানির ওপরে।

হিসেব জোড়ে জয়নদ্দি। পেন্সিল তার ভাল কোটে না বলে' বার বার জিবে ঠ্যাকায় আর লেখে, "পঁয়তাল্লিশকে তিন দিয়ে গুণ করলে তিন পাঁচ পনেরোর পাঁচ হাতে থাকে এক আর তিন চারে বারো আর একে তেরোর তিন, হাতে থাকে এক, তাহলে একশো পঁয়ত্রিশ আর উ-দিকে হলো একশো কুড়ি, তাইলে দু'শো—পঁয়ত্রিশ আর কুড়ি—হুঁ হুঁ পঞ্চান্ন—দু'শো পঞ্চান্ন টাকা ..এ্যা! সেকি ! ওরে শালা, সব ভুল হয়েচে...একবার দু'কুড়ি ধরিচি ফের পঁয়তাল্লিশ ধরিচি—তাইতো বলি ই-হলো জেলের মাথা! পঁয়তাল্লিশকে একাবারে তিন দিয়ে গুণ করি ভো ফুরিয়ে যায়...এই শালা কেনো, তুই কি মাগী লোক, লেখাপড়া শিখিস্‌নি—বিয়ে পাশ করে' অতগুনি ছেলেমেয়ে হলো"—

মন দিয়ে দামটা এবার কষে নেয় জয়নদ্দি মাথা গুঁজে। পদীর গায়ের আর মাথার চুলের কেমন যেন ভ্যাপ্‌সা গন্ধ এসে লাগে নাকে। আশ পাশের নৌকোর লোকেরা সব চলে যাচ্ছে একে একে। জয়নদ্দি হঠাৎ মুখ তুলে ছাখে কানাইয়ের সাথে পদী কথা বলছে চোখের ইসারায়! লোকটার রস আছে বেশ এখনো!

"একশো পঁয়ত্রিশ টাকা হয়—আর এক টাকা এই মাছটার।"

"ক'কুড়ি গো ?"

"ছু'কুড়ি যোল। আছে তো ?"

"বাব্বা! আমাকে কেটে ফেললেও হবেনে দাদা!"

"বেরো তবে মাগী, খালি খদ্দের ফিরোলে! কানাই, তোল্, মাছ তোল্— বাজারে লিয়ে চ'। রাত হয়ে যাবে।"

উঠে পড়ে জয়নদ্দি। নিজেদের ঝাঁকা টেনে মাছ ঢেলে ক্যালে। কানাইয়ের মাথায় তুলে দিতে গেলে পদী চেঁচিয়ে ওঠে, "ধরম-ভাই বলতিচি জয়নদ্দি-দাদা তোকে, তোদের মুখ-চেয়ে মাছ কিনিনি আমি। আড়াই ট্যেকা হয় দও, নোবো সব, ট্যেকায় না কুলোয় কিছু ধার 'আকো'—তাও না 'আকো' আমার কানের ফুল দুটো বন্ধক দিয়ে ট্যেকা আন্তিচি।"

কানাই চল্‌তে আরম্ভ করলে, জয়নদ্দি বলে, "থাম্।" ভাবে সে বাজারে বয়ে নিয়ে গেলে মাঝির মান যায়। ব্যাপারীরা হাসবে। 'আধ দিবিনি গুড় দিবি, মাথায় করে' বয়ে দিবি!'

জয়নদ্দি বলে, "ভাই দে, তোদেরই কানের সোনা হোক্—বার কর কতো টাকা হয়। মুখ-আঁধারি সন্ধ্যে হয়ে গেল। হারকেনটা জ্বাল্‌তো।"

ফের হিসেব করে জয়নদ্দি।

"একশো সাড়ে তেরো টাকা। মানে, পাঁচকুড়ি সাড়ে তেরো টাকা।"

মুখ শুকিয়ে যায় পদীর। নোটের গোছা ধরে বলে, "মোটে আমার কাছে চার কুড়ি আছে! বাকিটা না হয়"...

"উঁহুঁ! মেয়েমানুষের কাছে এতো টাকা! বলিস্ কি! আরো আছে তাহালে।"

"এই তোর পায়ে হাত দিয়ে বল্‌তিচি দাদা—মা কালীর দিব্যি! —কি মনে করে' আজ বেশী এনে ছেনু—ক'দিন ট্যেকা নে'সে নে'সেও ফিরিয়ে নে' গেচি। —মাহাজনের সুদের ট্যেকা রে দাদা—কোথা পাবো মানিক"...পদীর গলায় কান্না এসে যায় যেন হঠাৎ।

জয়নদ্দি হেঁকাতের মতো জোর গলায় ওর মুখের কাছে ছলভরা মাথা নাড়তে নাড়তে বলে, "দও দও, আর কুড়ি অন্তত দও। কানের ফুল বন্ধক রেখে এসো। সাড়ে তেরো টাকা বাকি থাকে থাক্—কাল দিও—আজ তোমার ভাগ্যি ভাল —ভাল মাল পাচ্চ—সব সেরার বাছাই মাল।"

"যাই তবে"—ছুটতে ছুটতে অন্ধকার বেলাভূমি মাড়িয়ে তিন কটুকে জেলের

কাছের হাটে আসে পদী। পাড়ের উপরেই। আড়বাঁধির দু'পাশে দোকান। পাঁচ সাতটা মাছ-নিয়ে-বসা বুড়ীটার পাশে দাঁড়ায়। হেঁট হয়ে পড়ে গঙ্গার পাতার দিকে একবার লক্ষ্য করে—কানাইরা কেউ আস্‌ছে না তো? বুড়ীকে বলে, "মাসি, কুড়িটা ট্যাকা দে দিনি! এই নে, কানের ফুল দুটো 'আক' নাই-কোঁচড়ে করে' বেঁধে।"

কোনো কৈফিয়ত না নিয়েই টাকা বার করে' ধরে মাসি। গুণে গুণে তুলে নেয় পদী। চা-দোকানের বেঞ্চিতে বসে পা-নাচাতে-থাকা খারাপ মেয়ে দুটো হাসে আর ফিস্ ফিসিয়ে কি যেন বলা কওয়া করে।

পদী মুখ ভেংচে বলে, "মার ঝ্যাঁটা মাগীদের মাথায়! আঁস্তাকুড়ের এঁটো পাতা, মাগীদের আবার 'অঙের' বাহার গ্যাখো না।"

দোকান থেকে চারটে পান নিয়ে একসঙ্গে দুটো গালে পুরে অন্য দুটো হাতে করে' ছুটে আসে পদী গঙ্গার পাতার অন্ধকারের দিকে। আলো-আঁধারিতে ঠাওর হয় না—ধাক্কা লাগে কার সঙ্গে—"এই মুখপোড়া!—কে কানাই-দা, কোথা যাচ্ছ?

কানাই বলে,"নেশার জন্যে পাঠালে মাঝি।"

"এই নও, পান খাবে একটা?"

"দও।" কানাইয়ের গালে পানটা গুঁজে দিলে পদী। কানাই প্রতিদান দিতে যায় কিন্তু হঠাৎ একজন লোক কে যেন ভূতের মতো গুন্ গুন্ করতে করতে চলে গেল পাশ দিয়ে।

পদী চলে এলো দ্রুত পায়ে নৌকোর দিকে। কানাইও চলে গেল কোথায় তাদের গোপন মালের সন্ধানে। পতিতালয়ের আশে পাশে ও-জিনিসটা না-থাকলেই নয়। যারা দেহ দেয় তারা প্রাণ নেয়—সে প্রাণে আগুন জ্বালাতে না পারলে সর্বস্বান্ত হয়ে নিজেকে লয় করে' দেবেই-বা কে?

কুড়িটা টাকা নিয়ে ট্যাঁকে খুঁসে জয়নদ্দি একবার তাকায় পদীর মুখের দিকে। আলো পড়া চক্‌চকে মুখে লাল টুকটুকে ঠোঁট দুটো কেমন যেন পুরুষ্ট হয়ে উঠেছে পদীর। মাথার চুলগুলো হাওয়ায় নাচছে। চোখ দুটোয় জ্বল্ জ্বল্ করছে ক্ষুধাতুরা বাঘিনীর দৃষ্টি। জয়নদ্দি হাসে। পদীও হাসে। সে এক অদ্ভুত হাসি।...খল্‌খল্ ছল্‌ছল্ করে' নাচছে হাসছে কাঁদছে যেন ঢেউগুলো।

চার.পাশে প্রায় জনমানবশূন্য কালো কালো নৌকোর ভিড়। হ্যারিকেনের আলোটা হঠাৎ নিভে যায় দমকা হাওয়ায়।

ভূতের মতো নাকি সুরে বলে পদী, "ও মাঝি আলোটা জ্বালাও না, বড্ড ভয় করচে যে আমার!"

হঠাৎ একটা মাতাল ঝাপটা হাওয়া ছুটে এসে পড়ে ব্যথায় মোচড় খেতে খেতে দূরে চলে গেল হু হু করে'—অভিশপ্ত শয়তানের দীর্ঘশ্বাসের মতো। উন্মাদ অবুঝ ঢেউগুলো বার বার আছাড় খেতে লাগলো নৌকোর গায়ে।

অন্যমনস্ক মনে বলে জয়নদ্দি, 'সবুর সবুর! তুমিও যেমনি, তোমার হারকেনও তেমনি!"

একটু পরে আবার হ্যারিকেনের আলোটা জ্বলে ওঠে জয়নদ্দির নৌকোয়। দা দাঁড়িয়ে আছে নৌকোর নীচে। কানাই এসে পড়ে ওর মাথায় মাছের জরাটা তুলে দেবার সময়েই।

জয়নদ্দি বলে, "চল্—রাস্তায় যেতে যেতে গলায় ঢেলে লোব।"

হঠাৎ আছাড় খাওয়ার শব্দ হয় পদীর। ছুটে যায় দুজনে।

—"কি হ'লো!" শুধোয় দুজনেই। মাছগুলো ছড়িয়ে-ছিটকে গেছে। উঠতে চেষ্টা করছে পদী। বলছে সে, "গা হাত সব কাঁপতেচে কেন! গায়ে যেন বল্ নেই! মাথা ঘুরতেচে।"

জয়নদ্দি তাকে নড়া ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলে,—"হুঁ! এই, ধরতো কানাই—বাজরাটা তুলে দে পাড়ে—'রিস্‌কা'য় তুলে দিলে পাকা দিয়ে বাখরা কিংবা আমতলায় চলে যাবেখন। সারাদিন খাওয়া-দাওয়া নেই—রোদে রোদে বাজরা মাথায় করে' ঘু'রে বেড়ালে গা মাথা ঘুরবেনে? লও, আলোটা ধরো—চলো।"...

পাড়ে উঠে পদীকে বিদায় করে' দেবার জন্যে তার মাসির সঙ্গে তাকে রিক্সায় তুলে দিতে পদী কৃতজ্ঞতার-হাসি হাসে জয়নদ্দির মুখের দিকে তাকিয়ে। কালো মুখে সাদা সাদা দাঁত—যেন ভূতের মতো—রাক্ষসীর মতো মনে হয়। কানাইও সে-হাসি ভাখে। সন্দেহে, হিংসায় আর রাগে গুম্ হয়ে থাকে সে। তারপর বলে, "আমাকে আগে মাল কিনতে পাঠাবার মানে কি 'খালে'?"

'সে শালা, গতর তোর ক্ষেয়ে যাচে জাহানে, এখেনে নিরিবিলি আছে—

লে চাল্। ভাঁড়া গলা ভিজোবার আগে টাকাগুনো হেপাজত করে' রাখি এট্টু।"

হ্যারিকেনের আলোটা একটু কমিয়ে দিয়ে পুঁটে মাঝির ঘোলের গাঁঙ্ চড়ার ভাঙন-ঢিবির ওপরে বসে মদটুকু শেষ করে দুজনে। তারপর মাতলামো করতে করতে নেশা নিয়ে বাড়ী ফিরে জয়নদ্দি শোনে, হরেনের ভায়রা-ভাই এসেছে হরেনদের বাড়ী—হরেন ডেকে গেছে জয়নদ্দিকে।

শকিনা বলে, "হরেনের বৌকে পিটেচে গো তার বোনাই এসে। মুই যেয়ে তবে ছেইড়ে দিই।"

যাত্রা-থিয়েটারের রাজারা যেমন ভঙ্গিতে সিংহাসন গ্রহণ করেন তারই অনুকরণ করে' জয়নদ্দি বসে উপুড় করা ম্যাচলটার ওপরে। খুঁটি হেলান দিয়ে তেমনি নাটকীয় গলায় বলে, "কেন তুই 'ছেইড়ে' দিতে গেলি? আমার হুকুম লিয়ে ছেলি?"

"না গো না, উ-মেয়েটা ভাল—তোমাদের মাহাজনই খারাপ—বারো সতেরো লোভ দ্যাখালে মেয়েমানুষের মন কতক্ষণ ঠিক থাকে?"

"বলি, তোর মন তো ঠিক আছে?" জড়িয়ে জড়িয়ে কথা উচ্চারণ করে জয়নদ্দি।

আড় চোখে একবার অগ্নিশর হানে শকিনা। বলে সে কর্কশ গলায়, "যে বল্‌বে ঠিক নেই তার মাথায় আমি ঝ্যাঁটা মারবো, সে বাপই হোক্ আর ভাতারই হোক্।"

মউজ হয় যেন জয়নদ্দির। টেনেটেনে খোশ মেজাজে বলে, "আর যেত্তি বোনাই বলে?"

"তাকে? পাঁচ খুরে করে' মুয়ে চুণকালি মেখিয়ে, দুটো কান কেটে, গলায় জুতোর মালা দিয়ে, লগরের বার করে' দোব।"

"বেশ করিচিস্ শালী, হরেনের বৌকে ছেড়িয়ে দিয়ে ভাল করিচিস্!" জয়নদ্দি টলে টলে বেড়ায় বাকুলটার মধ্যে।—"শালা মাহাজনকে অমন ধারা করতে পারিস্ একদিন! তাহালে তোর আর একটা সাদী দিয়ে দোব।... লে শালী, টাকা তোল্। একশো টাকা! এক টাকা কম হলে ঐ বঁটি দিয়ে জবাই করবো।"

জয়নদ্দি পুকুরে পড়ে গিয়ে লাফ দিয়ে। দুটো চারটে ডুব দিয়ে এসে দাঁড়ালে শকিনা নিজে, মাথা গলিয়ে ওকে একটা লুঙ্গির মধ্যে ঢুকিয়ে কোমরের কাপড়টা ছাড়িয়ে ফেলে দিয়ে লুঙ্গির গেরোটা এঁটে দেয়। শাড়ীর আঁচল দিয়ে মাথা মুছে দেয়—মুছে দেয় গা হাত পাগুলো। জয়নদ্দি শান্ত বাধ্য ছেলেটির মতো শকিনার সেবাটাকে উপভোগ করে।

শকিনা বলে, "মা যে সেই গ্যাচে আর ফেরার নাম নেই। পাড়ার মেয়েদের বিচার-সালিস্তি শেষ না করে' আস্‌বে ?"

'চেঁঙে' (মাচা) থেকে ঝ্যাৎলা, কাঁথা আর বালিশ পেড়ে বিছানা করে' দিতে শুয়ে পড়ে জয়নদ্দি। বড্ড ঘুম পাচ্ছে নাকি তার। শকিনা তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে, "দুটি খেয়ে শুলে তো হতো !"

শকিনার হাত দুটো বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চুপ করে' যেন তলহীন কূল-হীন এক আবেশ-ঘন শান্তিতে ডুবে যায় জয়নদ্দি। লম্ফের আলোটা দুলতে থাকে বাতাসে। পরিশ্রম-ক্লান্ত নিদ্রাকাতর ক্ষুধার্ত স্বামীর মুখের দিকে এক নজরে অনেকখন তাকিয়ে থাকে শকিনা। তারপর কি ভেবে হঠাৎ দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফ্যালে। ফরফর করে' বার কতক শব্দ হয় লম্ফর শিখাটায়।

একটু পরেই আবার উঠে বসে জয়নদ্দি। বলে, "মাথার ভেতরটা বড্ড কন্‌কন্ করতেচে শকি !"

শকিনা ধরা গলায় বলে, "কতবার বলি নেশাটা ছাড়ো, তা তো শুন্‌বেনে। চলো ভাত খেয়ে লেবে।"

শকিনা এসে ভাত বেড়ে দিলে খেতে বসে জয়নদ্দি। একটু পরেই তাদের বাড়ীতে এসে ঢোকে হরেনরা। শকিনা তাড়াতাড়ি ওদের জায়গা দিতে উঠে যায় মাথায় আড় ঘোম্‌টা টেনে।

হরেন আর্জি পেশ করার সুরে বলে, "জয়নদ্দি-দাদা, তোমার কাছে একটা বিচার মান্‌তে এইচি। আমি ঘরে না-থাকাতে আমার বৌকে কেন তরবদ্দি মাঝি কাপড়-বেলাউজ দিয়ে যায় বল্‌তে হবে।"

খেতে খেতে জয়নদ্দি বলে, "সে-বিচার কি আমাকে করতে হবে ? তোমার বৌকে কাপড় দিতে সাহস পায়, কই আমার বৌকে দিতে সাহস পায়নে ? দিক্ না দেখি—মুণ্ডুটা তার ধড় থেকে নেবিয়ে দুবুনি। তার টাকা আছে

তার আছে, আমার কি ? আর এই ছুঁচোর মল পর্বতে তুলে বেড়াচ্চিস্ কেন সব ? তোর বৌয়ের বোনাইটাও কি একটা গাধা ?" চেঁচিয়ে উঠে জয়নদ্দি।

হরেনের ভাইরা-ভাই লোকটি রাগে মুখ তোলে তার দিকে। বলে, "কি রকম ?"

"তা না হলে যেতি বুদ্ধি থাকতো তবে 'হাঁ কাল সন্ধ্যে গেছিনু' বলে' চেপে-চুপে যেয়ে ভেতর থেকে শাসন করলেই হতো,—না, বাহাদুরী দেখিয়ে সবাই এখন একটা মেয়েছেলের নামে বিচার ডাকতে এয়েচে! তরবদির কি করবি এখন তোরা ? সে যেতি বলে, 'হাঁ উ-মাগী আমার সাথে অনেকদিন থেকে আছে'—তাহলে ঐ বউ লিয়ে ঘর হবে ? না, ছেড়ে দিলে তরবদি 'লিকে' করবে ?"

চুপ করে' থাকে সকলে। কেউ কোনো কথা বলে না আর।

শকিনা বলে, "এক হাতে তালি বাজেনে—দোষ দুজনেরই আছে। সে কাপড় দিলে বলেই লিতে হবে ?"

জয়নদ্দি বলে, "তুই চুপ কর!—এরপর আর কিচ্চু বিচার নেই। বিচার হয়ে গ্যাচে—এখন চুপচাপ! সেখেনে বৌ তার 'কৈবিত' (কৈফিয়ত) কয়তেচে আর এখেনে হরেন, কি ওর ভায়রা-ভাই, যে হোক, ওষুধ দিয়েচে—ভালই হয়েচে। আরো বাড়াবাড়ি ভাল লয়। মেয়েমানুষ হোল বাবা-আদমের পাঁজরার বাঁকা হাড়ে তৈরি, বেশী 'সিদে' করতে গেলে আবার বিপদ আছে। ভেঙে যাবে। যাও, সব চলে যাও। কেউ আর কিচ্চু ঘাঁটাঘাঁটি করোনি উ-সব কথা লিয়ে। আর হরেন, শালা, তুই কি মানুষ র‍্যা, বউকে পাঠান্ দোকানে বাজার করতে ? কেন, ওর মুখ দেখে বাজার একটু বেশী দেবে বলে' না, ধার দেবে বলে' ? তুই শালাই তো বেশী দোষী। স্বামী না নিমুরোদে হলে বউ কি কখনো পরপুরুষে ভিড়তে চায় ? তোদের গলায় দড়ি জোটেনে ? তোরা বলে' আবার 'মজলিশ' হেঁকিয়ে বিচার করতে আসিস্!"

ওরা সবাই চলে গেল মাথা গুঁজে।

জয়নদ্দি খেয়ে উঠে শুতে গেল।

[illegible] বললে, "হক্ বিচারই ভাল। [illegible] ঘর বলো কি

একাবারে লাজলজ্জা উঠে গ্যাচে? তা যাবেই তো! করিমের বাপ নামাজী লোক—কোরআন শরীফ পড়ে, সে বলতে ছ্যালো, আখেরী জামানায় মানুষের ইমান থাকবে নে—আয়-বরকত কমে যাবে—দুধের স্বাদ চলে যাবে—কেতাব কায়দা সিকেয় তোলা থাকবে—মেয়েমানুষের লজ্জা শরম উঠে যাবে—একটা একটা পুরুষমানুষের পেছনে সাত সাতটা মেয়েমানুষ ঘুরবে—সেই আখেরী জামানাই তো চলতেচে।"

ঝম্ ঝম্ করে' হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি এলো।

শাউড়ীবৌয়ে এক সাথে একপাতে ভাত খেতে বসেছিল। বৃষ্টির ছাঁট এসে পড়তে লাগলো শকিনার পিঠের ওপরে। সরে গেল দেওয়ালের দিকে। ঘুমিয়ে পড়েছে জয়নদ্দি। ছেলেটা সেই অবেলা থেকে ঘুমোচ্ছে।

গাছপালাগুলো লুটোপুটি খেতে থাকে ঝোড়ো হাওয়ায়।

জয়নদ্দির মা আকাশের দিকে চেয়ে বলে, "আল্লা! ইয়া আল্লা! এই ভরা কোটালটার সময় দয়া করো গো আল্লা! পাঁচ মায়ের পাঁচজন করে' থাক!"...

"আল্লা মুখ তুলে ই-মোরশোমে চেয়েচে গো মা,—আজ একশো টাকার মাছ বেচেছে তোমার ব্যাটা।"

"পাঁচপীরের সিন্নি মানি পাঁচ আনার বাতাসা! আর এক আনার 'গাঁজা' বাবা গুনজের মল্লিকের।"

শকিনা বলে, "তোমার ঐ মনের মানসিক মা! ব্যাটার ঠিঁডে পয়সা নিয়ে মানসিক শোধ কচ্চনো? সেই বলেনে, বক্‌রিটার যেতি সুহিল্লে বাচ্চা হয়ে যায় তো দুটো মোষ বলি দোব! মোষের কতো দাম আর বক্‌রির কতো দাম? বলে, বাচ্চাটা হয়ে যাক্ তো—তারপর কে আর দিচ্চে!—তাই হয়েচে তোমার দশা! কতো মানসিক করো তো, আর দও?"

"কি করে' দোব? ব্যাটা কি পয়সাকড়ি দেয় মোর হাতে, যে দোব? চাইলে, বলে তোর আবার পয়সার কি দরকার? তুই হলি মোদের সম্সারের বিনি মাইনের ম্যানাজার—দেখবি-শুনবি খাবি-দাবি আর পড়ে-পড়ে নিদ্ যাবি!"

"আচ্ছা, পয়সা তোমাকে মুই দোব কাল। মানসিক শুধে এসো।"

ন'টার ভোঁ হয় মিলে। রাত কাজের লোক চলেছে ভিড় ভিড় করে'।

এ-পাড়ার জোয়ান ছেলে ছোকরারা প্রায় সবাই চলে যায় পাড়া বৌটিয়ে। জাত-ব্যবসা ভুলে দিয়েছে অনেকে। কিছু যারা আছে তারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে আধা-বখরায় পুকুর-খাল-বিলের চুনো-পুঁটি-চাঁদা-মৌয়োলা ধরে' বেড়ায়। খেপ্‌লা চুনো আর ফাঁদি জালই সম্বল ওদের। গাঁঙে নাবতে গেলে চাই সাহস, বুকের বল, রোদ ঝড় পানিতে টিকে থাকার ধৈর্য, চাই নৌকো জাল, চাই টাকা পয়সা। টাকা কই যে জমায় নৌকো নেবে? জয়নদ্দির মতো ক'জন শক্তভরসাওয়ালা আর বিশ্বাসী লোক মেলে যে তরবদির মতো লোকেও নৌকো ছেড়ে দেয়?

এ-পাড়ার জীবিকা অর্জনের ওপর ছুঁয়ে ছুঁয়ে মনের চোখ বুলিয়ে গেল যেন একবার শকিনা। হাঁড়ি-পাতিল বাসন-কোষণ গুটিয়ে রেখে এসে পান সাজতে বসে সে।

বলে, "ক'টায় আজ ডাকতে হবে হাঁ মা?"

"ভোরের দিকে তো জুয়ার—মাঝ রাতে। সে মুই ডেকে দোবাখন য্যাখন 'আজান স্যুর' তারাটা ঐ আম্‌লি গাছের মাথায় আসে ত্যাখন রাত দু'পহর হয়। পাতকোয়া আর প্যাঁচা 'ঝাল' (সমস্বরে ডাকা) দেয়। ত্যাখন ডেকে দোবাখন। ওলো বৌ মোর কোমর পিঠটায় এট্টু তেল দিয়ে দে তো। এই আমাবস্তে পুন্নিমের সময় বড্ড এঁকড়ে ধরে।"

শাউড়ীকে পান দিয়ে নিজে একটা পান গালে পুরে তেলের শিশিটা এনে উপুড়-হয়ে-পড়া শাউড়ীর কেঠো পিঠে বেশ করে' তেল মালিশ করে' দেয়। ঘরে গিয়ে ঘুমন্ত স্বামীর পায়েও তেল মাখিয়ে দেয়। তারপর আলোটা নিভিয়ে ঘুমন্ত ছেলেকে বুকে টেনে নেয়। ছেলেটা একটু কাঁদে। তারপর মায়ের বুক থেকে অমৃত শোষণ করে চোঁক চোঁক শব্দে। বাৎসল্যের স্নেহে ভেঙে পড়ে' ছেলের মাথায় মুখে চুমো খায় আর বুকের মধ্যে চেপে চেপে ধরে শকিনা। তারপর ছেলে ঘুমোলে এক সময় ভাবে, নামাজ পড়াটা বন্ধ হয়ে গেছে কদ্দিন হয়ে গেল। কাল থেকে নামাজ পড়বে।...

রাত বেড়ে চলে। গহিন গভীর রাত। ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে সারা জগৎ।

কিন্তু ঘুম নেই ভরবদি মাঝির চোখে। ঘুম নেই কুলসম বিবির চোখেও। কোলের ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ করে' পড়ে আছে সে। বসে বসে বিড়ি টানে আর পান চিবোয় ভরবদি। মামলাটায় হেরে গেল আজ সে। উকিল বললে সাক্ষীর গোলমালে গেল শুধু। মোটা ফাইন দিতে হলো—বারো শো টাকা—কম কথা! চরের অতোখানি জমিটা হাতছাড়া হয়ে গেল। বিচার নেই সংসারে। বদমাইস তারিণীকে ঘাড় মোটুকে ফেলে দেবে একদিন ওই পুঁটে মাঝির ঘোলে। ...আর গাঁয়ের ওপাড়ার লোকগুলোই-বা কি ছোটলোক! কেউ কেউ তারই নৌকো বায়, কাজকর্ম করে আর উল্টে সব নিমকহারামি! নৌকো থেকে ছাড়িয়ে দেবে ওদের।...হরেনের বৌটা আবার অমন কীর্তি করবে তা কে জানে! ভারি ধড়িবাজ মেয়ে তো!

বক্ বক্ করে কুলসম, "যেত বুড়ো হোচ্চ তেত বুড়ো-ভাম হোচ্চ তুমি? ছেরকাল একরকম! চোদ্দ বচ্ছরের ছেলে আর দশ বচ্ছরের মেয়ে—ওরা বুঝিন্ বোঝেনে উ-সব? ওদের সামনে মাগীটা 'লাক' লেড়ে সাত গাড়ি বচন দিয়ে গেল,—ছেলেটা মাথা গুঁজে ইস্কুলে চলে গেল—মেয়েটা মুখ ভারী করে' রইলো! ছি ছি ছি—আমি কি গলায় দড়ি দিয়ে মরবো? টাকা পয়সা হয়েচে—মান এজ্জৎ বেড়েচে—নামাজ্ পড়ো, রোজা করো—বয়েস হয়েচে— লোকেই-বা কি বলতেচে শুনে? আবার মাগীটা বলে কিনা মন্দ তোমার সাধ করে' দিয়ে ছ্যালো—তা একবার পরে' মান রেখিচি। মানী লোকের মান তো! না-রাখলে চলে? কপাল ঠুকে ঠুকে 'নিমাজ' পড়ে' কপালে দাগ করে' ফেলেচে আর পরের মাগের দোরে যেয়ে কাপড়-বেলাউজ দিয়ে আসে কেন? মালতীর মা শুনে গেল। পাড়ার সবাই শুনে ছ্যা ছ্যা করতেচে। শুনে থেকে যেন আমার মাথা 'কুড়ে' মরতে 'জু' (জাহান) চাইতেচে।" বলতে বলতে এবার কান্না জোড়ে কুলসম।

বিপদে পড়ে তরবদি। কি বলে' যে সে স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেবে ভেবে পায় না। মামলায় হারার অপমানের কথাও সে-মুহূর্তে মুছে যায় তার মন থেকে। বলে, "মাগীটা যে এতো পাজী তা কে জানতো! দোকানে দেনা, হরেন যা কাজকাম করে, টাকা নিয়ে নাকি মদ তাড়ি খেয়ে উড়িয়ে দেয়, ছেঁড়া কাপড় 'পিঁদে' ছ্যালো, বলতে বললে, 'দয়া হয় তো দওনা কাপড়-বেলাউজ কিনে, ভাবনু দিই কিনে, হরেনের দাম থেকে পরে কেটে লোবো —তা এমন বাচাল মাগী, শেষে কিনা আমারই মুখে উল্টে চুণকালি দিতে চায়, দাঁড়াও, কাল সকাল হোক্, তুই মেয়েমদ্দকে ধরে কেমন পাট কাছ্‌ড়াতে হয় কাছ্‌ড়াবো। মেয়েটা ভাল আছে? তবু যেতি না"…

"থাক্ থাক্। অতো আর 'শাগ' দিয়ে মাছ ঢাক্‌তে হবেনেকো। তুমি ভারি সৎ, তাই না-হক পরের বৌয়ের নামে 'বেলেম' দও। তোমাকে তো আর জানতে বাকি নেই আমার।"

মেজাজটা এবার দপ করে' জ্বলে ওঠে তরবদির। উঠে এসে কুলসমের টুঁটিটা টিপে ধরে' চাপা কর্কশ স্বরে পশুর মতো গর্জে ওঠে, "সাবাড় করে' দোব হারামজাদী মাগী!—চুপ কর! করবি চুপ? আমি যাই করি, তোর বাবার কি?"

তরবদির হাতে কীল্-চড় মেরে আঁচড়ে কামড়ে নিজেকে মুক্ত করে' নিয়ে উঠে বসে কুলসম। চোট-খাওয়া শঙ্খিণীর মতো গরজাতে থাকে, "চুপ করবো? কি অন্যায় করিচি? পথেও হাগ্‌বে চোখও রাঙাবে? বাপ তুলে কথা বলতে লজ্জা পায়নে?"

. কুলসমের চেঁচামেচিতে ছেলেমেয়েরা উঠে পড়ে সকলে। ঘুম ভেঙে যায় পাশের বাড়ীর লোকদের। কালো কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে। কোলের বাচ্ছাটা চীৎকার জোড়ে। চেঁচাতে থাকে কুলসম, "মারো না—মারো,—মেরে ফ্যালো—গলায় পা তুলে দিয়ে জিব টেনে ছিঁড়ে ফ্যালো—তবু আমি বলবো"—

"বল্‌বি!" —চুলের মুঠি ধরে মাটিতে পেড়ে ফ্যালে তাকে তরবদি।

হাসান আর রাহিলা কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে দুজনে বাপের হাত ধরে টানতে থাকে, "বাবাজী গো—ছেড়ে দাও—মা মরে যাবে!"…

"যাক, শালী মরুক! মেয়েমানুষ গেলে মেয়েমানুষ হবেনে? টাকা নেই আমার?"

ছেলে আর মেয়ে—দুজনে মিলে বাপকে ঘর থেকে টেনে বার করে' আনতে, ছাড়া পেয়ে আবার কাঁদতে কাঁদতে তারস্বরে চেঁচাতে থাকে কুলসম, "পাপী জাহান্নামী, মিনি দোষে তুমি আমাকে মারো—হাত তোমার খসে যাবে—ঠুঁটো জগন্নাথ হবে! টাকার গরম হয়েচে?—আল্লা তোমার গরম কাটাবে! তিনতালা পাকাবাড়ী করবে বলে বনেদ করিয়েচ—সে-সবও আল্লার রহমতে খসে খসে পড়বে! টাকার তোমার ছারপোকা হবে—গোঁ-পোকা হবে—বিছে হবে—হয়ে তোমাকে 'ডংশাবে'—লোকের গলার পা তুলে দিয়ে—তাদের মেয়ে কেটে উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে ঐ টাকা করেচ তো তুমি! তাদের অভিশাপ লাগবেনে? কোথেকে এতো নৌকো হলো—কোথেকে এতো জাল হলো—কোথেকে এতো জমি হলো? পঞ্চাশ সালের আকাল-'মনিন্তরে'র বচ্ছরে এক মন ডেড় মন ধানের বদ্‌লি এক বিঘে ডেড় বিঘে জমি লিখে লওনি? লঙ্গরখানার দুশো মন চাল ডাল পুলুশের ভয়ে পুকুরে ডুবিয়ে রেখে পচিয়ে দওনি? গরীবের গলায় পা তুলে দিয়েই তো তোমার টাকা! নাহলে কিসের বলে এতো তেজারতি তোমার আজ?" রাহিলা বারবার মায়ের মুখটা হাত দিয়ে চেপে ধরে আরবার বার খুলে ক্যালে কুলসম।

হাসানকে ছিটকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এবার ঘরের মধ্যে ছুটে রায় তরবদি। মারে এক আষাঢ়ে লাথি স্ত্রীর পাঁজরে। কোঁক্ করে' মুখ গুঁজে পড়ে যায় কুলসম। বোল্ বন্ধ হয়ে যায় তার। গোস্বাভরে বেরিয়ে আসে তরবদি—বাইরে দোর খুলে একেবারে সদোরের সামনে। বড় মেয়েটা কাঁদছে, "ওগো কি হবে গো—দাঁতি লেগে গ্যাচে গো—দাদা পানি দেনা"—

বাইরে থেকে তরবদি কর্কশ স্বরে উচ্চারণ করে, "মরুক! বুড়ী ধেড়ী মাগী মরলে আমি বাঁচি!—ওখেনে সব কারা?" হেঁকে শুধোয় সে।

"আমি গো চাচা—জয়নদ্দি, জালে যাচ্চি।"

"শোন্, ই-দিকে আয়।"

অন্ধকারে দুজনে এগিয়ে আসে।

"আর কে, কানাই? বস্—বিড়ি দে।" শান্ত হতে চেষ্টা করে ভরবদ্দি। জয়নদ্দি তাড়াতাড়ি বিড়ি দেয়াশলাই বার করে' হাতে দেয়। ভয়ে ভয়ে বলে, "কি হয়েচে চাচা?"

ভরবদ্দি বিড়ি ধরায় প্রথমে। দু'টান মারে। ধোঁয়া ছাড়ে। দু'একবার কাশে। তারপর বলে, "মেয়েমানুষ হলো শ্যায়তানের চাদর।...'মেয়ে-মানুষ জব্দ কীলে, আর কিটোনো মান-কচু জব্দ তিলে।'—হাঁ র‍্যা, হরেন কোথা?"

"আসেনে।" বলে কানাই। তার ভায়রা-ভাই এয়েচে—বৌ ঘরে—কি করে' আসে?"

"হু!" মাথা নাড়ে ভরবদ্দি। "দুপুরেও জালে যায়নে তাহালে? ভায়রা-ভাইকে ডাক্‌তে গেস্‌লো? শালাকে কাল থেকে আমার লৌকোয় যোত উঠতে দিবি জয়নদ্দি। যেত্তি উঠতে দিস্ তাহালে তোর একদিন কি মোর একদিন।"

মুচ্‌কে একটু হাসে জয়নদ্দি, বলে, "মুই উঠতে দোব কেন চাচা, সে নিজেই বোধ হয় আর তোমার লৌকোয় উঠবেনে।"

"কেন উঠবেনে?" রুখে ওঠে ভরবদ্দি।

"জানের ভয় তো আছে! তুমি কি রকম লোক সে কি আর এ্যাদ্দিনেও চিন্‌তে পারেন? তার বৌকে নাকি তার কুন্ শালা ভায়রা-ভাই এসে কাপড়-বেলাউজ দিয়ে গ্যাচে;—তুমিও তো কাল বললে—সেই লিয়ে ভজন-কুজন—মারামারি—বিচার আমার কাছে গেস্‌লো—দূর করে' তেড়ে দিইচি। বলিচি মেয়েমানুষ জব্দে রাখতে পারেনে যে সে-শালা ফের একটা মানুষ! মেয়েমান্‌ষের যাতে বদনাম রটে তাই করলে তাকে লিয়ে ঘর করবি কি করে?' বলতে গুম্ হয়ে চলে গেল সব।—তা চাচা কাজটা ভাল হয়নে!"

"বড্ড ভদ্দরলোকের পানা নিজের পিঠ বেঁচিয়ে বেঁচিয়ে কথা বলতিচিস্ যে রে জয়নদ্দি! উ-মেয়েটাকে তুই চিনিস্? ভাল আছে উ?"

ব্যস্ত হয়ে বলে জয়নদ্দি, "চুপ চাচা, চুপ! ওরা ছোটলোক—ছোট-জাত—তুমি তো তা লয়—উ-কথা বললে তোমারই মান এজ্জৎ যাবে—নিজের থুথু নিজের গায়ে পড়বে। সামান্য একটা জিনিসের জন্যে ছ্যাথোদিনি তোমার

সংসারে কি অশান্তিটা বেধেচে।”

চুপ করে’ যায় তরবদি। না, কথাটা মন্দ বলেনি জয়নদ্দি।

বাড়ীর মধ্যের কোলাহল শান্ত হয়ে গেছে ততক্ষণে।

জয়নদ্দি বলে, “শালা, বৌ হলো গো-বেচারী বক্রী-খাড়ি,—তাকে মেরে কুনো বীরত্ব আছে? সে তোমারই বলো আর আমারই বলো? তা যাক্ সে কথা,—‘মাওলা’র কি হলো চাচা?”

“হেরে গেনু বাবা!” একেবারে ভালমানুষ বনে’ যায় যেন এবার তরবদি।

চুপ করে’ থাকে জয়নদ্দি। পরে বলে, “হারজিত কপালের খেলা। তবে কেউ কেউ বলে টাকা চাল্লে নাকি হক্কে গর-হক্ করা যায়। কিন্তু টাকা কি তোমার কম গ্যাচে? তারিণীর ওপরে এখন লক্ষ্মীর নজর পড়েচে তাই।” জয়নদ্দি যেন কত দরদ দেখিয়েই না ওর পক্ষে কথা বলছে!

“হুঁ, তাই বটে!” দীর্ঘশ্বাস ফ্যালে তরবদি! তারপর বলে, “কতো মাছ পেলি?”

“পাঁয়তাল্লিশটা!”

“পাঁ-য়-তা-ল্লি-শ-টা!! দিনের বেলা?”

জয়নদ্দি বলে, “দু’ক্ষেপ দিনু। পয়লা পাঁচটা। তারপর তিনটে কাজল-গৌরী—লিইচি মোরা তিন ঘরে—আর একটা জলপানির দাম। পঞ্চাশ টাকা কুড়ি দিইচি। মোট ঊনপঞ্চাশটা পড়ে ছ্যালো, বাদ-সাধ দিয়ে পাঁয়তাল্লিশটা।

“কই—টাকা?” শুধোয় তরবদি।

“সকালে দোব বলে’ আনিনি তো এতো রাত্তিরে! একশো টাকা দিয়েচে পদী। বাকীটা কাল দেবে।”

তরবদি বলে, “তোর ভাঙাঘরে অতো টাকা রেখে জালে যাচ্চিস্? ভরসা তো নিজে লয়! জালে না-যেয়ে মোর দোকানের বাকি টাকার ভয়ে কেউ যেত্তি তোর ঘরে সিঁদ দেয় তো”…

“সব্বনাশ হবে চাচা, কানাই বস্ এট্টু, টাকাটা এনে দিই চাচাকে।” জয়নদ্দি চলে গেল অন্ধকারের মধ্যে। ও চলে যেতেই বলে তরবদি, “ব্যাটা বড্ড ধুত্তু!…কিন্তু একটা গুণ আছে ওর—হক্ কথা বলে। আর, হাঁ র‍্যা

কেনো, কটা মাছ বললে ?" বাচাই করে' ভাথে আবার তরবদি তুলে ধাবার নাম করে'।

"ছ'কুড়ি পাঁচটা। না চাচা, উ-কক্ষনো মাছ হড়োয়নে।" দৃঢ় স্বরেই বলে কানাই।

"আর ঐ একটা গুণ ওর। সাধে কি আর অমনি মুখ দেখে ওকে জাল-লৌকো দিইচি।"

কানাই ঘুষ্‌ ঘুষ্‌ করে একটা কথা বলবার জন্তে। ভাবে থানিকটা। কালো কুকুরটা এসে কানাইয়ের গা শোঁকে। তরবদি আদর করে তাকে। একটা হ্যারিকেন দিয়ে যায় হাসান।

কানাই বলে, "একটা কথা বলবো চাচা ?"

"বল।"

"মোর বউটা তোমাদের বাড়ী কাজকাম করে—গো'ল কাড়ে, চরকা ঘুরোয়, জাল বোনে, শুকৃটি ঘাঁটে, রাতদিন আসে, কই আমি কুনোদিন কিছু বলিচি ? চাচী কতো ভালবাসে—এটা-সেটা দেয়—তুমি কতো ভাখো, আর হরেনের বৌটা কি গো—এঁ্যা ! বলে কি—ছ্যা ছ্যা..."

"হে হে কলিকাল ! ওকেই বলে, 'যারই শিল তারই নোড়া, ভাংবো তারই দাঁতের গোড়া' !" মাথা নেড়ে নেড়ে চারিয়ে চারিয়ে বলে তরবদি।

পদ্মীর ব্যাপারে একটা মিথ্যা সন্দেহের আক্রোশ ফেনিয়ে উঠেছে কানাইয়ের মধ্যে জয়নদ্দির বিরুদ্ধে, যখন থেকে সে মদ কিনতে পাঠিয়েছিল তাকে, সুযোগ বুঝে। তাই বলে সে, "আর একটা খবর জানো চাচা"—ফিস্‌ ফিস্‌ করে' তরবদির কানের কাছে মুখ আনে কানাই, "জয়নদ্দি জানতে পারলে বড্ড মারবে আমাকে—থাক্‌ বলোনিকো।"

খুব নরম স্বরে কৌতূহলী হয়ে বলে তরবদি—"বলনা শুনি। বলবোনি কাউকে।"

জয়নদ্দি না, "না বলবোনি চাচা,—সে জানতে পারলে মেরে আমাকে খুন করে' ফেলবে !"

জয়নদ্দি চোয়াড়ে লেঠেল। আড়জাই চেহারা। বুনো শূয়োরের মতন গোঁয়ার—একরোখা। তা ভালই জানে তরবদি। কিন্তু কি বলতে চায়

কানাই? ওর মতো জোয়ান মর্দও অতো ভয় করে জয়নদ্দিকে? তাড়া দিয়ে বলে তরবদি, 'আমার কাছে বলবি তার অতো ভয় কিসের?"

"না, ভয় আর কিসের! ব্যাপারটা কি জানো চাচা, জয়নদ্দি নাকি তোমার নৌকো ছেড়ে দেবে। তারিণীর সাথে কথা চালাচ্চে। একশো ট্যাকা দিয়ে তার নৌকো জমায় নেবে আর জাল বোনাও শেষ হয়ে গ্যাচে। কালকে গাব দেবে, চাকা চোঁঙা সব কিছু সাইজ করা আছে।"

"ও এই খবর! তা বেশ তো—ভালই তো—নিজের পায়ে নিজে ভর দেবে—ভালই তো। উ-নৌকো ছেড়ে দেয়—তুই তো আছিস্— মাঝিগিরি করবি।"

কালো কুকুরটা লোল জিভ বার করে' লালা ঝরায় ধুঁকতে ধুঁকতে।

"দেবে চাচা আমাকে নৌকো-জাল?" পায়ে হাত দিয়ে সোৎসুক্যেই শুধোয় কানাই।

ওর লোভ বা স্বভাবের পরিচয় তরবদির অজানা নেই! তাই বেশী আমল না দিয়ে বলে, "তারিণীর সঙ্গে তাহালে ঘোঁট পাকাচ্চে?"

"আর গাঁঙ্ধারে দু'বিঘে ধানজমি আধাআধি বখরায় ভাগ-চাষে নিয়েচে, জানো?"

"না তো!" বিস্ময়বোধ করে তরবদি।

"হেঃ! 'তলা' ফ্যালা হয়ে গেল, ধানচারা গজিয়ে গ্যাচে এক-আঙুল করে'।"

জয়নদ্দি তাহলে বাড়তে চায়? বড় হতে চায় সমাজে? ভাল—ভাল। ভাবে তরবদি। না-খেয়ে না-দেয়ে টাকাকড়ি জমিয়েছে তাহলে কিছু।

কানাই বলে, "হরেন জালে গ্যালোনি বলে' আমার বুড়ো বাপটাকে নিয়ে গেনু, নৌকোয় খাটুনি এই বয়সে কি আর গতরে সয়? জরে হুঁস-পবন নেই দেখে এনু।"

তরবদি বলে, "মেয়েটাও তো তোর সোমত্ত হয়েচে—মোর কাছে ঘুরঘুর করে এসে, এটা-সেটা দিই, তুই আবার বলিস্নি যেন"...

"কি যে বলে চাচা!" লজ্জায় যেন মরে যায় কানাই।

"আর বল্লেই হলো, যে কলিকাল পড়েচে! লোকের কি আর ইমান

আছে রে বাবা! তা যেত্তি তোর মেয়ের পসন্দ হয় তো মোকে না হয় জামাই করিস্।"

হে হে করে' হাসে কানাই। হিঁ হিঁ করে' বাড়ীর ভেতর থেকে একটানা কান্না ভেসে আসে। তরবদি কান পাতে। তারপর সহানুভূতির সুরে বলে, "পরের ওপরে রাগ করে' শালা লিজের মেয়েমানুষটাকে মারছুন্! যেমনি পরের কথা শুনে লাচে! মেয়েমানুষের সহ্ সবুরী নেই? মদ্দমানুষ হলো বাজপাখী, সে কোথা থেকে কি করে' ছোঁ মেরে এঁচড়ে কেমড়ে লিয়ে আসে তার ভাল-মন্দর হিসেব লেবার তুই কে? টাকা-পয়সা এমনি হয়? দু'দিন সংসার চেলিয়ে ছাখ্‌না, কতো ধানে কতো চাল হয় বুঝবিখনে।—তা হাঁ র‍্যা কেনো, হরেনের বুদ্ধিতে তো ই-কাজ হয়নে—তার ভায়রা-ভাইকে কথা ভজাবার জন্যে ডাক্‌তে পাঠালে কে?"

"সে কথা কি আর বলে দিতে হবে চাচা?" বলে কানাই।

"হুঁ! জয়নদ্দি। বোকা পাঁটা হরেনটা জানেনে যে তার বৌটার সাথে কার মনের মিল আছে। তাই তো হরেনের দিকে অতো টান জয়নদ্দির। সেই জন্যেই তো মোর ওপরে অতো হিংসে। যাক্, যে শালা যাই করুক! কেনো, তুই লৌকো লিস্—অবিশ্বাসী কাজ করিস্‌নি।—ছেলে ছাখ্ তোর মেয়ের বে' দিয়ে দোব—তোর বৌটা মোর সংসারে এতো খাটেখোটে—সেটাও মোর কত্তব্য। আর উ-ব্যাখন লৌকো ছেড়ে দেবে তার আগেই লৌকো লিয়ে লওয়া ভাল।"

কানাই একেবারে গলে' জল হয়ে যায়। খুশীতে পানি এসে যায় তার চোখে। তরবদির পায়ে হাত দিয়ে গদ গদ স্বরে বলে, "হুজুর, তুমি হলে গরীবের মা বাপ—তুমি হলে আমাদের গেরামের হাজার লোকের মাথা! তোমার মতন"...

এসে পড়ে জয়নদ্দি। তাড়াতাড়ি একটু সরে বসে কানাই। আড়চোখে তার দিকে একবার তাকায় জয়নদ্দি। মনে মনে হাসে। ভ্রুক্ষেপ না করে' বলে, "এই লও চাচা টাকা, সব এখন রাখো। কাল সকালে হিসেব হলে দিও। চ' কানাই—জোয়ারের আর দেরী নেই।"

তরবদি নোটগুলো গুণে নেয়। তারপর বলে, "আর একজন লোক কোথা

পাবিখনে ?"

জয়নদ্দি বলে, "দেখি, গুলেকে পাবোখনে হয়তো। হয়েন আস্‌তো—আমিই বারণ করে' দিইচি—আসাও ঠিক লয়।"

তির্যক কটাক্ষে তাকিয়ে শুধোয় তরবদি, "কেন ? বউকে চৌকি দেবে ? হেঃ ! শালা, একেই বলে কালের বিচার—সে লোকটা মেয়েটাকে বাপের মতন ছেলেবেলা থেকে মানুষ করলে আর তাকেই আজ 'সন্দ,' লয় ?"

জয়নদ্দি বলে, "বাপের মতন মানুষ করেচে—বাপ লয়– ভগ্নিপতি,–তার সঙ্গে রসের সম্বন্ধ–তাছাড়া ঘি আর আগুন···কত্তো মুনি মাহাজনের মাথা গোলমাল হয়ে যায় !"···

"থাক্ থাক্, তোকে আর বেশী বক্তিমে দিতে হবেনে। যা যা, জালে যা। হাঁ, শোন্, তারিণীর কাছ থেকে নাকি তুই জমি লিইচিস্ ?"

"হাঁ, ভাগ-চাষে।"

"লোকোও লিবি তাহালে ?"

"তুমি তো আর দু'বখরা লেবেনে—তাই। লোকো জমা লোবো।"

"জাল করিচিস্ ?"

"হুঁ।"

"এ্যাদ্দিন তোর কুন্ বাবা চালালে ?" হঠাৎ রেগে উঠে তরবদি।

তার দ্বিগুণ তপ্ত হয় জয়নদ্দি। কিন্তু লোকটা মামলাবাজ—তারপর নিজের বাড়ীতে বসে আছে–মারলে দোষ হবে। খামোস খায়। মাথা গরম করলে চলবে না। তাহলে সব আশা ভেস্তে যাবে।

তাই মনের গরম মনে চেপে বলে, "জানি চাচা, তুমিই আমার সম্‌সার চেলিয়েচ ! আমার বাপেরও সম্‌সার চেলিয়ে ছ্যালে।"

"কের ঠাট্টা ! তোর বাপের পিঠে দু'ঘা লাথি মারলেও কথা কত্তোনি আর তুই তার ছেলে হয়ে কিনা"···

"বাপ আর ছেলে এক লয় চাচা। যুগ পেল্‌টে গ্যাচে। মোর বাপের বাপ-কেলে লৌকো জাল জমি সব ছ্যালো–তুমি তার এমন সম্‌সার চালালে যে বেচারী না-খেতে পেয়ে মাছচুরির দায়ে তোমার হাতে মার খেয়ে মরলো 'শুকো' ধরে' এসে 'লৌ' (রক্ত) হেগে হেগে। দোকানের দেনা শুধ্‌তেই তার

মাছের অংশটাই শেষ হয়ে গেল! আর আমার সমস্যারও ঢের দিন হলো চেলিয়েচ—তা, বেত্তি সাধ যায় তো মোর পিঠে নাহয় দু'ঘা লাথি মেরে লও!"

"জয়নদ্দি!"—চেঁচিয়ে ওঠে তরবদি।

"চাচা!" বিনয়ের সুরে কথা বলে যেন জয়নদ্দি যদিও সে কাঁপছে গর গর করে'।

"বড্ড বাড় বেড়েচ তুমি। লৌকোর ধারে-বাড়ে ঘেঁষনি তুমি আর আমার!"

"বেশ। সে তোমার লৌকো তুমি যাকে খুশী দিতে পারো। আমি তো জমা লিইনি। তবে মোর টাকা ফেলে দও।"

"সে কাল সকালে। বাকি টাকাটা আন পদার কাছ থিংে, তারপর দোকানের দেনাটা কেটে লোবো। হরেনকেও দোকানের দেনা শুধে যেতে বলিস্। নাহালে তাদের মেয়েমদ্দকে ন্যাংটো করে' কাপড় খুলে লোবো। বড্ড মান এজ্জৎ তাদের! শালা ছোটলোকের আবার মান এজ্জৎ! চ' কানাই—দেখি, আর দুজন লোক দেখে দিই তোকে।"

জয়নদ্দি শুধু একবার ক্রূর চোখে তাকায় কানাইয়ের দিকে। তরবদি বলে, "আচ্ছা সালাম চাচা—মুই যাই—নিজের চরকায় তেল দিই যেয়ে।" হন্ হন্ করে' চলে গেল জয়নদ্দি।

দাঁতে দাঁতে একবার কড়মড় করে' উঠলো তরবদি। অস্ফুটে বলে, "বেইমান শালা! ফাঁদাও মজা দাখাচ্ছি।"

গুম্ হয়ে ভাবতে ভাবতে জয়নদ্দি এসে পৌছায় হরেনদের বাড়ীর গোড়ায়। হাঁক দেয় সে, "ও বেই, দোর খোল্ শীগ্‌গির।"

কোনো সাড়া-শব্দ করেনা কেউ। হয়তো ভয় পেয়েছে, তরবদিকে করে' এনেছে মনে করে'। এখনি তো ঘুমিয়ে পড়ার কথা নয়—এ আগে ডেকে গেছে। দোরের ওপরে বার-দুই জোরে জোরে লাথি ম

"হরেন চন্দ্র মণ্ডল, বাড়ী আছ নাকি হে! তোমার ভগ্নিপতি এয়েছি, দোর খোলো।"

নিঃশব্দে দোরটা খুলে দেয় কে যেন অন্ধকারে। হরেন। হাতে তার কাটারি!

জয়নদ্দি হাসে। জানে সে ওকে এখন যদি জোরে একটা তাড়া মারে তো কাটারি ফেলে দিয়ে বাপরে বলে চিৎপাত হয়ে পড়বে।

হরেন বলে, "বেই তুমি! এসো। আমি মনে করি সেই শালা মাহাজন এয়েচে তোমার সাথে।"

জয়নদ্দি কাদা পায়ে এসে ওঠে দাওয়ায়। বাইরের দোরটা এঁটে দিয়ে আসে হরেন।

জয়নদ্দি বলে, "তোর ভায়রা-ভাই কোথা—জেগে আছে?"

"না, ওই পাশের ঘরে ঘুমোচ্চে।" আলো জ্বালে হরেন ঘরে ঢুকে। জয়নদ্দিও ঘরে ঢোকে। সিন্ধুর শোয়া দেখে লজ্জায় পড়ে হরেন। জয়নদ্দি যে ঘরে ঢুকবে ভাবেনি তা সে। অথচ বলতেও পারেনা কিছু। বলে, "পা-টা বাইরে রেখে বিচ্‌নাতেই চেপে বসো বেই। মাগীর ঘুম ত্যাখোনা—কি রকম করে' পড়ে আছে! হেই শালী, ঘুরে শো!" হাতের ধাক্কা মেরে পাশ ফিরিয়ে দেয় হরেন।

হাসে জয়নদ্দি। বলে, "মেয়েদের স্বভাবই ঐ। একবার ঘুমোলে তার মুণ্ডু কেটেই লিয়ে যাও আর যাইই করো, কুনো খেয়াল থাকেনে!"

সিন্ধু কিন্তু জেগেই ছিল, ছল করে' পড়ে, চোখ বন্ধ করে', এলো মেলো হয়ে, অভিমান ভরে। হরেন হাতে-পায়ে ধরেছে অনেক। একটা কথাও বলাতে পারেনি। কামনার কাঁটায় ওকে ক্ষত-বিক্ষত হতে ত্যাখাই বোধ হয় অভিমানিনী সিন্ধুর চরম আনন্দ।

জয়নদ্দি বলে, "দোরটা ভেজিয়ে দে। কথা আছে। তরবদির সঙ্গে আদায়-কাঁচকেলা হয়ে গেল।"

কৌতুহলের সঙ্গে—"কেন, কেন?" বলে' দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে এসে বসে হরেন। বিড়ি ধরায়।

জয়নদ্দি বলে যায়, "জালে যাচ্ছিনু, গুনমু ওর বাড়ীর কাছে যেয়ে, বৌকে

হররদম পিটুতেচে ভরবদি। ছেলেমেয়েগুনো চেঁচাচ্ছে। কি কাটা কাটা বোল দিচ্ছে মাগী! তারপর বাইরে এসে মোদের সাথে ছ্যাখা। তোর খোঁজ লিলে। লৌকোয় যাস্নি, ভায়রা-ভাইকে ডাকতে গেস্লি শুনে রেগে আগুন। বললে, 'ওকে আর লৌকোর কাজে লিস্নি।' তারপর মাছের দাম চাইলে—আজ উনপঞ্চাশটা মাছ পড়ে ছ্যালো! বাদ-সাধ দিয়ে পঁয়তাল্লিশটা। বললে, 'অতো টাকা তোর ভাণ্ডাঘরে রেখে এইচিস্ কুন্ ভরসায়।' তোর দোকানের দেনা—মারের ভয়ে যেতি মোর ঘরে সিঁদ দিয়ে লিয়ে পালাস্? শালার পো'র কথা শোন! তা টাকা লিয়ে আসতে ঘরে যেতে কেনোটা মোদের ঘরের সব কথা তাকে ফাঁস করে' দিয়েচে। বেইমান শালা! মুই যে তারিণীর জমি লিইচি—তার লৌকো জমায় লোবো আর জালও করে' ফেলিচি—সব খবরই কেনো তাকে দিয়েচে। মুই মাঝি ছেমু—ডেড় বখরা মোর পাওনা—বল্, তোদের কাছ থিঙে লিইচি তা কু:নাদ্দিন? সমান বখরা করিচি তোদের সঙ্গে। তবু কানাই হারামিগিরি করলে। করুক—মাঝি হতে চায়, হোক। ভালই তো।—টাকা লিয়ে বললে, 'হরেন তাহালে তোর কথাতেই লাচ্‌তেচে? তারিণীর সাথে জোট পাকাচ্চ? এ্যাদ্দিন তোর কুন্ বাবা দেখে ছ্যালো—-আমি খামোস খেয়ে গেছি বজ্ড। ঝগড়া হয়ে গ্যাচে। লৌকো ছেড়িয়ে লিয়ে কেনোকে দিয়েচে। সে খুব পায়ে হাতে ধরেচে তো! টাকার হিসেব কাল হবে। তা হ্যাঁ রা, ওর দোকানে তোর দেনা কতো? কাল না-দিলে যে মারধোর করবে!"

বোবা চোখে তাকায় হরেন। বলে, "তা কি করে' জানবো? ওই মাগী যেয়ে য্যাখন ত্যাখন বাজার আনে—কতো ওদের খাতায় তো সব"...

"মর শালা! —কি করবি?"

মাথা নীচু করে' মেঝের মাটিতে আঁক কাটে হরেন।

নড়ে চড়ে সিন্ধু। গায়ের কাপড়টা ঠিক করে' নেয়। তাকায় তার দিকে জয়নদ্দি। গোপনে অল্প একটু চোখ খোলে সিন্ধু। জয়নদ্দির চোখ পড়ে। ঘুমোয়নি তাহলে ও! মুচ্‌কি হেসে পাশ ফিরে শোয় সিন্ধু। জয়নদ্দির বুকের ভেতরে একটা অপূর্ব স্পন্দন জাগে। ঢেউ ওঠে। নাচে। বিচিত্র বর্ণ সাপের মতো পাক্ খায়। আদর করে' দক্ষ সাপুড়ের মতো ধরে' তাকে

ঝাঁপিতে পুরে রাখতে চেষ্টা করে' জয়নদ্দি বলে, "যাক্, কাল হিসেব হোক্, আমার সাথে যাস্। ভোরের বেলা উঠেই আমার কাছে চলে যাবি—দু'জনে তারিণীর কাছে যাবো। এসে পদীর কাছ থেকে টাকা এনে হিসেব করে' তরবদির দোকানের দেনা মিটোবো। আর কাল দু'জনে মিলে জালটা বেঁধে ঠিক করে' ফেলবো।"

"আচ্ছা!" আশার আলোর সন্ধান পেয়ে বিনয়ে যেন গলার স্বরটা কেঁপে ওঠে হরেনের।

জয়নদ্দি বলে, "কাউকে কুনো কথা বল্‌বিনি। আর কাশেমকে বলিচি, কলের বর্দলি কাজে তার চলেনে, মোদের লৌকোর কাজ করবে। ভারী বার্ধাটা নাব্‌লে তিনজনে মিলে জমিটা রুয়ে লোবে—'রোজ' দোবো তোদের। উ-পাড়ার আয়দালিকে হালের কথা বলা আছে। 'আগো'-ভাঙা হয়ে গ্যাচে—ধঞ্চে দানাও ছড়িয়ে দিইচি। আর উ যা পলিপড়া জমি—সার বা গোবর না-দিলেও চল্‌বে।"

তারপর কতক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে দু'জনে। বিড়ি টানে। লম্ফের শিখাটা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে লম্বা শীষ্ তুলে জলে স্থির হয়ে। বেঘোরে গাঢ়-ঘুমে-ঘুমোনের সশব্দ নিঃশ্বাস পড়ে সিন্ধুর। মনে মনে হাসে জয়নদ্দি। বলে, "বেনকে ডাক্! একটা পান দিতে বল্!"

হরেনের কালো চ্যাপ্টা মতো মুখটা কেমন যেন অদ্ভুত ত্রাথায় লজ্জার হাসি হাস্‌তে। বলে সে, "উ-শালী এখন উঠ্‌বে? যে ঘুম—এই হাই স্থা'—" ঠেলা মারে হরেন।

"উঃ—!" জোরে বিরক্তিসূচক শব্দ করে' ঝোনা মেরে তার হাতটা সরিয়ে দেয় সিন্ধু।

জয়নদ্দি বলে, "থাক্—রাগাস্‌নি আর! একেতো বেচারীকে মারধোর করিচিস্ এসে! শুধু মারলিই কি হয়—ওরা হলো খাঁচার পাখিরে—সোনার শেকল যেমন পরিয়িচিস্ তেমনি যত্নও করতে হবে? নাহালে শুকে মরবে কিম্বা শেকল কেটে পালাবে!" কবির মতো কথা বলে যেন জয়নদ্দি।

হরেনের রাগ হয় পান সাজতে সাজতে। কেন, কি দরকার তার বৌয়ের সম্বন্ধে এতো কথা বলবার?

পান দিয়ে বলে, "নিজের বৌকে ই-সব কথা বলিস্ বেই ?"

"ওরে বাপরে ! তা বল্‌লেই বল্‌বে, তবে একটা গয়না গড়িয়ে দও !" জয়নদ্দি এমন নাটকীয় ভঙ্গিতে কথাটা বলে যে না-হেসে পারে না হরেন। আর সিন্ধু তখন মুখে দু'হাত চেপে উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে উঠছে হাসি চাপ্‌বার জন্যে। জয়নদ্দি চোখ ইসারা করে' আখায় হরেনকে। হরেন লজ্জা পেয়ে ভাবে, দেবে নাকি সিন্ধুর পিঠে একটা লাথি ! এতোক্ষণ তাহলে জেগেই ছিল ! জয়নদ্দি যখন এলো ? মেয়েমানুষ কতো ছলাকলা-ই না জানে !

জয়নদ্দি বলে, "যাই আমি, ভোরেই যাস্ কিন্তু।"

"আচ্ছা।" দোর বন্ধ করে' দিয়ে বায় হরেন সদোরের।

চারদিকে জোকাক অন্ধকার।

জিউলি গাছের আঁধার জড়ানো কালো মূর্তিটাকে ভূতের মতো মনে হয়। সোঁয়া পোকায় ছেয়ে গেছে গাছটা। পায়ে লাগলে ভীষণ কিটোয়। রূপোদের বাঁশঝাড়টার নীচের খিড়কীর দিকের রাস্তাটা পানি জমে জমে এক হাঁটু কাদা হয়েছে। গাব গাছের ঝোপের মধ্যে বাদুড় ঝটপট্ করে। উল্কা ছিটুকে পড়ে আকাশে। ঝিল্লীরা ডেকে চলে একটানা। শিয়াল ছুটে পালায় পাশ দিয়ে। একটু দূরে গিয়ে মাটি আঁচড়াতে আঁচড়াতে চীৎকার ছাড়ে হুয়া হুয়া স্বরে।

"তামুক খেয়ে যাও বেই মশায়, তামুক খেয়ে যাও।" বলে জয়নদ্দি শিয়ালটাকে। তাড়া দেয় তারপর—"লুয়ো—লুয়ো ! আতু ! —ভাগ্ শালা !" ছুটে আসে একটা কুকুর ঝাঁ ঝাঁ করে'। জয়নদ্দি লেলিয়ে দেয় তাকে শিয়ালটার দিকে।

হেনা ফুলের গন্ধ আসে কবরডাঙা থেকে। আস্‌মত্ মোল্লার কবরে গরু পড়ে গিয়েছিল হারাদের, টেনে তুলে দিয়েছিল জয়নদ্দি একাই। মোল্লা সায়েব বড় ছোরা দিয়ে গরু-বকরী জবাই করতো হাসাং করে'। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটতো তীর বেগে। আর সেই গরম রক্ত পড়ে' পড়ে' হেজে

গিয়ে একটা হাত ঠুঁটো হয়ে গিয়েছিল ঘা হয়ে পচে খসে'। সে এখন দোজখে গেছে না বেহেস্তে গেছে কে জানে! ···হাজরাদের পুকুরে বড় সোনার ঘাই শোনা যায়।

জেগেই ছিল বুড়ী। ছেলের সাড়া পেয়ে এসে দোর খুলে দেয়। বলে, "ক্যের যে এলি?"

জয়নদ্দি বলে, "না মা, তরবদির নৌকো আর বাইবোনি।"

ভয় পায় বুড়ী মা, বলে, "ক্যানরে, ঝগড়া মারামারি করে' এলি নাকি?"

ছ্যাঁচে দাঁড়িয়ে বাল্‌তির তোলা পানিতেই পা ধুয়ে নেয় জয়নদ্দি। বলে, "না মা। কেনোই কি সব বলে' নৌকোটা লিলে। তারিণীর সঙ্গে মুই জুটিচি তাই শালার রাগ। মাওলায় হেরে গ্যাচে আবার তার সাথে।"

"দেখিস্ বাবা, খুব সেম্‌লে, তরবদি লোক ভাল লয়—ভারি খাণ্ডাৎ!"

ঘরে ঢুকে আলোটায় একটু জোর দিয়ে বলে জয়নদ্দি, "হাঁ তুই লে তো বাবু—সব করবে।"

শাকিনার দিকে তাকায়। মুখের আদলটা বড় সুন্দর লাগে ওর। মাথাতে চুলও বিস্তর। সিন্ধুর চেয়ে অনেক ভাল দেখতে ছিল এক সময়। কি দুর্দান্ত যৌবন ছিল শকিনার। দুজনে দুজনার মধ্যে পাগল হয়ে ছিল। সে দিনগুলো কোথায় গেল! তবু কেমন যেন মায়া লাগে ওকে দেখলে। বাচ্ছাটা হবার পর থেকে শরীরটার সে আঁটসাঁট ভাব আর নেই ওর। ছেলেটা হতে গত বছরের আগের বছর মাঘ মাসে 'ঘাতের' মেলা থেকে আট আনা দিয়ে জয়নদ্দি এক রকমের জামা কিনে এনে দিয়েছিল—বাবুদের মেয়েরা তা বেলাউজের ভেতরে পরে—পাৎলা জামা ফুঁড়ে দেখা যায়! দেখে শকিনা বলেছিল, "কি উ?"

জয়নদ্দি বলেছিল, " 'টাইট্‌ বেরেস্‌' !"

কি কাজে লাগে তা শুনে শকিনা রাগে লজ্জায় মুখ বেঁকিয়ে দিয়েছিল ঘরের এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে। কিন্তু জয়নদ্দির আগ্রহেই যেন, দুজনে মিলে সেইটার ব্যবহার কেমন করে' করতে হয় তা পরীক্ষা করতে ঘণ্টা দুই কাটিয়ে দিয়েছিল। নিরাশ হয়েছিল শেষে। তারপর শকিনা বলেছিল, "সেই মংলা আচারিয়ার বৌ পেঁন্দে গো—একদিন দেখে আসবো!···কিন্তন···না না ছি!

মা দেখলে কি ভাববে! আর উ-সব হলো আল্লার হাত—ধরে' বেঁধে কি রাখা যায়? য্যাখন য্যামন, ত্যাখন ত্যামন। বুড়ী বেলায় ছুঁড়ি সাজলে যেন এক সঙ্ দ্যাখায়! দেখলে ঘেন্না করে।"

জয়নদ্দি বলেছিল, "ধের শালী! সাজলে তবে মেয়েদের ভাল দ্যাখায়। মদ্দমানুষদের মন বুঝিস্নি তোরা! তুই বুঝিন্ বুড়ী হইচিস্ এখনো?"

শকিনা হেসেছিল শুধু তার গলা জড়িয়ে ধরে' বুকে মুখ লুকিয়ে। বড় আদর ভালবাসে মেয়েটা! আগে যখন নতুন বৌ ছিল রোজ কত সুন্দর করে' মাথা আঁচড়াতো, কাচা কর্সা রঙিন ডুরে শাড়ী পরতো, কপালে দিত রাঙা টিপ, পান খেয়ে পাকা তেলাকুচোর মতো রাঙা করতো দুটো ঠোঁট, মেহেদি পাতার রঙিন করে রাঙাতো হাত পায়ের তলা। তখন কানে ছিল সোনার পারসি মাকড়ি দুটো আর নাকে ছিল অপেল। রূপোর বিছে হার ছিল গলায়, কোমরে ছিল রূপোর গোট্ আর দুটি বাহুমূলে ছিল রূপোর তাবিজ। হাতভরা কাঁচের চুড়ি ঝুন্ ঝুন্ করতো একটু নাড়া চাড়া দিলেই। দুঃখ আর কাল সব খেয়ে ফেললে!

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফ্যালে জয়নদ্দি।

ছেলেটার দিকে তাকায়। গায়ে মাথায় হাত বুলোয়। আঁচল দিয়ে শকিনার মুখের ঘামটা মুছে দেয়। ভীষণ ঘামে ও, বিছানা ভিজে যায়। শকিনা যেন আঁৎকে জেগে ওঠে, "কে!"

"মুইরে—মুই।"

"তুমি!—জালে যাওনি?"

"না।"

"কেন?"

"তোর জন্তে মন কেমন করে'।" খুঁত খুঁতিয়ে ছেলেমানুষির সুরে বলে জয়নদ্দি।

"ওরে আমার পাগলা রে!" এক হেঁচ্কা টানে শকিনা তার স্বামীকে টেনে নেয় বুকের কাছে। ক্ষেপা পাগলের মতো অস্থির করে' তোলে। ফুঁ দিয়ে আলোটা নিভিয়ে দেয় জয়নদ্দি। বলে, "মা জেগে, রাত অনেক হলো—ঘুমো!"

বিরক্ত হয় শকিনা। ছেলেকে নাড়া দিয়ে তুলে দেয়। কেঁদে ওঠে সে—

ছেলেটাকে বুকের মধ্যে টেনে নেয় শকিনা। দুধ টানতে থাকে সে চুক্ চুক শব্দে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে আবার শান্ত হয়ে যায় তার মন। দুটো চারটে কথা শুধোয় জালে না-যাওয়ার কারণ সম্বন্ধে। অল্প ভাঙা-ভাঙা দুটো একটা কথার উত্তর দেয় জয়নদ্দি। ঘুম জড়িয়ে এসেছে তার চোখে। বুঝতে পেরে শকিনা আর কিছু বলে না। শুধু স্বামীর পিঠে গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে আস্তে আস্তে। আর নিজেও ঘুমিয়ে পড়ে এক সময়।

॥ ৫ ॥

ছ'টার স্টিমার ধরবে বলে' হরেনের ভায়রা-ভাই হাঁকাহাঁকি করে' তাকে তুলে দিয়ে চলে যেতেই. সার্টখানা গায়ে গলিয়ে নিয়ে হরেন এসে দ্যাখে জয়নদ্দি তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

বলে সে, "এতো দেরী করিস্ তুই ?— !"

যাবার সময় মায়ের পায়ে সালাম করে জয়নদ্দি। হরেনও তার চাচীকে সালাম করতে লজ্জা পায় না।

বুড়ী গদগদ হয়ে দোওয়া করে, "তোদের ফতে হোক্ বাবা! বাঘ মেরে ঘরে ফের।"

শকিনার মুখের দিকে তাকাতে হাসলে সে। সে হাসি বড় মধুর। বুকে বল্ এনে দেয়। ছেলের মাথায় একটা চুমো খেয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসে জয়নদ্দি। হরেনকে সঙ্গে নিয়ে ওঠে এসে তারিণীদের পাকা বাড়ীর সদোর বৈঠকখানায়।

"কিগো, জয়নদ্দি মিঞা যে—কি খবর ?" তারিণীর বড় ছেলে বি-এ পাশ রতন তোয়ালে গায়ে ফেলে মুখের মধ্যে ব্রাস্ ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে ঘুরে বেড়াচ্ছিল বাড়ীর সদোরে।

জয়নদ্দি বল্‌লে, "এই যে বাবা, সোনা-মানিক, কেমন আছ? তোমার বাবা ঠাকুর মশাইয়ের কাছে একবার 'আস্‌লাম'।" শুদ্ধ বংলা বল্‌তে চেষ্টা

করে জয়নদ্দি। রতন হাসে। বলে, "বসো। ওরে কেলো—বাবাকে ডেকে দে তো—লোক এসেছে।" হেঁকে একটা ছোঁড়াকে বলে' দেয় রতন।

তারিণীর বড় মেয়েটা উঁকি মেরে দেখে যায় একবার। তারিণী আসে। পাৎলা ছিপ ছিপে লোক। রংটা ফর্সার দিকেই। বয়স পঞ্চাশের কম হবে না। একটু হেসে বলে, "জয়নদ্দি! সালাম দাদা সালাম। বলো কি খবর।" বস্লো তারিণী ওদের সামনে বাইরের রকটার ওপরে।

জয়নদ্দি বলে, "খবর আর কি—মোর ওপরে রেগে গ্যাচে তরবদি—নৌকো কেড়ে নিয়েচে!'

"কেন?"

"তোমার সাথে জুটিচি বলে'।"

ট্যারচা চোখে তাকিয়ে হাসে তারিণী।

জয়নদ্দি সার্টের পকেট থেকে রুমালে বাঁধা নোটের গোছাটা বার করে' তারিণীর পায়ের কাছে রাখে। বলে, "লও দাদা, নৌকো দও।"

তারিণী টাকাগুলো তুলে নিয়ে বলে, "কত দিলি?"

"আপনি গুণে ত্থাখোনা এগ্যে!"

হাসে তারিণী। গোণা শেষ হলে বলে, "একশো? আরো গোটা পঁচিশ দাও।"

"আর পারবোনি দাদা! ঐ তাই অনেক কষ্টে তবে যোগাড় করিচি। তা ই-সালের তিনটে মাস তো কেটেই গ্যাচে দাদা!"

"রতন"—ছেলেকে ডাক দেয় তারিণী—"শোন এখানে।"

রতন এলে বলে, "একটা রসিদ লিখে দে বাবা জয়নদ্দিকে। চোদ্দ শো দশ নম্বরের নৌকোটা এক শো টাকায় জমা নিচ্চে জয়নদ্দি এই সালের জন্যে।"

বাড়ীর ভেতরে চলে যায় রতন। তারিণীর মেয়েটা দু'জনকে দু'খোরা জলখাবার দিয়ে যায়।

তারিণী বলে, "খেয়ে নাও। তা কথা কি জানিস্ জয়নদ্দি,—দু'কাপ চাও দিয়ে যাস্ মা।—হাঁ, কি বল্‌ছিলুম, এক শো টাকায় তোমাকে বলেই দিলুম, দেড় শো টাকাই হলো রেট্। শোন্"—কানে কানে বলে তারিণী, "তোকে আমি দাঁড় করিয়ে দোব—ঢেলা দিয়ে ঢেলা ভাংবো—দেখি শালার কত্তো

ভেজ—তুই শুধু শক্ত থাকিস্”—তারপর সাধারণস্বরে কথা বলে মুখটা সরিয়ে নিয়ে, “আর মানুষ হবার চেষ্টা কর—সৎ হ—নাহলে বড় হতে পারবিনি আর খাটুতে হবে—কুড়েমি করলে বল্‌বে নে। জানিস্ তো, একদিন আমি পরের নৌকোয় দাঁড় বাইতুম। খুদ-চচ্চড়ি খেয়ে দিন কেটেচে!”

অবাক হয়ে তারিণীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে জয়নদ্দি খেতে খেতে। নিজের জীবনের দুঃখের কাহিনী বলে যায় তারিণী। চা দিয়ে যায় তার মেয়েটা ওদের। বলে, “মা আমার বড্ড লক্ষ্মী! ম্যাট্রিক পাশ করলে ই-বছরে! শালা, আর কি চাই! একটা ছেলে তাকে বি-এ পাশ কইরিচি আর একটা মেয়ে, তাকেও ম্যাট্রিক পাশ করাসু! জেলের ঘরে এবেরে ওদের দু'জনের বিয়ে দিতে পারলে হয়!”

হেসে হেসে মাথা নাড়ে জয়নদ্দি।

বলে, “যা বলেচ তারিণী-দা, অতো লেখাপড়া মোদের জেলেদের ঘরে কেন, শালা ই-গেরাম অঞ্চলে বাঙণ কায়স্তর ঘরেই-বা ক'টা আছে? মুই আল্লার রহমতে ভগমানের দোয়ায় পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারি যেতি তাহালে মোর ছেলেটাকেও মুই পড়াবো—য্যাৎ ধুর শালা লেখাপড়া আছে!—ঐ রকম—রতন বাবাজীর পানা!”

খুশী হয়ে হে হে করে' হাসে তারিণী। বলে, “হাঁ হাঁ, মনে আশা বাঁধ্। হাঁ রে, তোর বৌটা বেশ ভাল লোক তো? নাহলে কিন্তুন সংসার গুছোনো ভারি মুস্কিল!”

লজ্জা পেয়ে ঘাড় চুল্‌কোয় জয়নদ্দি; বলে, “তা দাদা, সে হলো তোমার গে-যাও, মানে কথা, হে হে···আমার চেইতেও ভাল লোক! পাপপুণ্যির জ্ঞান আছে তার—মোদের তো সে-সবের বালাই নেই!”

তারিণী বলে, “হেঁ হেঁ, সেইটেই তো খারাপ। তাহলেই মরবি। বদ অভ্যেস্ আর নেশাভাংটা ছাড়। মানুষ হয়ে যদি পশুর কাজ করবি তাহলে ভগবানে তোকে পশু করে' দিতেই তো। পারতো—তা নয়—মানুষ—ভাল মানুষ সব্বাই হতে পারে—সে জেলে হোক্ আর মুচি-মেথর ধোপা-নাপ্‌তেই হোক্। ঐ যো ভরবদি—ঐ রকম হবি? মামলা-মোকদ্দমা জাল-জালিয়াতি—পরের কিসে মেরে নোব সেই ধান্ধা—আর মেয়েমানুষ নিয়ে কতো লোকের কতো

সব্বোনাশ করেচে যে"…

"এই নাও, সই করো।" কথার মাঝখানে এসে একখানা লেখা কাগজ বাড়িয়ে দেয় রতন তার বাপের সামনে। তারিণী কাগজ ধরে' মুখটা কেমন এক ধরনের করে' ছেলেকে আদরের সুরেই বলে "কেন, তুই সই দেনা।"

রতন বলে, "ও সবের মধ্যে আমি নেই।"

তারিণী বলে, "তা থাক্‌বি কেন? আমি ম'লে জালনৌকোগুনো করবি কি? বিলিয়ে দিবি?" কলমটা নিয়ে একটা সই মেরে দিয়ে জয়নদ্দিকে বলে, "নে—তোরা আট ন'মাস এখন মনের ফুর্তিতে নৌকো বা' যেয়ে। দেরী করিস্‌নি—অনেকগুলো বছর পরে এই বছরে যা হোক্ দুটো চারটে মাছ পড়ত্তেচে। আর জানিস্, তরবদ্দি কাল আমার সাথে মামলায় হেরে গ্যাচে?"

"শুনিচি।" বলে জয়নদ্দি—"তাই মনমেজাত খারাপ করে' এসে বউকে ধরে' পিঠেচে কাল রেতের বেলা খুব!"

হরেন সঙ্গে আছে বলে' তার বৌকে কাপড় দেওয়ার কথাটা চেপে যায় জয়নদ্দি। তাছাড়া ওসব কথা বলেই বা কি লাভ!

"মেয়েমানুষকে মারা ঐ হলো এক বীরত্বের কাজ। পশু, একদম পশু"!—বলে তারিণী—"তবে হাঁ অন্যায় করলে মাথা গরম না-করে' তার ঠিক মতন বিচার করো।" বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে যায় একটু তার ছেলেমেয়ের দিকে তাকিয়ে। সামনের-পুকুর ঘাটের বাঁধানো সানের ওপরে বসে রতন আর রোহিণী, দুই ভাই-বোনের মধ্যে লেগেছে তর্কযুদ্ধ। রোহিণী বড় বেশী কথা বলে। রতন ওকে বোঝাতে চেষ্টা করে বেশী সময়। ওদের মধ্যে তুমুল তর্ক-ঝগড়া বেধে গেলে মারমুখী হয়ে মেয়ের দিকে তেড়ে আসে তারিণীর স্ত্রী সনকা, "চুকড় আভাগী, বরদাদা গুড়ুজন হয় তাড় সঙ্গে তোকো? গর কড়—কড় বল্‌চি!" সনকা হলো খাঁটি জেলের মেয়ে, চণ্ডালে তার রাগ। গুরুতর অন্যায় করলে স্বামীকে ঝাঁটা হাঁকাতেও সে পিছ্‌পাও নয়! আর তেমনি খাঁটি জেলের ভাষা—'আড়া গড়ু কোড়য়ে খেয়েচে; মানে, রাঙা গরু সরষে খেয়েচে! 'জালে গাব 'খড়ো' হয়েচে, মাছ গা কড়েনে—তারপর 'আন্নাঘড়', 'আত্তিড়', 'অতন', 'অহিনী—'র'-কে 'অ' বা 'ড়' আর 'ড়'-কে 'র'। ওরা ভাইবোনে তাদের জেলেদের—বিশেষ করে' মায়ের ভাষা নিয়ে কত্তো হাসি-ঠাট্টা করে—তারিণী ভাবে, তা

সেদিন অমনি রতনকে গড় করতে বলতে, করলে কি, রতন দিলে পা বাড়িয়ে আর রোহিণী ওর পায়ের ধুলো নিয়ে ওরই মাথায় দিয়ে খিল্ খিল করে' হেসে দিলে দৌড়। সনকা হাস্তে হাস্তে ঝাঁটা নিয়ে ছুটলো তার পিছনে। অনেক ঝুল কাটাকাটি করলে মা-মেয়েতে। শেষে মাকে ঝাঁটা সমেত পাঁঝা করে' সাপ্‌টে ধরে' অতো বড় সোমত্ত জোয়ান মেয়েটা হুল্লোহুল্লি করে' একেবারে নাকাল করে' ছাড়লে! দেখতে দেখতে আনন্দে দু'চোখে যেন জল ভরে এলো তারিণীর। ঐ মেয়েকেই আবার পর করে' দিতে হবে চিরকালের জন্তে।

"তবে আজ এখন আমরা চলি তারিণী-দা।" জয়নদ্দির কথায় অন্তমনস্কতা ভেঙে যায় তারিণীর। বলে সে, "আচ্ছা হরেন তুমিও ওর সঙ্গে কাজকাম করো। মিলেমিশে থাকো ভাই-ভাইয়ের মতন।"

হরেন বাধ্য ছেলেটির মতোই মাথাটা কাৎ করলে। তারপর ওরা চলে এলো গাঁঙধারে। আড়বাঁধির পথ ধরে' চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ দেখলে পুঁটে মাঝির ঘোলের সেই চরটা ভেঙে পড়ে গেছে গঙ্গায়, খেজুর গাছ সমেত—যেখানটাতে মেড়ুয়া সন্নীসীটা রাতদিন বসে থাক্‌তো ধুনি জেলে। বড় একটা ভয়ংকর ফাটল অনেক দূর থেকে কুম্ভকর্ণের মতো গাল মেলেছে হাঁ করে'। এক গ্রাসে আবার একবার নেবে বুঝি বিঘে পঞ্চাশেক জমি।

হরেন বলে, "সাধুর আছ্‌রাটা গেল তা সাধুটাই বা রইল কোথা?"

জয়নদ্দি বলে, "গ্যাচে শালা বোধ হয় চাপা পড়ে! মড়ার 'মাংস' খেতো, মেয়েলোকের মরা লাসের ওপরে বসে হয়তো ধ্যানে মস্‌গুল ছ্যালো আর আল্লার গজব নেমেচে অমনি! ব্যাস, শালা পাতালে চলে গ্যাচে একদম 'সোদা' নেমন্তন্ন খেতে।"

হরেন বলে, "না হে বেই, কেউ কেউ আবার ভালও বল্‌তো। অনেক ক্ষ্যামতা ছ্যালো নাকি! ওর কাছ থিঙে ওষুধ নিয়ে খেলে নাকি"…

কথা আর শেষ করতে দেয় না জয়নদ্দি, বলে, "বাঁঝা মেয়ের ছেলে হতো—তা তুই লিলিনি কেন? 'বেন'কে খাওয়ালে ছেলের বাপ হতে পাত্তিস্।"

লজ্জা পায় হরেন। বলে, "উ-মাগীর ছেলে হবেনে।"

"কেন?"

"সম্‌সারে যার মন বসেনে্ তার কি ছেলেপুলে হয়? অনেক [illegible] থাকলে

তবে ছেলে-পুলে হয়।”

হেসে ওঠে জয়নদ্দি। বলে, “তাহালে কানাইয়ের অনেক পুণ্যি আছে বল্?”

হরেন বলে, “খোশ্ শালা! দরকার নেই বাবা, কান মলা খাই!”

উড়ে পাশিওয়ালাটা ডাকে “ও দাদারা, এসো না, দু’গেলাস খেয়ে গলা ভিজিয়ে যাও না, ভাল মাল আছে।”

জয়নদ্দি হাত নাড়ে না বলে’। তারিণীর কথাগুলো ধূপের ধোঁয়ার মতো সুমধুর গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করে’ যায় যেন কতক্ষণ। কি থেকে কি হয়েছে লোকটা!…

ইলিশ মারির চরের ঘাটে এসে দাঁড়ায় দু’জনে।

নদীতে এখন ভাঁটার টান। কুল্ কুল্ করে’ বয়ে চলেছে দক্ষিণে। মাছ কারো বেচা হয়ে গেছে, হয়নি-বা কারো তখনো। কানাইয়ের নৌকোটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে পদী। তার সঙ্গে কথা বলছে নানান্ অঙ্গ-ভঙ্গি করে’। ভুলে আর কেলোকে নিয়েছে কানাই নৌকোর কাজে।

জয়নদ্দিকে দেখে কাছে আসে পদী। বলে, “মাঝি তুমি আজ নৌকোয় আসোনি?”

জয়নদ্দি বলে, “কপালের ফের!…দও টাকা দওদ্দিনি।”

পদী দু’হাত তুলে মাথার ওপরে চুলের রাশিটাকে সাম্‌টে চুড়ো করে’ বাঁধতে বাঁধতে ট্যের্‌চা চোখে তাকিয়ে ঠমক্ মেরে বলে, “ট্যাকার জন্যে ঘুম হয়েচে ‘আত্তিরে’?”

“বেশী ক্যাচ্ ক্যাচ্ করিস্‌নি এখন—মন-মেজাত ভাল নেই—দে টাকা দে।”

পদী আর কিছু না-বলে বারোটা টাকা দেয় জয়নদ্দির হাতে নাইকোঁচড়ের খুঁট্ খুলে।

জয়নদ্দি বলে, “আর ডেড্ টাকা?”

“আর হবেনে পোড়ারমুখো মিন্‌ষে—ভাগোদ্দিনি।”

বিরক্ত চোখে ওর দিকে একবার তাকায় জয়নদ্দি। দিনের আলোয় পদীকে যেন মড়া থেকো জ্যান্ত একটা পেত্নীর মতো মনে হয় তার। টাকা ক’টা পকেটে পুরে বলে, “ক’টা মাছ পেয়েচে কানাই?”

পদী বলে, “সবভক্কা! তিনটে মোটে! শুশুক পড়ে জাল ছিঁড়ে একাকার

করেচে নাকি।”

“তিনটে!” আশ্চর্য হয় জয়নদ্দি। মিথ্যে কথা বলেছে নিশ্চয়ই কানাই। মাছ লুকিয়ে রেখেছে হয়তো। ওর স্বভাব তো আর জানতে বাকি নেই তার। কি হিসেব ধরাবে গিয়ে তরবদিকে আজ? বলবে, কাল জয়নদ্দি পেলে পঁয়তাল্লিশটা আর তুই আজ তিনটে? —জালও ছিঁড়েছে, দেবে হয়তো ঘাড়ধাক্কা!···

অন্য নৌকোর মাঝিরা শুধোয় জয়নদ্দিকে, ব্যাপার কি—ঝগড়া মারামারি হয়েছে নাকি—তবে নৌকোয় আসে না কেন? জয়নদ্দি হাসে। যে যেমন লোক তাকে তেমনি উত্তর দেয়। কানাইয়ের সঙ্গে কথা বল্‌তে তার ঘেন্না করে। নতুন মাঝি হওয়ার অহংকারে ফিরেও তাকায় না কানাই তার দিকে। জয়নদ্দি ভাবে, বয়েই গেল। হরেনকে নিয়ে চলে আসে সে বাড়ীর দিকে। বনঝামার ডাল ভেঙে নেয় গোটা কতক গাঁংধার থেকে। পাতা থেঁতো করে' খাওয়াতে বলবে ছেলেটাকে। পেটে বোধ হয় ক্রিমি হয়েছে তার। গোঁ গোঁ করে' গোঁয়ায়—পেট কামড়ায় বলে'। দাঁত কিড়মিড় করে। তাছাড়া মাঝে-মাঝে ছেলেদের তেতো খাওয়ানো ভাল। ঐ যে কানাইয়ের ছেলেমেয়েগুলো—কি বিচ্ছিরি পেট ড্যাব্‌রা হাড়গিলের মতো সব দেখতে। ওঃ! ছেলেবেলায় কি তেতোই না খাইয়েছে জয়নদ্দিকে তার মা!

পথের ধারের পান-দোকানটা থেকে এক পয়সানে দুটো সিগারেট কেনে জয়নদ্দি! হরেনকে একটা দিয়ে বোলেন থেকে নিজেরটা ধরিয়ে নিয়ে সোঁ-সোঁ করে' বার আষ্টেক টেনে হু হু করে' ধোঁয়া ছেড়ে বলে, “বাবুরা খায়, ঘাস লাগে শালা!”

হরেন বলে, “বাইরে হাওয়াতে বেশ ‘গোন্দ’ নাগে—খেতে কই সে-রকম নাগে?”

অবশেষে ওরা পৌঁছোয় এসে তরবদির বাড়ীর সামনে। হাতে তখনো ওদের সিগারেটের ছোট্ট টুক্‌রোটা অবশিষ্ট। দেখে কেউ কেউ হাসে। চোখ ঠারে। মাঝিদের কাছ থেকে মাছের টাকার হিসেব নিতে নিতে একবার ক্রূর চোখে তাকায় তরবদি।

টাকা ক'টা ফেলে দেয় জয়নদ্দি তার সামনে।

তরবদি বলে, "একশো বারো হলো তাহালে। ত্থাখ্‌রে তোরা ত্থাখ্‌—মাছ ধরা কাকে বলে—এই হলো জয়নদ্দির হিসেব! তোদের মতন দশ টাকা বিশ টাকা?"

মুখ গম্ভীর করে' অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে জয়নদ্দি। অতো আর আমড়া-গাছিতে ভুল্‌বে না সে।

হিসেব করতে করতে বলে তরবদি, "তারপর, কি খবর গো 'হরেন মিঞা'? হাঁ, আমার সত্তুর টাকা আর তোদের বিয়াল্লিশ—তাহালে ভাগে চোদ্দ টাকা—কানাইয়ের দু'বখরা এখন মোর কাছে থাক্—সে এলে দোবো।"

জয়নদ্দি বলে, "খাতাটা দেখতে বলো দোকানের। আমার আর হরেনের।"

জয়নদ্দির মুখের দিকে একবার তাকায় তরবদি। তারপর দোকানের কর্মচারীকে হেঁকে খাতাটা দেখতে বলে' দেয়। দোকানে চলে আসে জয়নদ্দি আর হরেন।

খাতা ত্থাখে দোকানীটা। জয়নদ্দি বলে, "ভাল করে' দেখো দাদা, ভুল হয়নে যেন। কিয়ামতের দিনে হিসেব দিতে হবে।"

লোকটা হাসে। বলে, "তোমাদের সাথে বেইমানী করে' আমার কি লাভ হবে দাদা? এই যো, তোমার হলো সাত টাকা দশ আনা আর হরেনের কুড়ি টাকা চোদ্দ পয়সা।"

হরেন বলে, "কুড়ি টাকা! কক্ষনো নয়। হতেই পারেনে। বড্ড জোর চোদ্দ টাকা।"

লোকটা বলে, "ত্থাখো, ই-সব হলো লেখা-পত্তর—খাতায় যা আছে তাই—বাড়বে কি করে'? আমি কি ইচ্ছা মতন দু'চার টাকা করে' বাড়িয়ে দিই? তোমার বউ য্যাখন ত্যাখন মাল নিয়ে যায়। তাকে ডেকে আনো—তাহালে হিসেব হোক্ পই পই করে'?"

গোলমাল শুনে দোকানে আসে তরবদি। বলে, "কি হয়েচে?"

"ঐ যো, হরেনের কথা শোনো! কুড়ি টাকা চোদ্দ পয়সা হয়েচে—বলে হতেই পারেনে। বড্ড জোর চোদ্দ টাকা! মোরা তাহালে ছ'টাকা বাড়িয়িচি?"

খট্ করে' পায়ের জুতো খোলো তরবদি। তেড়ে আসে হাঁক্‌রে, "হঁ। র‍্যা

ঐ শালা, আমরা চোর ? খাবার বেলা খাবি আর দেবার বেলা হলেই আমরা চুরি করি ? ডাক্ তোর মাগকে, ডেকে আন্। ফ্যাল্ শালা, টাকা ফ্যাল্।"

হরেন বন্য হিংস্র পশুর মতো শুধু তাকিয়ে থাকে নীরবে। তারপর দৃঢ়-স্বরে বলে, "না, অতো টাকা হয়নে ?"

"হয়নে শালা কুত্তার বাচ্চা কুত্তা !"...হরেনের পিঠের ওপরে জুতো মারতে গেলে কট্ করে' এবার তরবদ্দির হাতটা চেপে ধরে জয়নদ্দি। হুংকার ছেড়ে বলে, "খবরদার মারবেনে ওকে ! দিচ্চি আমি টাকা !" জুতোটা হাত থেকে পড়ে যায় তরবদ্দির। হাত ছেড়ে দেয় জয়নদ্দি। ভেবেছিল দেবে সে একটা মোচড় মেরে পাক্ দিয়ে। কিন্তু অবাক্ হয়ে গেছে তরবদ্দি। তারপর সে ভালই জানে যে জয়নদ্দির গায়ে যা ক্ষমতা আছে তাতে সহজেই তাকে তুলে আছাড় মারতে পারে। দু'পা পেছিয়ে যেয়ে মুখ ভেংচে টেনে টেনে বলে, "ওঃ ! তুমি টাকা দেবে !"

জয়নদ্দি কর্কশ স্বরে বলে, "হঁা দেবে ! এই ল্যও কুড়ি টাকা চোদ্দ পয়সা। আর ফ্যালো তুমি আমার টাকা ! নিকালো এক্ষুনি। কুড়িটা টাকার জন্যে তুমি একজন লোকের পিঠে জুতো মারতে যাও, এমন ভদ্দরলোক !"

রাগে গায়ের পেশীগুলো তরঙ্গভঙ্গে যেন ফুলতে থাকে জয়নদ্দির। তরবদ্দি বেগতিক দেখে সরে যায় তক্তাপোষের ওপারে।

বলে, "কতো তুই পাবি, দোকানে দেনা নেই তোর ?"

"আছে ! ন'শো পঞ্চাশ টাকা ! লেবে ?"

দোকানের কর্মচারীটা বলে ভয়ে ভয়ে, "পাঁচ টাকা দশ আনা !"

জলে ওঠে জয়নদ্দি। বাজার-করতে-আসা অন্য লোকগুলোকে উদ্দেশ করে বলে, "শুনলে তোমরা—শুনলে ? এই একটু অগ্গেরে বললে কতো ?"

হাসমত মোল্লা বলে, "সাত টাকা দশ আনা।"

"তাহালে ?" শুধোয় জয়নদ্দি—"হিসেবটা ত্যাখো তোমরা। তাহালে গরীব লোকের ঘাড় মোচড়াবার কারখানা লয় এটা ?"

দোকানের কর্মচারীটার ওপরে পড়ে এবার তরবদ্দি, "হাঁ র‍্যা শালার বেটা শালা, হিসেব ঠিক রাখতে পারিস্নি ?" পটাস্ করে' গালে চড় মারে তার একটা।

চেঁচিয়ে ওঠে সে তখন, "তুমিই তো শিখিয়ে দিয়েচ! হরেনের হয়েচে পনেরো টাকা দু'পয়সা—লিখতে বললে"...

ঘাড়ধাক্কা মারে তাকে তরবদি। বলে, "চোপ শালা—বেরো এখেন থেকে"—

বাধা দিয়ে জয়নদ্দি বলে, "থাক্ চাচা, এ্যাদ্দিন ধরে' উ-তোমার অনেক উব্‌কার করেচে, এখন হঠাক্ করে' মোর ভয়ে যেতি এট্টু বে-ফাঁস করেই ফ্যালে তো এমন আর কি হয়েচে! উ-সে মোদের মতন গরীব লোকের টাকা তোমার পকোটে কতো যায়, জানে সবাই, মানী লোক তুমি, তাই শরমে কয়নে! হে:—! ক'টা টাকার জন্যে খেদ করে' আর কি করবো—চলে আয় হরেন।"

হরেনের হাত ধরে' টেনে নিয়ে হন্‌হন্ করে' চলে আসে জয়নদ্দি দোকান ছেড়ে। দোকান ভর্তি লোকজন—সবাই চুপ! অপমানের একশেষ হয়ে তরবদি মুখগুঁজে বসেছে গিয়ে তক্তাপোষটার একপাশে। তারপর যখন বলে সে, "মানহানির কেশ করবো, তোমরা সব সাক্ষী"—তখন একে একে সবাই কেটে পড়ে।

প্রাণের আনন্দে জয়নদ্দি হরেনের গলা জড়িয়ে ধরে' চলতে চলতে উল্লাসে পাগল হয়েই যেন গান ধরে:

'পড়লো হাতী কাদায় দাদা
পড়লো হাতী পাঁকে
শ্যাজ দুলিয়ে ঠোকর মারে
ফিঁঙে এসে টাকে!
ফুঁটিয়ে দিয়ে হুল!
যেন কামড়ালো ভীমরুল
আর ঢুক্‌লো দুটো নাকে
পড়লো হাতী পাঁকে॥'...

তরজার পাঁচালী, কবি-গান শুনে অথবা পুঁথি পড়ার অভ্যাসে ছন্দের মাপ বা মিল জানা থাকাতে কেমন করে' যেন মুখেমুখে অমনি গান বাঁধ্‌তে পারে জয়নদ্দি।

ওদের দুজনকে ঐ রকম টল্‌তে টল্‌তে গান গেয়ে গেয়ে মত্ত অবস্থায় আস্‌তে দেখে শকিনা বলে সিদ্ধুকে, "সক্‌সো ছাখ! মদ নাহয় তাড়ি ঢুকিয়ে

আনতেচে দু'জনে।"

সিন্ধু বলে, "না লো না, সে যে অন্য রকম ধারা করে!"

ওরা কাছে এলে বলে শকিনা, "ঐ পুকুর থিঙে ডুবে এসো আগে—তারপর বাকুলে ঢুকবে দু'জনে।"

"কেন?" থমকে দাঁড়ায় জয়নদ্দি।

"বলতিচি যাও, শিবতালার পুকুর থেকে ডুবে এসে তবে আজ বাকুলে সেঁধোবে। নাহালে লতুন জালে হা' দিতে পারবে নে।" বলে' শকিনা দোর আগ্‌লে ধরে।

জয়নদ্দি মনে মনে খুশী হয়েই কৃত্রিম বিরক্ত মেজাজে বলে, "ধ্যেৎ শালা, যেত রাজ্যের মেয়েলিকাণ্ড! চ' হরেন, ডুবে দু'জন আজ 'গঙ্গাস্‌চান' করে' আসি—সব ময়লা ধুয়ে যাক্—লতুন করে' আজ থেকে দিন আরম্ভ করি।"

ওরা স্নান সেরে এলে মানসিকের বাতাসা আর পীরের থানধোয়া খেতে দেয় শকিনা। বাতাসাটা গালে পুরে দেয় জয়নদ্দি বিস্‌মিল্লা বলে'। থানধোয়া নোংরা পানিটা দেখে বলে, "উ কি? উ আমি খাবোনি! শালা, কুকুরে মুতে মুতে বাবা বদরগাজিকে রোজ গোলাপ—পানিতে গোসল করাচ্চে, সেই থানধোয়া আমি খাবো? থুঃ!"

শকিনা কট্‌মট্ করে' চোখ বার করে। বলে, "পচা তাড়ির চেয়ে খারাপ?"

জয়নদ্দির হঠাৎ আর কোনো বোল্ যোগায় না মুখে। হতবুদ্ধি মেরে যায়। একটু পরে বুদ্ধি সংগ্রহ করতে করতে বলে, "তা খারাপ লয়...হাঁ খারাপই তো! আমি তাড়ি আর খাইনি। আর কক্ষনো খাবোনি,—এই তোর মাথায় হাত দিয়ে বলতিচি—আল্লার কিরে! মোর হয়ে তুই বরঞ্চ এট্টু ই-যাত্রাটা খেয়ে লে—সেই একই 'নেকি' হবে।"

"ঢেঁকি হবে!" রুষে উঠে 'থানামৃতের পাত্রটা নিয়ে সরে যায় শকিনা।

"বেশতো, ধান কুটবি।" বলে জয়নদ্দি। কিন্তু হরেনকে নির্বিকারে কদর্য্য পদার্থটা গলাধঃকরণ করতে দেখে মুখ-টুক বিকৃত করে' বলে সে, "কিরে শালা, ঘেন্না লাগেনে? তা লাগ্‌বে কেন? বেনের মনরাখা হচ্চে বুঝিন্?"

সিন্ধু দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে' কুশি লাগানো খেজুর

পাতার চাটাইয়ের কানিটা বুনে যায় এক মনে। নাতিকে কোলে নিয়ে জয়নদ্দির মা গেছে পাড়ায় মানসিকের বাতাসা বিলি করতে।

শকিনা পান দিলে ওরা দুজনে এবার নতুন জালটা পেড়ে নিয়ে বসে। হয়তো সারাদিনের মতো দু'জনের কাজ আছে এখনো।

হঠাৎ চরাৎ করে' গুড়িপানের পিক্ ক্যালে উঠোনের ছাচের ধারে সিন্ধু। বিরক্ত হয় জয়নদ্দি। বলে, "ওই তো লয় বেন, ঐ অব্যেসটি খারাপ!"

শকিনাও অভিযোগের সুরে বলে, "হাঁ লা ঐ—কি করলি উ? হাঁজের পানা চরাৎ করে' বার করে' দিলি?"

হরেন বলে, "দণ্ড না গালে নাথি।"

সিন্ধু বলে, "বাবা বাবা! হন্দম্ ফেল্‌বো—কি করবে? যাবার সময় আমি স্যাতা বুলিয়ে দিয়ে যাবোখনে।"

তারপর জয়নদ্দি আর হরেন তরবদির দোকানের কথা পাড়ে। সোৎসুক্যে শোনে সিন্ধু আর শকিনা। খুব একটা কাণ্ড করে' এসেছে তাহলে জয়নদ্দি? হরেন আর জয়নদ্দি দু'জনেই ঘটনাটার কথা বলতে বলতে হাসিতে ফেটে পড়ে। কাজ করতে করতে ওরা গল্প করে। সিন্ধুর চোখে এক অনবদ্য হাসি নেচে ওঠে; তার স্বামীর-পিঠে-পড়া-জুতোটা বাঁচিয়ে দিয়েছে তাহলে জয়নদ্দি?

শকিনা উঠে গিয়ে মাচা থেকে জ্বালানি-কাঠ পেড়ে এনে চুলো ধরায়। ক'দিন থেকে পেড়ে-রাখা গাবগুলো থেঁতো করে' ফুটিয়ে নিয়ে ঢেলে দেবে গাম্‌লায়। তাতে জাল ভিজিয়ে রেখে কষ্ ধরিয়ে নিতে হবে। গাব ফোটানো হয়ে গেলে রান্না চড়াবে।

ছেলে কোলে নিয়ে বাড়ীতে ঢোকে জয়নদ্দির মা। এসেই বলে, "কে এখেনে এতো পানের 'পিচ্' ফেললি লা! হারামজাদী এই বৌয়ের কাজ!" সিন্ধুকে নির্দেশ করে' বলতে সলজ্জ হাসে একটু সে। তারপর তাকায়, জয়নদ্দি আর হরেনের দিকে। উঠে পড়ে লোটায় পানি ঢেলে ঢেলে পা দিয়ে পিকগুলো মাটির মধ্যে মিলিয়ে দেয়। তারপর বলে, "এই নাকমলা কানমলা খাচ্চি আর পান খাবোনি আমি।"

জয়নদ্দির মা বলে, "খাবিনি কেন, খেতে তো কেউ মানা করেনে, 'পিচ্'টা শুধু উঠে যেয়ে ফেল্‌বি এট্টু! না, যেখেনে খাবি সেখেনে হাগ্‌বি! আর মোর

চড়া শুণ্ডি জানিস্ যেতি তো অত্তো করে' খাস্ কেন ?"

জয়নদ্দির ছেলেটাকে নামিয়ে দিতে টলে' টলে' হাঁটুতে হাঁটুতে যায় সে তার মায়ের কাছে। একটু আদর করে' নিয়ে তাকে দুধ দেয় শকিনা।

হঠাৎ সদোরের দিকে চোখ পড়তে গ্যাখে, পুবপাড়ার নূরউদ্দীনের বৌ বুকের কাছে একটা পায়ে-দড়ি-বাঁধা লাল মুরগি ধরে' নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আড়ঘোমটা দিয়ে। তাকে দেখেই শকিনা চেঁচিয়ে ওঠে, "না বুন্ না, রোজ রোজ মুরগি লিয়ে এসে অতো 'ই' করায় নে! আমার মোরগ খারাপ হয়ে যাবে! মানসিকের মোরগ।"

সিন্ধু লজ্জায় মুখ আড়াল করে। বৌটারও মুখ গ্যাখা যায় না।

জয়নদ্দি বলে, "থোর শালী! চুপ কর।"

জয়নদ্দির মা বেরিয়ে যায় খিড়কির দিকে।

বৌটা সেই তালে টুপ্ করে' ছেড়ে দেয় তার মুরগিটা। শকিনার বিরাট বড় মোরগটা তীরবেগে ছুটে গিয়ে ধরে তাকে।...

সকলের চোখের সামনেই কাজ হাসিল হয়ে যায় বৌটির।

শকিনা গজগজ করে, "পাড়ার যেত মুরগির বাচ্চা করাবার জন্মে আমি যেন মোরগ পেলে রেখিচি!"

জয়নদ্দি সিন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলে, "ফি লে না, দু'পয়সা করে' ফি!"

"দূর হ,—পোড়ারমুখো মিন্‌ষে!" উঠে পালায় সিন্ধু ওদের কাছ থেকে।

বৌটা লজ্জার মাথা খেয়ে দাঁতে ঘোমটা কামড়ে ঝট্ করে' তার মুরগিটা ধরে' নিয়ে সরে' পড়ে।

মোরগটা চীৎকার ছাড়ে বারকতক জোরে জোরে।

"দূর হ, হারামি!" বলে তাকে ঝাঁটা ছুঁড়ে মারে শকিনা

জয়নদ্দি কি যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার মা এসে পড়ে' বলে, "এই লে, তোদের কিসের টাকা-পয়সা—দিলে তরবদি। বাতাসা কিনি করে' আসতে ছেনু, মোকে দেখে ডেকে বললে, 'ও জয়নদ্দির মা, এই টাকা ক'টা লিয়ে যাও তো—হরেন আর জয়নদ্দি পাবে!'—আর দেখি সেখেনে, কেনোটা ঘাড় গুঁজে বসে আছে বোধ হয় দুয়েক ঘা চড়চাপড় দিয়েচে—বলতেচে, 'কাল পড়ে একশো বারো টাকার মাছ আর আজ পড়ে মোটে সাড়ে ছ'টাকার

মাছ’ ? আমি আর দাঁড়ানুনি—চলে এনু।”

জয়নদ্দি আনন্দে মশগুল্ হয়ে মাথা চালে কতক্ষণ। তারপর বলে, “ফাঁদে পড়েচে ঘুঘু! আর দেখলি হরেন, মাথার ঘাম পায়ে ফ্যালা খাটুনীর দাম আল্লা কেমন করে’ বাঁচায়। ঠিক হিসেব করে’ দিয়েচে টাকাগুনো।”

শকিনা ফোঁস্ করে’ উঠে বলে, “ওঃ! ঠিক দিয়েচে বলে!”

সিন্ধু আবার ফোড়ন ছাড়ে আড়চোখে তাকিয়ে, “ছেরকালই তো ঠিক দিতো!”

জয়নদ্দি সিন্ধুর দিকে তাকিয়ে নিয়ে হরেনকে বলে, “টাকা ক’টা তুই ধার নে এখন—তরবদ্দি যেমন রঙচঙে শাড়ী-বেলাউজ কিনে এনে দিয়ে ছ্যালো—সেই রকম কিনে এনে দে বেনকে! বেচারীর মনে বড্ড সখ!”

খোঁচা খেয়ে সিন্ধু মাথা নামায়। শকিনা কঠিন চোখে তাকিয়ে তিরস্কার করে স্বামীকে। জয়নদ্দি অপ্রস্তুত হয় যেন। তবুও এমন একটা ভঙ্গি প্রকাশ করে চোখমুখের ইংগিতে, যাকে শুধু আত্মসমর্থন ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। শকিনা তা বোঝে বলেই আরো বিরক্ত হয়।

হরেন বলে, “না বেই, সত্যিই ওকে একখানা কাপড় কিনে দিতে হবে। কাপড় ওর ছিঁড়ে গ্যাচে।”

এখান থেকে চলে যাবার জন্যে পা তুলতে যেয়েও আর যাওয়া হয়না সিন্ধুর। বসে পড়ে শকিনার পাশে। ওর সজল চোখ আর গম্ভীর মনোভাব লক্ষ্য করে’ বলে, “দু’ডগ পুঁই শাগ কেটে দিচ্চি নিয়ে যা—রাঁধবিখনে।”

মুহূর্তেই সিন্ধু লোভাতুর হয়ে ওঠে। বলে, “দিবি দিদি, ইলিশ মাছের কাঁটাকুঁটি দিয়ে ‘আঁধ্লে’ বড্ড ভাল নাগে লো! আমার বড্ড পুঁই শাগ খাবার সখ। কটা চারা বসানু সব মরে গেল, মোটে এক ডগ হয়েচে আমাদের।”

শকিনা একটু গলা চড়িয়ে বলে, “মা, কেস্তেটা নিয়ে দু’ডগ পুঁই শাগ কেটে দও তো গা—মোদের রাঁধবার জন্যেও কেটো একটু। আঃ! বাবারে বাবা! ছেলেটা মেরে ফেললে গো—মেরে ফেললে! দুধে এমন কেম্ড়ে দিয়েচে—সর অভাগা—সরে যা”—শকিনা ছেলেটাকে নিজের বুকের ভেতর থেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে বসিয়ে দিয়ে পিঠের ওপরে একটা চড় দিতেই চীৎকার ছেড়ে

কেঁদে ওঠে সে।

খেঁকিয়ে ওঠে জয়নদ্দি, "হারামির ব্যাভার ত্থাখ্ খালি! উঠ্‌বো দেখবি একবার?"

সিন্ধু তুলে নেয় ছেলেটাকে। আদর করে' করে' চুপ করাতে চেষ্টা করে।

জয়নদ্দির মা বলে, "বউটার 'মেজাত' যেন দিন দিন খরিয়ে উঠ্‌তেচে! দুধে একটু কেম্‌ড়ে দিয়েচে বলে' ঐ রকম করে' মারবি ছেলেটাকে? জয়নদ্দি যে বারো বচ্ছর বেলা অব্‌দি দুধ খেয়েচে মোর!"...

গজ্‌গজ্‌ করে শকিনা, "নাঃ! আমাকে লাগেনে! মারবে কি? আমার গতর যে পাষাণ!"

জয়নদ্দির মা মুরগিগুলোকে কুঁড়ো গুলে খাওয়ায়। তারপর কাস্তেটা নিয়ে পুঁই শাক কেটে দেয় রান্না ঘরের চালে মই ঠেকিয়ে উঠে!

শাক নিয়ে চলে যায় সিন্ধু। যাবার সময় ওর পিছন দিকের যৌবনমদন্বিত ভঙ্গির পানে যতক্ষণ ত্থাখা যায় জয়নদ্দি তাকিয়ে থাকে কেমন যেন এক ক্ষুধাতুর চোখে। দোর-গোড়া থেকে ফিরে তাকিয়ে একটু চোরা হাসি হেসে খোঁপার বাহার দেখিয়ে হেলে দুলে চলে যায় সিন্ধু।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফ্যালে জয়নদ্দি। মনে পড়ে তার কাল রাতের কথা। সিন্ধু কেমন যেন এলোমেলো হয়ে পড়েছিল ঘুমোবার ভান করে'। কাদা পায়েই ওদের ঘরের ভেতরে উঠে গিয়ে বসেছিল সে। জেগেছিল, চোখে চোখ পড়তে ধরাও পড়লো কিন্তু তবুও পান দিলে না! কতো ছলই না জানে মেয়েটা! তার দিকে যে ওর মনের টান আছে,—জয়নদ্দি তা ভালই বোঝে। কিন্তু কোনোদিন সুযোগ গ্রহণ করেনি বন্ধুর বৌ বলে'। করলে কি পারে না? অনায়াসেই—যদি সে...না না...বিবেক কথা বলে জয়নদ্দির, 'ভাল নয় ও-জিনিস—বন্ধুর বৌ—বিশ্বাসঘাতকতা হবে—তাছাড়া...আচ্ছা, হরেনও যদি ঐ রকম করে শকিনার সঙ্গে গোপনে গোপনে? মানুষের মনের খবর কে বল্‌তে পারে? শকিনাকে তাহলে দু'টুক্‌রো করে' ফেল্‌বে। কিন্তু হরেন,—ওর অনেক সহ্য। ভারি অনুগত তার। যে রক্ষক সে-ই ভক্ষক হবে শেষ বেলা? তরবদির মতো? তারিণীর কথাগুলো মনে পড়ে। না না, তা করবে না। যতই ছলাকলা ত্থাখাক্ সিন্ধু। উচিতও নয়। পাপ ছাপা

থাকেনা। হরেন জানতে পারলে বড্ডই আঘাত পাবে প্রাণে। কেননা ও প্রাণ দিয়ে ভালবাসে সিন্ধুকে। ওর অনেক বড় অন্যায়ও তাই ক্ষমা করতে পারে। টাকাপয়সা হলে কি সে তরবদির মতো হবে? না, কক্ষনো না।

তারিণী লোকটা ভাল। অনেক কষ্ট স্বীকার করেছে জীবনে। ছেলে মেয়ে দুটোকে অনেক লেখাপড়া শিখিয়েছে—তাই বলে' বেড়ায় তারিণী—লোকেও তাকে ভাল বলে।'...

জয়নদ্দি নিজের ছেলেটাকে নিয়ে এবার একটু আদর করে। কাতুকুতু দেয়—মাথা ঝাঁকায় তার মুখের সামনে—ভেংচি কাটে—হ্যাঁ করে' জিভ নাড়ে। ছেলেটা খিল্ খিল্ করে' হাসে—গালে হাত পুরে জিভটা ধরতে যায়। তারপর তাকে জয়নদ্দি কাঁধে তুলে নিয়ে বোঁ বোঁ করে' ঘুরিয়ে ছেড়ে দেয় মাটিতে। ছেলেটা টলে' টলে' পড়ে যায়। তার রকম দেখে অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে জয়নদ্দি। শকিনা হাসে গাবের কষে জাল ডোবাতে ডোবাতে। হরেন বাড়ী চলে আসে। বাকি কাজটুকু করবে দু'জনে বিকেলে আবার।

অতি সন্তর্পণে বাড়ীতে ঢোকে হরেন। উঁকিঝুঁকি মারে। ঘরে তালা বন্ধ। ঘাটে গেছে নাকি সিন্ধু? তাহলে! মনের মধ্যে সন্দেহ সাপের মত বেড় পাকায় হরেনের। বনজঙ্গলভরা খিড়কির দিকে যায় সে সেদিনের মতোই! এসে ছাখে তেমনি ঘাটের পানিতে হাত পা ডুবিয়ে বসে আছে সিন্ধু চুপ করে'। হরেন জানে ওর হাত পায়ের তলা জ্বালা করে—তাই। জয়নদ্দি বলে, 'ও একটা অসুখ। মেয়েমানুষদের ঐ রকম হয়। শকিনারও হতো।'... হরেন ওকে চমকে দেবার জন্যে একটু দূর থেকে নিঃশব্দে ছুটে গিয়ে সিন্ধুর মাথার ওপর দিয়ে লাফ মেরে পানিতে পড়েই ডুবে মেরে রইল অনেকখন ধরে'।

"বাবারে!"—বলে ভয়ে আঁৎকে উঠে সিন্ধু ছুটে একেবারে ঘাটের ওপরে এসে দাঁড়ালে। বুঝ্‌লে সে—নিশ্চয়ই হরেন! তাই একটু সরে গিয়ে কলা-বনের আড়ালে লুকিয়ে বসে পড়লো আধভিজে কাপড়েই।

কতক্ষণ আর ডুবে থাকবে হরেন? উঠে পড়লে এক সময় হুস্ করে'।

হাসতে গিয়ে হঠাৎ ভাখে সিন্ধু নেই। পালিয়েছে ভয়ে? উঠে আসে হরেন। চারপাশে তাকায়। হঠাৎ দেখতে পায় সে সিন্ধুকে। ছুটে গিয়ে ধরতে গেলে বাতাস-বিদীর্ণ-করা একটা তীক্ষ্ণ চীৎকার করে' ছুটে গিয়ে সিন্ধু ঝাঁপ দিয়ে পড়ে পুকুরে। অনুসরণ করে তাকে হরেনও। ঝাঁপ দেয় পুকুরে। চারদিকে গাছ-পালা ঘেরা কানায় কানায় পানিভরা কাঠা দশকের মতো পুকুর। একেবারে নীরব—নির্জন।

সিন্ধু এক ডুব মেরে গিয়ে ওঠে পুকুরের একেবারে মাঝখানে। হরেনও ডুব মেরে ছোটে ওর পেছনে। সিন্ধু ওঠে গিয়ে এবার পুবের দিকের কোণে। হরেন ডুবে গিয়ে এবার প্রায় পাকড়াও করে' ফেলেছিল আরকি! হাসছে সিন্ধু হাঁপাতে হাঁপাতে। আর পারে না সে! ধরে' ফ্যালে তাকে হরেন। পাঁজা করে' তুলে ধরে' বলে সে, "এবেরে কার?"

হাসতে হাসতে দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরে সিন্ধু ওর। বলে, "তোমার সঙ্গে পারি! বাব্বা!"···

হরেন ওর যৌবনভরা উদ্দাম বুকখানার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর ওর কাপড়টা ধরে' একটু টান দিতেই সিন্ধু ছট্‌ফট্ করে' আঁচড়ে কামড়ে নিজেকে মুক্ত করে' নিয়েই ডুব দিয়ে পালায় ঘাটের দিকে। হরেনও ছোটে তার পেছনে। নীলচে ফুলভরা ঝোলা করমচা গাছের ডালে ছুটোছুটি করে দুটি বুলবুলি। ধরতে চায় একজন আর একজনকে।

ঘাটের কাঠে এসে বসে পড়ে সিন্ধু। হরেন এসে ওকে কোলে তুলে নিয়ে বসে কাঠের ওপরে। ভিজে কাপড়টা একেবারে সেঁটে ধরেছে সিন্ধুর গায়ে। দেখতে বড় ভাল লাগে হরেনের।

বলে, "কি সোন্দর তোকে দেখতে সিন্ধু!"

"আহা রে! সোন্দর না হাতি!···তবু যেতি না 'কাগে'র মতন কালো হতুন!"

"কালো! তুমি আমার জগতের আলো! কাগ নয়, তুমি আমার কোকিল!"

হরেনের কাঁধের ওপরে মুখ লুকিয়ে অভিমানের সুরে বলে এবার সিন্ধু,

"তবে তুমি কেন আমাকে আর তেমন ভালবাসোনি! কেন তুমি আমাকে মারলে?"

"লক্ষীটি আমার অন্যায় হয়ে গ্যাচে—মাফ্ করো—আর মারবোনি কক্ষনো। য্যাখন যা হয় সব কথা তো খুলে বল্‌তে হয় আমাকে! তোমাকে মারলে আমার কষ্ট হয়নে বুঝিন্?"

স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে' ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে এবার সিন্ধু। মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে নানান্ আদরভরা কথায় তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করে হরেন।

সিন্ধু বলে, "না না আমি মরে যাবো—আমি গলায় দড়ি দোবো—আমার কেন এমন বদনাম হলো!...আমি যেতি খারাপ হয়ে থাকি ভগবান যেন আমার গায়ে কুষ্টব্যাধ দেয়—পচে পচে গলে গলে পড়ে!—আর হাতে কাপড় গুঁজে দিয়ে যেয়ে যে আমাকে বদনামের ভাগী করলে তার কি করলে তোমরা? কেন সে বড়লোক বলে' তার কাছে ঘেঁষতে পারলে নে? এই তোমরা পুরুষ! তোমরা জালে গেলে এবেরে সে যেতি এসে আমাকে লোকজন দিয়ে টেনে বার করে' নিয়ে যায় কি করবে তার? ভয়ে আমার ঘুম হয়নে! আমি কি করে' থাকবো এই একলা ঘরে?" ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে সিন্ধু।

হরেন ভাবে। ভয় পায় ওর কথা শুনে। এ-কথা সেও যে না ভেবেছে তা নয়। তবু ওকে ভরসা দিয়ে বলে, "ভগমান আছে সিন্ধু! সেই আমাদের রক্ষে করবে! আমাদের চেয়ে বড় শাস্তি ভগমান তাদের দেবে। এই তো জয়নদ্দি তাকে কি অপমানটাই না করে' এলো!—জালে গেলে রেতের বেলা না, হয় জয়নদ্দিদের বাড়ী যেয়ে থাক্‌বি।"

"ছাড়ো, জয়নদ্দিও তোমার ভাল লোক! সব্বাইকে চিনি আমি।"

"কেন, কি করেচে সে?"

"না করেনে কিচ্ছু। আর করতেই বা কতখন? যে রকম করে' চায় আমার দিকে!"

হরেন একটা ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে তলিয়ে যেতে থাকে যেন; কিন্তু হঠাৎ কোনো একটা অজানা অবলম্বন ধরে' বলে নিজেকে ভরসা দিয়েই, "না না, সে উ-রকম নয়।"

আর কিছু বলেনা সিন্ধু। চুপ করে' বসে থাকে স্বামীর কোলের মধ্যে—তার দুটি বাহুর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে। আজ তার বড় ভাল লাগে হরেনকে। বলে, "রোজ তুমি রেতের বেলা আমাকে একলা ফেলে রেখে চলে যাও—আমার শুধু মন কেমন করে! আজ তুমি থাকবে বলো?"

ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে হরেন, "থাকবো। জুয়ার তো এবেরে সকালের দিকে সরে যাচ্ছে। আর সন্ধ্যের দিকে হবে। দুপুরে যাবো আর রাত আটটা ন'টাতেই ফিরে আসবো—ফের যাবো ভোর বেলা।"

আবদারের সুরে বলে সিন্ধু, "তুমিও একটা জাল করো, জয়নদ্দির মতন নৌকো জমায় নও!"

"হবে হবে, সব হবে।" আশ্বাস দেয় হরেন।

সিন্ধু ওর মুখটা ধরে' বলে, "আর জানো, আমার খেলেই খালি বমি হচ্চে কেন?"

"কই না তো! কেন?"

"না না, আমার বলতে বড্ড লজ্জা পায়!" হরেনের বুকের মধ্যে মুখ লুকোয় সিন্ধু। আড়ষ্ট স্বরে ভাঙা ভাঙা গলায় বলে, "আমাদের ময়না হবে গো—এই দু'মাস। ঠিক আমি জানতে পাচ্চি!"

"সত্যি! তাহালে খুব মজা হবে!" হরেন আনন্দে চেপে চেপে ধরে তার বুকের মধ্যে সিন্ধুকে।

তারপর এক সময় সিন্ধু বলে, "ছাড়ো, বেলা হচ্চে, চলো, রান্না বসাতে হবে।"

হরেন ওকে ছেড়ে দেয়। সিন্ধু আবার পানিতে নেমে গোটা তিনেক ডুব মেরে নিয়ে সূর্যকে প্রণাম করে' ঘাটে উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের কাপড় খুলে নিংড়ে সেই প্রান্তটা পরে' আবার অন্য প্রান্তটা নিংড়ে নিয়ে গায়ে দেয়। হরেন চুপ করে' বসে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর প্রতিটি মুদ্রা, প্রতি ব্যঞ্জনা, প্রতিটি ভঙ্গি আজ তার অদ্ভুতভাবে ভাল লাগে যেন। সিন্ধু চলে গেলে তবে হরেন ডুব মেরে উঠে ঘরে আসে।

দ্যাখে, সিন্ধু কাপড় ছেড়ে ভাল তোলা-করা তাঁতের লাল রঙা শাড়ী আর নীল রঙের ব্লাউজটা পরেছে। মাথা আঁচড়ে কপালে দিয়েছে রঙের

কৌটা। সরু করে' দিয়েছে সিঁথিতে একটু সিঁদুর।

হরেন বলে, "আহা, মরি মরি! পায়ে মাথা কুটে মরবো নাকি গো আজ!"

মিষ্টি এক ঝলক্ হাসে সিন্ধু। বলে, "ছি, বল্‌তে আছে!" তারপর সে এসে একেবারে উপুড় হয়ে পড়ে গড় করে হরেনকে। হরেন তাকে টেনে তুলে নিয়ে বুকে চেপে, মুখে চুমো খেয়ে বাষ্পাচ্ছন্ন গলায় বলে, "তুমি সুখী হও—সতীলক্ষ্মী হও। মাটির পিদিম হয়ে আমার কুঁড়েঘর আলো করে' থাকো।"

সিন্ধু ওর চোখে চোখ রেখে হাসে। আনন্দের অশ্রু ছল্‌ছল্ করে সে চোখে। ধরা গলায় বলে, "কাপড় ছাড়ো, বিছানা পেতে দিই—শোও এখন। ঘুমোও। সারারাত তো ঘুমোওনি তুমি কাল।"

সরে এসে কাপড় বদ্‌লাতে বদ্‌লাতে বলে হরেন, "কি করে' জান্‌লে?"

"জানি!" দাওয়ায় ঝ্যাৎলাটা পেতে তার ওপরে নতুন-সেলাই-করা ফুল-তোলা একটা কাঁথা বিছিয়ে বালিশ দিয়ে দেয় সিন্ধু।

"মা তুগ্যা!" বলে' সটান্ শুয়ে পড়ে হরেন।

রান্না করতে বসে গিয়ে সিন্ধু।

শুয়ে শুয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে হরেন। কিছুতেই তার চোখে ঘুম আসে না।

মাঝে মাঝে তাকায় আর হাসে সিন্ধু। এক সময় বলে, "রেতের বেলা জাগ্‌তে না পারলে চোখে নঙ্কা ঘষে দোব।"

হরেন লক্ষ্মীছেলের মতো চোখ বুজিয়ে বলে, "না বাবা, সে-শালা বড্ড কষ্টের ব্যাপার!"

সিন্ধু হাসে খিল্ খিল্ করে'।

হরেন বোঝে, সব কিছু ভুলে এবারে সিন্ধু ওর নিজের স্বভাবের মধ্যে ফিরে এসেছে—সেখানে সে প্রাণ-চঞ্চল—হাস্যমুখর—আদিম যৌবন-চেতনার উল্লাসে তরঙ্গসংক্ষুব্ধ।

॥ ৬ ॥

কাশেম আর হরেনের কাঁধে নতুন জাল বইয়ে এনে নৌকোয় তোলে জয়নদ্দি বদরগাজির নাম স্মরণ করে'। পাক্ খেতে খেতে গিরিমাটিঘোলা পানির উদ্দাম তোড় ছুটে চলেছে উত্তরে। জোয়ার উঠছে এবার ফুলে ফুলে। ইলিশ মারির চর থেকে নৌকো ছাড়ে ওরা। কাশেম আর হরেন দাঁড় টেনে আরো একটু দক্ষিণের দিকে উজান বেয়ে যায়। জয়নদ্দি হাল কষে। সারা আকাশে রক্ত উগরে সূর্যটা পাটে বসেছে তখন পশ্চিমের। কালো কালো অসংখ্য নৌকোয় ভরে গেছে গঙ্গার বুক।

জাল নামাতে আরম্ভ করে এবার জয়নদ্দি আল্লার নাম নিয়ে জালে বার কতেক কপাল ঠেকিয়ে। কাশেম ধরে চাকাগুলো। হরেন ছাড়ে একটা একটা করে' চোঙা। অনেক লম্বা করে' বেঁড় দিয়ে দিয়েছে জয়নদ্দি।

হরেন বলে, "বেই, ওই যো কেনোর নৌকো।"

"হুঁ।" বলে শুধু জয়নদ্দি। কচুরীপানার দামগুলো ঘুরে ঘুরে সরে যায় দূরে তার চোখের সামনে থেকে।

কাশেম বিকৃত স্বরে জেলেদের ভাষাকে ব্যঙ্গ করে' কানাইয়ের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলে, "জালে গাব খড়ো হয়েচে ড়ে ড়ামহড়ি, মাছ গা কড়ে নে!"

জয়নদ্দির মন আজ অন্য রকম। একটা শুভকাজে নেমেছে আজ সে। কারো ওপরে ঈর্ষে করতে ভালো লাগে না। বলে, "কেনোকে ঠাট্টা করিস্নি রে তোরা, ওরই 'হেম্মৎ' আছে। অগ্‌গেরে পাড়ায় পাড়ায় খ্যাপ্‌লা ফাঁদি লিয়ে মাছ ধরতো; তারপর চটকলে বদলি কাজে লাগলো; তারপর হলো ফেরি যেছো। ওদের সম্‌সারের আবস্থা দেখে তরবদিকে বলে-কয়ে একজনকে বাদ দিয়ে ওকে জালে লিনু। কপাল ভাল, মাঝি হয়ে গেল। হোক্ না, হলেই তো ভাল।"

কাশেম বলে, "মোর কাছে কাল বলতে ছ্যালো, মেয়ের জন্তে নাকি একটা ভাল বর যোগাড় করেচে—অনেক লেখাপড়া—বাপের তেজারতি খাটে—ধান চাল য্যাতো পক্ষীতে ইঁদুরে খায় তোমার আমার নাকি সম্‌সার চলে যাবে আর তরবদি চাচা তো মাথার ওপরে আছেই।"

জয়নদ্দি মৃদু হেসে বলে, "বেয়েতে ইংরিজি বাজনা হবে বলেনে ?"

হরেন বলে, "ব্যাঙের বাজনা হবে !"

ওরা তিনজনেই হাসে হিঁকিয়ে হিঁকিয়ে। তারপর জয়নদ্দি বলে, "কতো ধানে কতো চাল হয় দু'দিন বাদেই বুঝবে বাছাধন !"

হরেন বলে, "ওর ঐ মেয়েটাকেও দেখিস্ উ-শালা নষ্ট করবে।"

জয়নদ্দি হেসে বলে, "অমন সত্যি কথা বলিস্‌নি বেই, পাপ হবে। চোখ আছে ছাখ কান আছে শোন। কাউকে কুনো কথা বলবার দরকার নেই। শুধু কানাই কেন, মাহাজন বা টাকাওলা উপরিওলার মন রাখবার জন্তে অমন কতো লোকেই লিজের মেয়ে বউকে ভেজিয়ে দেয়। তারা হলো কুকুরের জাত, মান-এজ্জৎ বেচে প্যাটের খিদের জ্বালা মেটায়।"

সারা আকাশে কোথাও এক টুকরো মেঘের চিহ্ন নেই। খাঁ খাঁ করছে যেন চারদিক। বিকালের রোদেও কি তেজ ! তামুক সাজে কাশেম নারকেলের মোচার 'চুমুরি' জ্বালিয়ে আগুন করে'।

জয়নদ্দি বলে, "মহা ভাবনা লাগলো যে রে কাশেম, আগাশ যে 'ডকে' উঠলো এরি মধ্যে ! জমি লিমু, লৌকো লিমু—সব কি ভেস্তে যাবে নাকি !"

"আল্লা জানে দাদা ! সবই তার মর্জি।" বলে কাশেম হুঁকোতে বার কতেক টান দিয়ে নিয়ে।

জয়নদ্দি অন্তমনস্কভাবে বলে, "সব তার মর্জি মতন হলে মোদের কি করে' চলে !"

নলদাঁড়ি থেকে জাল ফেলে গদাখালি, ইলিশ মারির চর পেরিয়ে ওরা সারা জোয়ার পাড়ি দিয়ে পৌঁছোয় বিরলা ফ্যাক্টরীর উত্তরে ম্যাগাজিন লাইনের সামনে। সেখানে জাল তুলতে আরম্ভ করে যখন, তখন বেলা ডুবুডুবু হয়ে আসে। জয়নদ্দির বুক কাঁপতে থাকে আশা-আকাঙ্খায়।

সমস্ত জাল তোলা হলে মন তার ভরে ওঠে হতাশায়। সারা জোয়ার ভর জাল টেনে মাছ পড়েছে মাত্র চারটে। সকলেরই মন খারাপ হয়ে গেছে ওদের। অন্ত মাঝিদের শুধোয় কাশেম কে কতো করে' মাছ পেলে তারা।

সবারই এক দশা। দুটো—একটা—তিনটে! শুধু কানাইয়ের জালে পড়েছে নাকি সাতটা।

জয়নদ্দি বলে, "লে তোরা, দু'জন দুটো লে। মোর দুটো থাক্। ঘরে যাই চ'। ও পয়রদ্দি-ভাই, তোমার লোক থাক্‌বে তো নৌকোয়? মোদের নৌকোর দিকে এট্টু নজর রেখো।"

কাশেম বলে, "সবোর সবোর চলে এসে ভাঁটায় নাহয় একটান দেখবে?"

জয়নদ্দি বলে, "জোয়ার উঠে গেলে তবে তো ভাঁটায় নাববে। তুই যে হতমুখ্যুর পানা কথা বলিস্। ইলিশ জোয়ারেই ছোটে আণ্ডা ছাড়বার জন্তে মাতাল হয়ে। বেশী হলে জাল-গলা মাছ ধরবার জন্তে ভাঁটায় আবার জাল দেয়। খালি খাম্‌খাই"…

পদী এসে বলে, "কই মাছ কই, ও মাঝি?"

জয়নদ্দি বলে, "মাছ গাঁঙে, নেবে যেয়ে আঁচল পেতে ধরে' আন্।"

"দও না, তিন ট্যাকা করে' দোবখন যে-ক'টা হয়।"

"কিরে, দিবি তোরা?"

মুখ চাওয়া-চারি করে ওরা দুজনে প্রথমে। তারপর কাশেম বলে, "ঘরে ভাতের চাল নেই শুধু মাছ লিয়ে যেয়ে কি দিয়ে খাবো? লে পদী—দে টাকা দে।"

হরেনও তার মাছটা দিয়ে দেয়। জয়নদ্দি ভাবে তার মাছ দুটো দেবে কিনা। পয়লা জালের মাছ, না নিয়ে গেলে শকিনাই বা কি বলবে? তাছাড়া গাজি সায়েবের মানসিক শুধ্‌তে হবে। একটা রেখে অন্তটা দিয়ে দেয় পদীকে।

পদী বলে, "মিন্‌ষে বড়টা রেখে ছোটটা দিচ্চে, দও, উ-মাছটা দও। ই-টা সুবোনিকো।"

জয়নদ্দি মুখ ভেংচিয়ে বলে, "এঃ! খেতে দিলে শুতে চায়।"

পাতাল চোখ করে' বলে পদী, "মরণ!"

পদীর কাছ থেকে ওরা টাকা নিয়ে চলে আসে চেঁচামেচি হৈ-হল্লা করতে করতে বাড়ীর দিকে। কাশেম আর হরেন অন্ত পথে চলে গেলে জয়নদ্দি একটু এগিয়ে এসে হঠাৎ ছাখে সিন্ধু গাব বকুল আম আর তেঁতুল

করোমচার ডালে ডালে জড়াজড়ি করা আকাশ ঢাকা নিবিড় জঙ্গলটার ভেতরকার পথ ধরে' আসছে ধীরে ধীরে। হাতে তার লম্ফের আলো। তাদের ফেরার সাড়া পেয়ে আগেই বেরিয়ে পড়েছে। জয়নদ্দি কাছে এসে পড়তেই চমকে ওঠে সিন্ধু, "কে!"

জয়নদ্দি হেসে বলে, "পরদেশী নাগর! ছাখোতো চিনতে পারো কি!"

মুচ্‌কি হেসে সিন্ধু হাতের আলোটা জয়নদ্দির সামনে তুলে ধরে। ছাখে সে একজন অপরূপ জোয়ান পুরুষকে—ঘামে ভিজে যার তামার মতো চক্‌চক্‌ করছে সারাটা গা। মাস্‌লভরা বলিষ্ট চেহারা। ছুটো চোখে জ্বলছে ক্ষুধার আগুন। এক মুহূর্তেই যেন বিহ্বল হয়ে যায় সিন্ধু। কেমন করে' কাঁপতে থাকে যেন তার শরীরটা। অনেক কষ্টেই যেন গলার স্বর ফোটে তার, "বেই তুমি!" কিন্তু তবুও একপাশে পথ করে' নিয়ে চলে যেতে যায় সিন্ধু। বলে, "সরো!"

গলাটা শুকিয়ে যাওয়ার মতো লাগে যেন জয়নদ্দির। বলে, "বকুল গাছটাতে ভূত আছে! একলা যেতে পারবে তো? না, দিয়ে আসবো?"

"দরকার নেই, সরো! মিন্‌ষে যেন এক অবতার! কেউ দেখলে কি বলবে!"

"কি বলবে বলো তো?"

"জানিনি যাও! সরো!"

ফুস্‌ করে' আলোটা নিভিয়ে দেয় হঠাৎ জয়নদ্দি ওর হাতের। আঁৎকে ওঠে সিন্ধু: "এই না, আমি চ্যাঁচাবো!"...

ভয় ছাখায় জয়নদ্দি, "ঐ ভূত রে! ঐ যে পা দোলাচ্ছে! নিলে!"

চারিদিকে স্থূচিভেদ্য জমাট অন্ধকার। দম্‌কা হাওয়ায় আড়মোড়া ভাঙে বাঁশের বনটা। বাদুড়েরা ডানা ছটপট করে' ওঠে গাব গাছের ভূতুড়ে ঝোপের মধ্যে।

"উ মাগো!" বলে' সিন্ধু হঠাৎ জড়িয়ে ধরে জয়নদ্দিকে।

কিন্তু হঠাৎই আবার একটু দূর থেকে হরেনের গানের স্বর ভেসে আসে:

মনের কথা মন জানে ভাই আর জানেনা কেউ
কে জানে তায় কখন লাগে জোয়ার ভাঁটার ঢেউ।...

তাড়াতাড়ি আলোটা জেলে দেয় জয়নদ্দি। চোরা হাসি হাসে সিন্ধু

কেমন জব্দ !…মুখ থেকে শিকারছাড়া দিশেহারা সাপের মতো বোকা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে জয়নদ্দি। সিন্ধু চলে আসে দ্রুত পায়ে।

মোড়টা ঘুরতেই ছাখা হয় হরেনের সঙ্গে। বুকের ভেতরে ধড়াস্ ধড়াস করে সিন্ধুর। যদি চুপচাপ আসতো—আর একটু দেরী হলে, কি হতো !

হরেন বলে, "এতো দেরী হয় এইটুকুন্ আসতে ? কখন জয়নদ্দি গ্যাচে !"

ফোঁস্ করে' ওঠে সিন্ধু, "দেরী হয়েচে না হাতি ! এতোখানি 'আস্তা' ঘুরে ঘুরে এইতো সবে গেল সে।"

চল্‌তে চল্‌তে বলে হরেন, "ঘোরগোড়ায় দাঁইড়ে দাঁইড়ে শালা হাল্লাক। মনে করি ঘুমিয়ে পড়েচে দোর দিয়ে। ডেকে ডেকে গলা পড়ে বাবার ফিকির। রূপোর মা হেঁকে বল্‌লে, 'ওরে হরেন, তোর বউ জয়নদ্দিদের বাড়ী গ্যাচে'।"

সিন্ধু বলে, "আমিও বসে আছি তোমার মুখ চেয়ে। বলি ঘরে নেই জান্‌লে এসে নিয়ে যাবেখন। যে-রকম 'আস্তা' বাবা—এগ্‌লা আসতে ভয় করে। শেষ বেলা বেন নম্বরটা দিলে আইলে তোমাদের সাড়া শুনে —তবে আসি ! তা তুমিও আচ্ছা 'নোক'—দোরে ছেকল দোওয়া আছে ছাখোনি ?" আঁচলের চাবি দিয়ে তালা খুলে দোর ঠেলে বাকুলে ঢোকে সিন্ধু। বলে, "চলো ঘাটে চলো। বাল্‌তিটা হাতে করে' নও।"

হ্যারিকেনটা জেলে নেয় সিন্ধু। ঘাটে যায় দু'জনে। হাত পা ধোয় ধাক্কাধাক্কি করে'। খিল্‌খিল্ করে' হেসে গড়িয়ে পড়ে। হঠাৎ টাল্ সামলাতে না পেরে ঝপাং করে' পড়ে যায় সিন্ধু। তারপর উঠে পড়ে' রেগে বলে, "দেখলে মুখপোড়া মিন্‌ষের রকম ! কি পরবো যেয়ে এবের ?"

হরেন হালকা সুরে বলে, "আমার দোষ, না ? নিজেই ধাক্কা মারলে অগ্‌গেরে, আর আমি ধাক্কা দিতেই দোষ হলো।"

"নাঃ !" গাল ফুলিয়ে কৃত্রিম ক্রোধে বলে সিন্ধু—"আমি মাথা ডুবিয়ে চান করি—চুলতো ভিজেইচে। সারা 'আত' পচে' গন্ধ ছুডুক।"

গোটা তিনেক্ ডুব দিয়ে নেয় সিন্ধু 'মা দুগ্‌গা' বলে'। ঘাটের ওপর উঠে বলে, "বাঁচলু বাবা, যে-রকম গুম্‌সি করেচে। গায়ে খালি টক্ গন্ধ বেরুচ্ছ্যালো।"

"নে নে হয়েচে, আয় তুই। খিদেয় পেটের নাড়ীভুঁড়ি সব হজম হয়ে গেল।"

"চলো।" গায়ে মাথায় আর ভাল করে' কাপড় না দিয়েই হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে চট্‌পট্‌ শব্দ করে' ওপরে উঠে আসে সিন্ধু। ওর দুরন্ত জোয়ারভরা পরিপুষ্ট দৈহিক গঠনভঙ্গিমার দিকে তাকায় হরেন। চোখের দৃষ্টি একটু কড়া হয় যেন। মাথায় কাপড় দেয় সিন্ধু।

বাড়ীতে এসে কাপড় ছেড়ে নিয়ে ভাত দেয় হরেনকে।

হরেন বলে, "তুমি আমার সনে খাও আজ।"

"হেৎ! আমার ভারি নজ্জা করে!" মাথার কাপড়ের প্রান্তভাগে শরমভরা অধোবদনটা আড়াল করে সিন্ধু। হরেন ওর হাত ধরে' বলে, "না খাও, আমার মাথার দিব্যি।"

অগত্যা। নিরুপায় সিন্ধু। স্বামী-স্ত্রীতে এক পাতে এক সাথে বসে খায়। শুধু তাই নয়, এ দেয় ওর গালে, ও দেয় এর। খাওয়া শেষ করে' উঠে বিছানা পেতে সিন্ধু শুতে যাবার আগে লাফিয়ে উঠে হরেনের গলা জড়িয়ে ধরে' ঝুলতে আর দুলতে আরম্ভ করে। মনে বড় উল্লাস আজ তার। হরেন ঘরে আছে নাকি, তাই। ভাল লাগে হরেনের। নিজেই পান সেজে নিয়ে দেয় সিন্ধুর গালে একটা। শুয়ে পড়ে সিন্ধু। গড়াগড়ি করে স্বামীকে বুকে টেনে নিয়ে। গানের সুরে বলে, "একটা গল্প বলো!"

হরেন বলে যায় সেই পুরোনো রূপকথার গল্পটা। 'রাজার মেয়ে, মালিনীর ফুলের মালায় ওজন হয় রোজ। একদিন হলো কি, মালিনীর আশ্রয়ে-এসে-থাকা ছদ্মবেশী এক রাজার ছেলে বল্‌লে, 'দে মাসি, আমি মালা গেঁথে দি'। মাসির হাজার নিষেধ সে শুন্‌লে না। দিলে মালা গেঁথে। সেই মালায় রাজার মেয়ে ওজন হতে গিয়ে দ্যাখে মালার ওজন গেছে বেড়ে। রাজার মেয়ে যেই-না মালা ছুঁয়েছে অমনি সারা গা তার কাঁপতে লেগেছে! জ্বালা করতে লেগেছে গা হাত পা। রাজার মেয়ে গানের সুরে বল্‌লে:

কি মালা আজ দিলি মালিনী
অঙ্গ জ্বলে যায় লো—
অঙ্গ জ্বলে যায় লো আমার
পরাণ জ্বলে যায়...

সুর করে' করে' গায় হরেন এক মেয়েলি ঢংয়ে।

তারপর মালিনীকে ধরলে রাজার কোটাল। বলতে হবে মালিনী এই মালা কে গেঁথেছে আজ। নইলে গর্দান যাবে। ভয়ে পড়ে বলে ফেললে মালিনী তার বোন-পো'র কথা। হুকুম হলো, তাকে নিয়ে এসো দরবারে। শুনে তো গেল রাজার ছেলে নির্ভয়েই। কিন্তু রাজার কোটাল তাকে জেলে পুরলো। এদিকে রাজার মেয়ে দাসীর কাছে শুনলে, যে তার মালা গেঁথে দিয়ে জেলে আছে তার রূপে নাকি ভুবন আলো হয়। শুনে তো গেল রাজার মেয়ে তাকে দেখতে। ব্যাস—যেই দু'জনে দু'জনকে দেখলে,—চার চোখের মিল হলো একবার—অমনি গেল মজে! রাজার মেয়ে রাজার ছেলেকে লুকিয়ে জেল থেকে বার করে' নিয়ে গেল। সে-রাজ্য ছেড়ে চললো তারা বিরিক্ষি (বৃক্ষ) চেলে। মালিনীর শেখানো কামিখ্যের মন্তরে রাজার ছেলে রাজার মেয়েকে নিয়ে সেই গাছ চেলে রাতে রাতে যায় হাজার কোশ। দিন হলেই গাছ থাকে বসে। তার পাতা আর ফুলের ওপরে শুয়ে ঘুমোয় দু'জনে জড়াজড়ি করে'। রাত হলে আবার রাজার ছেলে বাঁশি বাজায়—রাজার মেয়ে তার কোলে শুয়ে থাকে—বৃক্ষ চলে—দূর থেকে দূরে—মাঠ ঘাট নদ নদী পাহাড় পর্বত পেরিয়ে!'...

নাক ডাকতে শুরু করে সিন্ধুর। হরেন ডাকে তাকে বার কতক। ঠেলা মারে। বিরক্ত হয়ে পাশ ফিরে শোয় সিন্ধু অন্যদিকে। বিরক্ত হয়ে ঘুমোতে চেষ্টা করে হরেন। সে ঘুমিয়ে পড়লে উঠে বসে সিন্ধু। ঘুমোয়নি সে মোটেই। ঘুম ধরে না তার চোখে। জয়নদ্দির কথা মনে হয় শুধু তার। রাজার ছেলের বাঁশির সুর আজ তার মনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। কি সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা জয়নদ্দির! মনে মনে সে অনেকদিন থেকেই তাকে ভালবাসে। আজ তার বড় ভাল লেগেছে! উঃ! গায়ে কি ভীষণ জোর লোকটার!

চুপ করে' বসে থাকে সিন্ধু। তাকায়। অন্ধকার। ঘন—জমাট—গম্ভীর। হঠাৎ সে শিউরে ওঠে। গর্ভে যে তার সন্তান আছে! তবে? সে কি রাক্ষসী? নইলে তার মন এমন করে কেন?...না-না-না—ছি-ছি—স্বামী আছে তার—সন্তানের জননী হবে সে! সন্তান!...

স্বামীর বুকের কাছে সরে এসে কুণ্ডুলি পাকাতে চায় যেন সিন্ধু।

ঘুম ভেঙে যায় হরেনের।...

॥ ৭ ॥

দিন পনেরো পরে হঠাৎ দু'রাত দু'দিনের ভারী বৃষ্টিতে চারদিকে 'ভেজা' লেগে যাওয়াতে জয়নদ্দি, কাশেম আর হরেনকে নিয়ে জমিটা রোয়া শেষ করে' ফ্যালে—জালে যাওয়া বন্ধ রেখে। তারপর আবার সেই কাঠফাটা রোদ। জালে মাছ নেই। টো টো করে' ঘুরে বেড়ানো সার শুধু। রোয়াগুলো লাল হয়ে জলে যেতে থাকে। ধিক্কার করে' মহাজনদের নৌকো ঘাটে বেঁধে রেখে জাল তুলে দিয়ে চলে গেছে অনেকে। জেলে ডিঙিতে মাছ ধরে শুধু কতক-গুলো হাঘরে হাভাতে জেলে-মেছোরা চিংড়ি ট্যাংরার লোভে।

মাঝিরা গালে হাত দিয়ে ভাবে আর হুঁকো টানে বিড়ি টানে ঝোবড়া ঘরের ব্যাঙ-লাফিয়ে-ওঠা নীচু ভিজে স্যাঁৎসেতে দাওয়াতে চট্ বিছিয়ে বসে। দেনা আর মান-অপমান গালাগালির পরিমাণ বাড়তে থাকে দোকানে আর মহাজনের কাছে।

কিন্তু শ্রাবণের মাঝামাঝি এসে আবার নাম্‌লো আকাশ। হুড় হুড় গুড় গুড় শব্দ। লাল পানি এসেছে খালে। জয়নদ্দির মা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দেয় ছেলেকে।

"ওরে জয়নু, জালে যা বাবা, জালে যা! খালে যেয়ে দ্যাখ খালি কি রকম লাল 'বন্নে'র পানি এয়েচে! এই পানি এই ক'বছরে আসেনে।"

খবর শুনে জয়নদ্দি ছুটে গেল খালের দিকে। পোলের কাছে রাজ্যের ছেলেমেয়েরা 'মেতা', 'কেঁকো' ধরতে ব্যস্ত। জাল ফেলে ভুড়কুড়ি বেলে ট্যাংরা চিংড়ি ধরছে পাড়ার ছেলের দল। কানাইয়ের মেয়ে মালতী ছিপ্ ফেলে ধরেছেও অনেকগুলো বেশ।

জয়নদ্দি চারচোখ মেলে দ্যাখে, তাল পাকিয়ে পাকিয়ে লাল্‌চে পানি ছুটেছে পাক্ খেতে খেতে খাল বেয়ে। জোয়ার উঠেছে এখন নদীতে। ফিরে আস্‌তে আস্‌তে শোনে কানাইয়ের বাপের কাছে, "বড্ড নাকি মাছ পড়্‌তেচে বাবা। গেল ভাঁটাতেই কানাই এগারো বারোটা পেয়েচে।" মাহিন্দ বুড়ো খ্যাপ্‌লা জালটা কাঁধে নিয়ে চলেছে খালের দিকে।

জয়নদ্দি ছুটে যায় হরেনের কাছে। সকালের পাত্তা-ঘুম দিচ্ছিল সে চার হাত পা চারদিকে ছড়িয়ে। বাচ্চার জন্যে কাঁথা সেলাই করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েচে সিন্ধুও। হরেনের ঠ্যাং ধরে' টান মারে জয়নদ্দি,—"এই শালা বেই, ওঠ, শীগ্‌গিরিই—জালে যাবি চ'—আয়—কাশেমকে ডাকতে যাচ্চি আমি।" ছুটতে ছুটতেই চলে যায় জয়নদ্দি।

উঠে বসে হরেন। চোখ ঘষে। হাই ভাঙে তারপর। বিড়ি ধরায়। সিন্ধুর দিকে তাকিয়ে থাকে উদাস চোখে। এক সময় পা দিয়ে ঠেলা মারে তাকে।

"এই শালী, ওঠ্। এ্যাঃ! শোয়া ত্তাখনা! —ওঠ্, আমি জালে যাচ্চি।"

ক্ষেপে ওঠে সিন্ধু ঘুম ভেঙে যেতে, "মুখপোড়া যেন অবতার রে! জালে যাবে কি যমের বাড়ী যাবে যাও না—নাথি মারচো কেন?"

"এই শালী কাঁহেকো—মুখ সামলে! ঝাঁটা দেখতে পাচ্চিস্?"

"দেখেচে!" আবার ঘুমিয়ে পড়ে সিন্ধু।

বাইরের দোরটা টেনে দিয়ে গামছাটা কোমরে বেঁধে নিয়ে চলে আসে হরেন। মোড়ে এসে ত্তাখে জাল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে তখন কাশেম আর জয়নদ্দি। তাড়াতাড়ি এক রকম ছুটতে ছুটতেই যেন ওরা গিয়ে নৌকোয় ওঠে। দাঁড় টেনে চলে উজান বেয়ে দক্ষিণে। বৃষ্টি এলো ঝম্‌ঝমিয়ে হঠাৎ। কউতির হাওয়া উঠলো তার সঙ্গে। জোয়ারের বেগ কমে আসছে তখন। তবুও জাল নামায় জয়নদ্দি। কেউ কেউ জাল তুলতে শুরু করেছে তখন দু'বার জাল দেবার মতলবে। লাল্‌চে ঘোলা পানি ছুটেছে তাল পাকিয়ে পাকিয়ে।

বিরক্ত হয়ে বলে জয়নদ্দি, "তোরা কি কেউ খবর রাখিস্‌নি গাঁওের! শালা সবই সেই জয়নদ্দির ভরসা!"

হরেন বলে, "ই-গাঁওের মন-মেজাজ শালা বড়লোকের মন-মেজাজের মতন হয়ে গ্যাচে। কখন কি হয় বলা দায়।"

কাশেম বলে, "কে বলে হরেন আমাদের বোকা ছেলে র‍্যা!"

পাক্ খেতে খেতে পানির তোড় ফুলে ফুলে সরে যাচ্ছে। জোয়ার উঠে কিছুক্ষণ স্থিরমন্থর থেকে তারপর ধীরে ধীরে শুরু হচ্চে ভাঁটার টান।

জয়নদ্দিরা ঘণ্টা খানেক পরেই জাল টানতে শুরু করে। হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে জয়নদ্দি, "ওরে শালারা, অনেক মাছ পড়েচে বোধ হয়।"

কাশেম বলে, "দেখ!"

"মাইরি! জালের টান বুঝতে পারিস্‌নি?"

কিন্তু জাল তুলতে ছাখা গেল গোটা পাঁচেক বড় বড় পাঙাশ আর ইলিশ উঠেছে ন'টা।

জয়নদ্দি বলে, "যাই হোক্‌, বাবা বদরগাজি মুখ তুলে চেয়েচ আজ। নৌকো জমা লওয়া 'গব্বো লোস্‌কান' যাচ্ছ্যালো ই-বছরে। পাঙাশগুনো বেশ বাগাতোক্‌ বাগাতোক্‌ রে! ওতেই পুষিয়ে যাবে।"

মাছ নিয়ে ওরা তিন কটুকে পোলের কাছে তুলতে মেছোরা ছুটে আসে পাঁঙাশ নেবার জন্মে। মেপে হয় পাঁচটা চোদ্দ সের।

একজন মেছো বলে, "ডেড্‌ টাকার দরে দিয়ে যাও দাদা সব ক'টা।"

"দু'টাকার এক আধ্‌লা কম হবে নে।" বলে জয়নদ্দি।

ভুঁড়িওয়ালা মেছোটা বলে, "সাত সিকে।"

"দু'টা। এক কথা।"

অবশেষে সেইই নিয়ে নেয় মাছগুলো সমস্ত। ইলিশ ক'টাও। ঐ দু'টাকার দরেই। একটা ইলিশ কাউ। এগার গণ্ডা টাকা হাতে পায় জয়নদ্দি। ওদের বখরা ওদের দুজনকে দিয়ে দেয় সঙ্গে সঙ্গেই হিসেব করে'। বেজায় খুশী হয় ওরা।

জয়নদ্দিকে হাজার তোষামোদ করেও যখন বাগে আসেনা সে, তখন অগত্যাই ওরা দু'জনে খেনো মদ গিলতে ঢোকে গিয়ে ঘুপ্‌টি গলিটার মধ্যে। আবেদ আলীর চা-দোকানে বসে চা খেতে খেতে 'স্বাধীনতা' খবরের কাগজটা ছাখে কিছুক্ষণ সে নেড়ে-চেড়ে। বেড়ে লেখে বটে কাগজটা!

পথে জয়নদ্দির সঙ্গে হঠাৎ ছাখা হয় তারিণী মহাজনের ছেলে রতনের সঙ্গে।

রতন বলে, "কি খবর মাঝি কাকা? মাছটাছ পড়ছে তো?"

"খরো-মাটার বচ্ছর বাবা ই-টা। তা এসো না গো বাবাজী গরীবের বাড়ীর দিকে।"

"গেলে কি খাওয়াবে ? মুরগী আছে তো ?"

"নিশ্চয় নিশ্চয় ! খাওয়াবোনা মানে ? চলো বাবাজী, আজই এক্ষুনি যেয়ে মুরগি জবাই করে' খাওয়াবো।"

হাসে রতন। বলে, "আচ্ছা আচ্ছা, যাব একদিন। অনেক কথা আছে। তোমাকে একটা কাজ করতে দোব—পারবে তো ?"

"কাজ ! মোর দ্বারায় কি কাজ হবে গো বাবাজী ?"

"হবে হবে। তোমার দ্বারাই হবে। সে মস্ত কাজ !" বলে' হাস্তে হাস্তে রতন জয়নদ্দির কাঁধে হাত দেয়। চলতে থাকে পাশাপাশি। গব অনুভব করে এতে জয়নদ্দি। তম্নি মতো লোকের সঙ্গে রতন কিনা এমন বন্ধুভাবে কথা বল্ছে ! ঘর-সংসার পাড়া-পড়শীর কথা জিজ্ঞেস করছে।

রতন বলে, "তোমাদের, মানে, জেলেদের দুঃখকষ্টের কথা, আমাকে বড় ভাবিয়ে তুলেছে জয়নদ্দি-কাকা ! আমাদের পাড়ার জলিল কয়ালের বৌটা আজ রাত্রে গলায় দড়ি দিয়ে মারা গ্যাছে খিদের জ্বালা সইতে না পেরে। আট ন'টা ছেলেমেয়ে—জলিলের কোনো দোষ নেই—নৌকোর দাঁড় টেনে টেনে কতো আর রোজগার করবে যে তাতে তার এতো বড় সংসার চলে যাবে ? তার ওপর আবার জলিলের রাজরোগ ধরেছে। পেটের খোরাক জোটেনা তার আবার চিকিৎসা ! এতো দুঃখকষ্ট কাকা চোখে দেখে সওয়া যায় না।"

"আর আমাদের দুঃখুকষ্ট ! সবই কপাল বাবা !"

"আরে, কপালের দোহাই দিলে হবে না। ওসব ভুল।" সিগারেট ধরায় রতন। ওকেও একটা দেয়। ঠোঁটে সিগারেট চেপে কোঁচার খুঁটে চশমাটা মুছে আবার চোখে লাগায় রতন।

জয়নদ্দি যেন দিশেহারা হয়ে যায়। কি বল্তে চায় রতন ?

রতন বলে, "তোমরা এতো খাটো—হাড়ভাঙা পরিশ্রম করো রাতদিন, তবু তোমাদের দুঃখ ঘোচে না কেন ? হাড়েমাসে জড়িয়ে আছে অভাব অনটন। তোমাদের সবাইয়ের অবস্থা আমি জানি। এই ইলিশ মারির চরে দু'বেলা ভাত জোটে এমন ক'ঘর লোক আছে বলো তো ?"

জয়নদ্দি বলে, "বেশী নেই, দু'চার ঘর মোটে।"

"তবে ? অথচ এমনটা হওয়া উচিত হয়নি। তোমরা যারা এত পরিশ্রম করেও দু'বেলা পেট পুরে খেতে পাচ্ছ না তারা সকলে জোট বাঁধো। তোমাদের মাছের বা দামের বখরা কম দিচ্ছে মহাজনেরা। সবাই মিলে বলো, এ বখরা চল্‌বে না। আর তোমরা তো ভুল বখরা করো। ধরো, কুড়ি টাকার মাছ হলো; জাল নৌকোওয়ালা মহাজন কতো পাচ্ছে, না, নৌকোর এক বখরা, জালের দেড় বখরা অর্থাৎ আড়াই বখরা, এই আড়াই বখরা সে কেমন জোচ্চুরিভাবে নিচ্ছে, না, মোট টাকা থেকে আগেই আদ্দেক আর সিকি, মানে, দশ টাকা আর পাঁচের আদ্দেক আড়াই অর্থাৎ সাড়ে বারো টাকা কেটে নিচ্ছে। থাকছে কতো, না, সাড়ে সাত টাকা। এই সাড়ে সাত টাকা এবার দু'জন দাঁড়ি আর মাঝির বখরা। যদি সমান সমানও দেয় তাহলে পাচ্ছে মাত্র আড়াই টাকা করে'। এটা কি ঠিক ?"

"এই তো চেরকালের নিয়ম চলে আস্‌তেচে বাবাজী।" বলে জয়নদ্দি।

"হাঁ। এই নিয়মই চিরকাল চলে আস্‌ছে বটে। কিন্তু তাতে তোমাদের কি উন্নতি বা সুখশান্তি হয়েছে কোনোদিন ? যদি মাছ বেশী পড়ে ইলিশের মরশুমটা না হলে চল্‌লো কোনো রকমে। বাকি বছর চলবে কিসে ? মহাজনের দোকানের দেনা করে' বা থালাঘটি বন্ধক দিয়ে তো ? তারপর সে সব শুধ্‌তেই তো ফেল্‌।"

"যা বলেচ বাবাজী। ফেল্‌ বলে ফেল্—একেবারে 'হাটফেল্‌'!"

"না। তুমি বলো, ও-হিসেব চল্‌বে না। ও হলো জোচ্চুরি। আসল হিসেব কি জানো ?"

"না"।

"জানো না। আসল হিসেব হলো, ঐ কুড়ি টাকাই যদি পাও, করো সমান সমান দু'বখরা—সমস্তটা। এবার তা থেকে দু'বখরা দাও জাল নৌকোর জন্যে মহাজনকে—বাকি তার আধ বখরা দাও এক বখরা থেকে ভেঙে। তার গেল আড়াই বখরা। এবার নিক্ মাঝি—যার দায়িত্বে থাক্‌বে জাল নৌকো—দেড় বখরা। বাকি দু'বখরা দু'জন দাঁড়ির। এই হলো আসল হিসেব। ধরো কতো করে' হয়। ভাখো মহাজনের কম্‌লো কি না ?"

জয়নদ্দি উৎসাহিত হয়েই যেন বলে, "ভ্যাখো বাবাজী, ঠিক দাও, ঐটাই রাইট্ হিসেব।"

রতন বলে, "রাইট তো বটেই। বাবার কাছে শুনলুম। কোনো রকমে দু'তিনটে জাল আর নৌকো করে' খাটাতে পারলেই হলো।...ধরো, যেমন ধান জমির ভাগচাষের হিসেব। আধাআধি বখরা ঠিক নয়। তোমার স্রেফ সাদা জমি, বীজধান বা সার কিছু দিলে না, তুমি পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। সে আইন তো লড়াই করে' পাশ হলো। দু-ভাগ পাবে চাষী, একভাগ পাবে জমিদার। কিন্তু কই কাজে ফললো না কিছু? ফললো না এই জন্যে যে জমি কোথা? লোক যে অনেক। অভাবী লোক চারদিকে। পেটের দায়ে যে কোনো শর্তে সে রাজি হয়ে যায়। আধাআধি বখরাও তাই কায়েম রইলো। তারপর অনেক চক্রান্ত আছে জমিওয়ালা পুঁজিওয়ালাদের।"

"তা সত্যি বাবাজী। এই যে মুই তোমাদের জমি নিনু—সেই আধাআধি বখরায়। তিন বখরার এক বখরা পাবে, বললে, তোমার বাপ দেবে কি? দেবেনে। তা বলে উ-জমিও পড়ে থাকবেনে। লোবার লোক ঢের আছে।"

"না ও-রকম ঢের লোক থাকলে চলবে না। থাকলে যারা বাড়ছে তারা আরো বাড়বে—যারা করছে তারা আরো কমবে। দরকার হলো সমতা। সবাই সুখে থাকা। কেউ পায়ের ওপরে পা রেখে সুখে কাটাবে আর কেউ খেটে খেটে হা অন্ন হা অন্ন করে' মরবে—ওটা অন্যায়। যে নিয়মে সব মানুষ সুখে থাকতে পারে সেইটাই ন্যায্য আইন।"

"ঠিক বাবাজী। কিন্তু কথা হলো কি, লেয্য আইন কি চলে?"

"চালাতে হবে। নইলে যেমন আছো তেমনি থাকবে। পেটের জ্বালায় হা হা করে' চিরটা জীবন কাটবে। যার পেটের আহার জুটলো না, তার স্কুল করা কি, লেখাপড়া শেখা কি, শিল্পী হওয়া কি, সাহিত্য করা কি—সব মাটি। আগে পেটের চিন্তা ঘোচাও, তারপর মানুষ হওয়া—বড় হওয়া। বলবে যে দুঃখের মধ্যে কি কেউ বড় হয় না—হয়েছে। সে ক'জন? আর তার কাছ থেকে কি আশা করতে পারো—দুঃখের কথাই তো? যাকগে, সে অতো তুমি বুঝবে না। সুস্থ ভাবে খেয়ে পরে' বাঁচার অধিকার সবাইয়ের আছে। এ যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলে তার মতো শত্রু আর কেউ

নেই। আর স্বীকার করলেই হবে না—তাদের বাঁচাবার জন্তে ব্যবস্থা করতে হবে। কাল থেকে নয়। আজ থেকেই। এখুনি।"

কথা বলতে বলতে ওরা এসে পড়ে জয়নদ্দিদের বাড়ীর কাছে। জয়নদ্দি বলে, "এসো বাবাজী, বাকুলে এসো।" রতনের হাত ধরে টানে সে। রতন আর দ্বিধা করে না। ঢুকে যায় বাড়ীর মধ্যে।

শকিনা মাথায় প্রায় এক হাত ঘোমটা টেনে একটা ছোট মতো মাদুরী পেতে দেয়। তার নামাজ পড়ার জায়-নামাজের পাটি। না হলে অমন বাবু-লোককে বসতে দেবে কিসে?

খুশী হয় জয়নদ্দি শকিনার ব্যবহারে। মাকে উদ্দেশ করে' বলে সে, "তারিণী দাদার ছেলে রতন। বসো বাবাজী, গরীবের ভুঁইকুঁড়ে—দেখতে পাচ্চো তো—কোথা বসতে জায়গা দিই—এই পাটিতে বসো বাবা।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। মাটিতে বসতেও আমার আপত্তি নেই। কেমন আছ দিদি—ভাল তো?"

জয়নদ্দির মা হেসে খুশীতে আটখানা হয়ে বলে, "ভাল দাদা! তুমি ভাল তো?"

"হাঁ দিদি ভাল আছি। আমাকে দেখে আবার লজ্জা কিসের ও কাকীমা—পানি দাও বাবা একটু, খাই।"

হাসে শকিনা। খুশী হয় ছেলেটার সরলতা দেখে। ঘোমটা ছোট করে' দেয় একটু। কাঁচের গ্লাসটা ভাল করে' ধুয়ে চিনি গুলে একটা পাতিলেবু কানাচ থেকে তুলে এনে কেটে নিংড়ে সরবত করে' দেয়।

মহা খুশী হয়ে রতন বলে, "বাঃ! বাঃ! চমৎকার! কপাল আমার ভালই বলতে হবে।"

মুখ খোলে এবার শকিনা, "এক গেলাশ সরবতেই কপাল ভাল হবে কেন বাবা, থাকো মোদের বাড়ী ই-বেলা—তোমার চাচীর হাতের রান্না খাও—ত্যাখন কেমন হয় বোলো।"

চাচীর মুখের দিকে একবার হাসি মুখে তাকায় রতন। বলে, "জাত যাবার ভয় ভাবাচ্ছ না তো চাচী? সে বালাই আমার নেই। আমাকে খাওয়ালে বরঞ্চ কিছু লোকসানই হবে তোমাদের।"

"না বাবা, 'লোসকান' আর কি! বাপকে কিম্বা ছেলেকে খাওয়াতে কেউ লোসকান মনে করে?"

"বেশ বাবা, আমি তোমার বুড়ো বাপ হতে নারাজ, ছেলেই হলাম—খাওয়াও তবে যা খুশী!"

ছেলে মা বৌ সবাই খুশী। 'বাঁঙ' দেওয়া (ডাক শেখা) একটা মোরগ ধরে জয়নদ্দির মা নিয়ে যায় মোল্লার কাছে জবাই করে' আনতে। সেই সঙ্গে ডাল আলু গরম মশলা-আদি আনবার জন্যে জয়নদ্দি মায়ের হাতে দুটো টাকাও দিয়ে দেয়।

জয়নদ্দির ছেলেটা এসে কোলে চড়ে রতনের। চশমাটা নেবে সে।

"এই—এই, গ্যাখো ছেলের কাণ্ড! দিলে বাবা তোমার ফার্সা জামা কাপড় সব নষ্ট করে'!" হাঁ হাঁ করে' আসে শকিনা।

রতন ওকে তুলে নিয়ে বলে, "করুক নষ্ট! এসো তো দেখি। কি নাম তোমার? হি হি—হাসি হচ্ছে? চশমা নেবে? আচ্ছা, দাও চোখে দাও। বারে বা—বেশ মানিয়েছে!"

জয়নদ্দি হেসে বলে, "কুন্ কলু তোমাকে ঘানাগাছ থেকে খুলে দিলে বাব?"

ছেলেটা মহা আনন্দে হেসে হেসে শুধু মাথা ঝাঁকায়। আর নানা দুর্বোধ্য শব্দ করে। ওরা তিনজনে হেসে লুটোপুটি খায়। শকিনা এসে চশমাটা খুলে রতনের হাতে দিয়ে বলে, "লও বাবা, দামী চিজ্, ভেঙে ফেলবে।" ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে' তার পিঠে চড় মেরে মুখে চুমো খেয়ে সরে যায় দাওয়ার ওদিকে।

জয়নদ্দি বিড়ি ধরায় একটা। বলে, "বিড়ি খাই বাবা, খারাপ চিজ, মোটে শালাকে ছাড়তে পারিনি।"

ফোঁস করে' ওঠে শকিনা, "শুধু বিড়ি খাও? তাড়ি মদ গাঁজা আপিন—কুনটা বাদ দও শুনি?"

রতন হেসে বলে, "না জয়নদ্দি-কাকা, অতোটা ভাল নয়। ও-সবেতে মানুষ খারাপ হয়ে যায়। যা খেয়েছ খেয়েছ, আর খেয়ো না। তাহলে তোমাকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না। আমিও মিশবো না তোমার সঙ্গে।"

"না বাবা আর খাবোনি। এই কানমলা খাচ্ছি। 'তওবা' করনু। ঐ যে হরেন আর কাশেম টাকা পেতেই খেনা গিলতে গেল—কই আমি গেচি? হাঁ বাবাজী, সেই হিসেবটা কতো হলো—ধরোদিনি দেখি কতো করে' পাওনা হয়।"

"ধরো।" চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে রতন। একটা বালিশ এনে দেয় শকিনা। বালিশের ওপরে ফুলতোলা ছোট্ট পাংলা কাঁথা বিছিয়ে দেয় একখানা। জয়নদ্দি খাতা পেন্‌সিল বার করে' এনে বসে। রতন বলে যায় হিসেবটা।

"কুড়ি টাকাকে ছ' বখরা করো। ছয় দিয়ে ভাগ দাও। তিন ছয় আঠারো। থাকে দু'টাকা। মানে বত্রিশ আনা। ছয় দিয়ে ভাগ করো, পাঁচ ছয় ত্রিশ আনা। থাকে দু'আনা—ওটা ছেড়ে দাও—বিড়ি খাবার দাম।"

জয়নদ্দি বলে, "তিন টাকা পাঁচ আনা করে'।"

"এ্যাই! এবার মহাজনের কতো করে' হয় ত্থাখো।"

জয়নদ্দি হিসেব করে' যায় খাতা-পেন্‌সিলে। কিছুক্ষণ পরে বলে, 'মাহাজন আড়াই বখরায় পাবে আট টাকা সাড়ে চার আনা। মাঝি ডেড় বখরায় পাবে চার টাকা সাড়ে পনেরো আনা। আর ডাঁড়ি দু'জন দু'বখরায় ঐ তিন টাকা পাঁচ আনা করে'।"

"হাঁ, ঠিক হিসেব হয়েছে। তাহলে মহাজনের আড়াই বখরায় পাওনা কতো কমলো দেখলে তো? একশো টাকার হিসেব ধরলে আরো ভাল করে' বুঝতে পারতে।'

"সামান্য কুড়ি টাকার হিসেবেই ত্থাখো না, কোথা শালা সাড়ে বারো টাকা আর কোথা আট টাকা সাড়ে চার আনা। আর মোদেরও অনেকটা বেড়ে গেল। কের বেতি মাঝি, ডাঁড়িদের সমান বখরাই লেয়—তাহালে সাড়ে তিন বখরা পাবে—এটু বেশী হবে।"

"সে ইচ্ছে করে' যদি কেউ ছাড়ে তোমার মতো—সেটা আলাদা কথা। একশো টাকায় মহাজনের পাওনা হয় চল্লিশ টাকা সাড়ে ছ'আনার মতো আর নেয় সাড়ে বাষট্টি টাকা। বড়লোক মহাজনদের কারবার ত্থাখো।—তাহলে তোমার কাজ এখন কি হবে তা বুঝতে পারলে তো?"

জয়নদ্দি বলে, "হাঁ। কিন্তু মুই যে নৌকো জমা লিইচি তোমাদের ? মোকেও তো তাহলে ঐ নিয়মে দিতে হবে ?"

"তা তো হবেই। সেটাইতো আরো জোরদার হবে। প্রচার করবার আরো দু'জন লোক পাবে, হরেন আর কাশেমকে। ওরাই সাক্ষ্য দেবে— বলবে সবাইকে। হিসেবটা সবাইকে বুঝিয়ে দাও। একটা জোট করো। আমার মনে হয় সবাই মত্ দিতে পারবে।"

"তা দেবে। একটা পয়সা পেলে নুন কিনে বর্তে যায়। কিন্তু আমি ভাবতিচি বাবাজী অন্য কথা। যেতি মাহাজন জাল-নৌকো না দেয় ঐ হিসেব-কড়ি চাইলে ?"

"না দেয় না দেবে। কদ্দিন জাল নৌকো ফেলে রাখে রাখবে।"

"তাতে কি আর মাহাজনের ভাতের হাঁড়ি সিকেয় উঠবে ? উঠবে মোদের, যারা তাদের নৌকো বেয়ে দিন-আনি দিন-খাই।"

"তা হয়তো হবে দিন কতক। কষ্ট একটু করতেই হবে। কিন্তু এটাও সত্যি যে মহাজনও নৌকা জাল শুকনো গুটিয়ে নিয়ে মনের আরামে বসে থাকতে পারবে না। দিনে তাদের এই ইলিশের মরশুমে কতো রোজগার জানো তো ? সে লোভ কি সামলাতে পারবে ?"

"তা বটে। কিন্তু"···চুপ করে' ভাবে জয়নদ্দি মাথা নীচু করে'।

তারপর বলে যায়, "ভাবনা হলো ঐ সব গরীব ডাঁড়ি মাঝিদের লিয়ে। ওদের যে একাকারে হাড়ির হাল। বারো আনা চোদ্দ আনা চালের সের। ছ'সাত জনের কম খেতে নেই। তাদের আহার জোটাবে কোত্থেকে ? মাহাজনের দোকান থেকে ধারে মাল পাওয়াও বন্ধ হয়ে যাবে। তবে হাঁ, খ্যাপলা কাঁদি ফেটিতে কুঁচো মাছ ধরে-বেচে ক'দিন হয়তো চালাতে পারবে কষ্টেসিষ্টে। এইতো ছ'বচ্ছর ইলিশের মোরশোম মন্দা গেল। নাকের জলে চোখের পানিতে দিন কেটেছে মোদের।··· আচ্ছা, ঠিক আছে। আমার তো মনে লেগেচে। বলে দেখবো মাঝি ডাঁড়িদের সব্বাইকে। হরেন আর কাশেমকেও সেই খবরা দোব আমি। কিন্তু তারিণী-দা চটবে আমার ওপরে। তরব-দি তো আগুন হবেই, সে জানা কথা।"

"চটবেন, চটবেন। আমার বাবা হয়তো জানবেন যে এ-মতলব রতন ছাড়া আর কেউ দেয়নি। আমার ওপরেও চটবেন। কিন্তু কি আর করা যাবে। দু'জনের স্বার্থের মুখ্চেয়ে তো আর সাড়ে পনেরো আনা মানুষ ন্যায্য প্রাপ্য ছেড়ে দিয়ে একবেলা একসন্ধ্যে খেয়ে এতো কষ্টে বাঁচতে পারে না।"

জয়নদ্দির মা বাড়ীতে ঢোকে 'কল্লা' ওল্টানো জবাই করা মোরগ আর বাজারগুলো নিয়ে। রতন তাকায় একবার মোরগটার দিকে। শকিনা পালক ছাড়াতে বসে তার। আলুর খোসা ছাড়ায় জয়নদ্দির মা। জয়নদ্দি বসে বসে বেঁহুতি জালটা বুনতে থাকে দ্রুত হাতে।

একসময় জয়নদ্দি বলে, "এই বেঁহুতিটা লিয়ে সাগরে যাবো ই-বছরে—শুকো ধরতে।"

রতন জালটা স্থাখো একবার হাত দিয়ে, বলে, "বেশ সৌখিন হয়েছে তো!"

"মায়ের হাতেরই বোনা বেশী। তোমার চাচীও পারে। সব চেয়ে হাত চালু কানাইয়ের বৌয়ের। তবে মায়ের মতন কাজ সৌখিন লয়। দেখবে একটা ফাঁদি জাল?" জয়নদ্দি উঠে যায় ঘরের মধ্যে।

একটা মৌরোলা-ধরা ফাঁদি নিয়ে আসে, বলে, "ত্থাখো, কাঁটিগুলোও মায়ের তৈরি!"

বিস্ময়বোধ করে রতন, বলে, "উরে ধ্যাস!—এ যে জলের মতন পাৎলা! আর কাঁঠিগুলো কি করে' করেছ!—ও দিদি?"

জয়নদ্দির মা বলে, "অনেক সময় লাগে দাদা, আর কাজ জানা থাকলে করতে কষ্ট কি! আমি শিখেছেনু আমার দাদির কাছে। তার হাতের কাজের মতন কাজ আর কাউকে করতে দেখিনি ভাই। আর কি খাটতো, হাতের পায়ে 'অওসর' (অবসর) বলে' ছ্যালোনি। রান্না, ধানের কাজ, ধান 'কোটা' (ভানা), গরুর কাজ, ছেলে মানুষ করা, সুতো পাকানো, জাল বোনা, কাঁটি বানানো, সেলাই ফোঁড়াই করা—এট্টু বসা নেই—খাবার সময় নেই—ই-দিকে রাত দুপুরে শোবে আর ভোর চারটের উঠবে—কি জাড় কি 'বার্ষা' কি খোরো—এখনকারের মেয়েরা তার সিকির সিকি কাজ করতে পারবে? জিব বেরিয়ে

মোরগের পালকগুলো একটা ঝোঁড়াতে করে' তুলে রাখে শকিনা। পেটটা বঁটিতে কেটে নাড়ীভুঁড়িগুলো টেনে বার করে' তাতে ফেলে দেয়। দাল-কোল্‌জেগুলো আলাদা করে' রেখে এক আঁটি খড় জ্বালিয়ে মোরগের ঠ্যাংটা ধরে আগুনের ওপরে ঘোরাতে থাকে। গায়ের রোঁয়া রোঁয়া পালকগুলো পুড়ে যায় তাপে।

রতন শুধোয়, "অমন করছে কেন?"

জয়নদ্দি হেসে বলে, "চামড়াটা লেবে তাই। ওসব মেয়েরা খায়। আলাদা করে' রাখে।"

রতন দ্যাখে, শকিনা এবাব বাটা হলুদ মাখিয়ে ঠ্যাংকাটা মোরগটা ধুতে নিয়ে যায় ঘাটে। পালকের ঝোঁড়াটা নিয়ে যায় হাতে করে' ফেলে দেবার জন্যে।

জয়দ্দির মা বলে, "কান ফরফর করলে কানে দেবার সময় হঠাক্ করে' একটা 'পলক' পাওয়া যায়নে। বৌ, বড় বড় গোটা চারেক পলক রেখে দিস্ গো রান্না ঘরের বাতায় খুঁসে।" তারপর বলে, "দাদা-ভাইকে আমার লিয়ে এলি এ্যাতো বেলায়—কতো খিদে লাগতেচে হয়তো।"

রতন বলে, "না দিদি, আমি সকালে খেয়েই বেরিয়েছিলুম।"

"সকালে খেয়েচ, সেকি আর এখন 'প্যাটে' আছে? তোমরা জোয়ান মানুষ, খুনের তেজ এখন কতো। তা হাঁ ভাই, বে'-সাদি করবেনে আরো? একটা বউ করোনা দেখি, আরো কতোদিন একলা-একলা থাকবে? লেখা পড়াতো ঢের হলো।"

রতন বলে, "কোথায় আর ঢের হলো দিদি? তবে জেলের ঘরে ঢেরই বটে। ভদ্রলোকের ঘরে আমার মতন কত শত গড়াগড়ি যাচ্ছে।...আর বিয়ের কথা বল্‌ছো দিদি? তা নিয়ে তো রোজই হচ্ছে বাবার সঙ্গে মায়ের। মা ক্ষেপে গ্যাছে একেবারে।"

শকিনা ঘাট থেকে এসে বঁট পেতে নীচে কলাপাতা রেখে মোরগটাকে চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে এবার কুঁচোতে শুরু করে ঘ্যাচ, ঘ্যাচ, শব্দ করে'।

জয়নদ্দির মা নাতিকে নিয়ে এবার শকিনার পাশে গিয়ে বসে। বলে, "জয়নু, মোকে একখিলি পান দেনা বাবা, রতন-ভাই খায় যেতি দে। তা হাঁ ভাই, তোমার বুন্‌টাও তো বেশ ডাগরপানা হয়েচে লয়?"

"হ্যাঁ। তার বয়েস বুঝি সতেরো হয়ে গেল। আঠারোয় পড়েছে। আমি তার থেকে পাঁচ বছরের বড়।"

"তাহালে তো তারই বে' এগ্যে দিতে হয়।"

"তার বরাত খারাপ দিদি। বর পাওয়া যাচ্ছে না। লেখাপড়া শিখে এক মুশ্‌কিল!"

"আর তোমারও তেমনি কনে পাওয়া মুশ্‌কিল।" ঠাট্টা করে জয়নদ্দির মা।

রতন বলে, "আমার তো তবু মুখ্যুসুখ্যু যা হোক্ একটা হলে হবে কিন্তু রোহিণীর তো তা চল্‌বে না! বৌ লেখাপড়া জানা আর বর মুখ্যু, এতো আর চলে না। তা ও আবার বিয়ে করতে চায় না—স্কুল করা নিয়ে পাগল হয়েছে। চাট্টি ছেলেমেয়েও জুটিয়েছে পাড়ার লোকের হাতেপায়ে ধরে। আমাদের বৈঠকখানায় বসে তার স্কুল। ছেলেমেয়েদের বই শ্লেট্ পেন্‌সিল কিনে দেয়। ময়লা কাপড় জামা পরে এলে নিজে কেচেও দেয়। চুল আঁচড়ে দেয়, দাঁত মাজায়, নখ কেটে দেয়, কথা বলা শেখায়। ইলিশ মারির সব ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাবে এই হলো তার পণ। আসলে কি জানো, দুষ্টু ছেলেমেয়েগুলোকে তার মায়েরা ওর কাছে গছিয়ে দিতে পেরে মহা সুখে আছে!"

হেসে ওঠে জয়নদ্দি। বলে, "মোরটাকে দিয়ে এলে মন্দ হয়নে!"

সকলে হাসে খুশীতে।

রান্না চাপায় এবার শকিনা। বলে সে, "মুরগি 'পেগ্‌জে' করতেই এতোক্ষণ সময় গেল, কখন হবেখন, বাবার আমার খিদে লাগতেচে কতো!"

পান এনে গালে গালে দেয় ওদের জয়নদ্দি। রতন পান খায় না। সিগারেট ধরায়। লক্ষ্য করে' বেশ রসানুভব করে সে যখন সংকোচে শরমাতুরা শকিনার গালে পান গুঁজে দেয় জয়নদ্দি।

আবার জাল বুনতে বসে এসে জয়নদ্দি।

রতন বলে, "তোমার ছেলেটার কি নাম রাখলে কাকা ?"

"কিচ্চু এখনও ঠিক হয়নে। বলো'তো বাবা একটা নাম।"

"তোমরা তো আরবীতে নাম রাখো, আমি তো আরবী জানিনে।"

কি যেন একটু ভাবে জয়নদ্দি। বলে, "উ শালা একটা হলেই হলো, আরবী আর ইংরিজী !"

"বেশ'তো, তাহলে বাংলাতেই রাখো !" বলে রতন।

"আমার কুনো আপত্তি নেই, কিন্তু তোমার চাচীর—বাব্বা, উ-যে ঘোর মোসলমান ! ধার্মিকলোক হলো মেয়েরা, কেতাব-কায়দা শাস্তর-মাস্তর সব ওদের জানা—ঠোঁটস্থ মুখস্থ। বছরে একবার মৌলুদ দেয় গেরামের লোক 'মাচোট' (চাঁদা) তুলে—বেশীর ভাগ খরচ তরব'দিষ্ট দেয়—'মৌলু' (মৌলবী) সায়েবরা দীল খোলসা করে' 'বয়ান' করে' যায় শুনে এসে ওরাও হয়ে যায় এক একজন 'মৌলু সায়েব !' আরবী নাম না রাখলে ওরা ভাববে মহা অধর্ম হলো ! মরবার পর নাকি এক একটা কব্বর থেকে একই নামে বাহাত্তুর জন লোক উঠবে রোজ কিয়ামতের দিনে ! তাহ্‌লে আরবী নাম যেতি না হয়—সব গড়বড় হয়ে যাবে।"

রতন বলে, "তাই নাকি ?"

"মৌলু সায়েবরা তো বলে ঐ কথা !"

"তাহলে আমাদের দশা কি হবে—যাদের কবর হয় না ?"

"তোমরা তো সব্বাই সোদা দোজখে যাবে ! সে বিষয়ে আর ভাববার কিচ্চু নেই।"

"আমাদের হিন্দুরাও তাই ভাবে, মুসলমানরা সব বিধর্মী—যবন—ওরা সকলেই নরকে যাবে ! আসলে কি জানো, যে সৎলোক, পুণ্যাত্মা, সে যে জাতেরই যে ধর্মেরই হোক, তার জন্যে পুরস্কার আছে। থাকাও উচিত। কোরআনের বাইরেও ঢের সত্যি আছে, নইলে যারা কোরআন জানেনা তেমন লোকই বা বড় হয় কি করে' ? যখন কোরআন হয়নি তখনও জগতে বড় মানুষ জন্মেছে। কোরআন বাইবেল বেদ-গীতা ভাল, আমি তার অমর্যাদা করিনে—বরং যাঁরা মানেন আমি তাঁদের শ্রদ্ধা করি, তাঁদের চেয়েও অনেক

বেশী করে' মানতে চাই। কিন্তু ওসবের ঐ বাঁধা সত্যের বাইরেও জগতে নিত্য নূতন অনেক সত্যও আছে বা হচ্ছে, সে সবও মানতে হয়। সত্য-মিথ্যা সৎ-অসৎ ন্যায়-অন্যায় পাপ-পুণ্য বিচারের মস্ত বড় বিচারক হলো তোমার বিবেক। ভাবো, চিন্তা করো, সে বলে দেবে। তবে অবশ্য তোমার বিবেককে জাগ্রত করতে হবে—জ্ঞানী করতে হবে—তার জন্যে উপযুক্ত শিক্ষার দরকার। তাইতো ঐ সব ধর্মপুস্তক। মানুষের মনুষ্যত্ব লাভের কথাই ওতে আছে। আল্লাকে লাভ করাই হলো মনুষ্যত্বকে লাভ করা। মানুষ হওয়া সহজ ব্যাপার নয়।"

অনেক বিষয়ে আলোচনা করে রতন। হাঁ করে' শোনে জয়নদ্দি। যদিও সে কতক বোঝে, কতক বোঝে না, তবুও শুনতে ভাল লাগে তার। এমন করে তো 'মৌলবী' সায়েবরা বোঝায় না। তারা শুধু নিজেদের ধর্মের বা সম্প্রদায়েরই গুণগান করে। নিন্দে করে ভিনজাতের—ভিন্ন ধর্মের। অথচ রতন মুসলমানদের কতো কথা জানে, শেখ সাদীর কথা বলে, হাফিজের কথা বলে, বলে যায় সে পৃথিবী বিখ্যাত বহু মুসলিম মহামনীষীদের কথা। কোনো ঈর্ষা বিদ্বেষ বা ঘৃণা নেই। ভালকে ভাল বলবে তাতে আবার কুণ্ঠা কিসের ?

এক সময় রতন প্রশ্ন করে, "মুসলমানদের মধ্যে আজকের যুগে আর মহৎ মানুষ, মানে, ইংরেজীতে যাকে 'গ্রেট্ ম্যান' বলে তা আর জন্মাচ্ছে না কেন বলতে পারো ? তাদের এতো দুর্দশা কেন বলতে পারো ?"

জয়নদ্দি বলে, "জানি। শুদ্দ, মুখ্যুমি আর ভাড়ামির জন্যে। সে যা লয় তাই বলে পরিচয় দেয়—আর যা তাকে হতে হবে সেদিক পানে পিঠ ফিরিয়ে বসে আছে।"

বিস্মিত হয় রতন জয়নদ্দির উত্তর শুনে। কে বলে জয়নদ্দি বোঝে না ? মানুষকে শেখালে শেখে, বোঝালে বোঝে। সৎ প্রবৃত্তি সমস্ত মানুষের মধ্যেই আছে। তাকে জাগাতে জানলেই হয়। হোক্‌না সে জেলে, মুচি, মেথর, ধোপা, নাপিত।

উৎসাহিত হয়ে রতন বলে, "আমারও তাই মনে হয়। ভণ্ডামি যে-জাতের হাড়েমজ্জায় একবার ঢুকেছে তার আর বাঁচোয়া নেই। যুগে যুগে তাই,

হয়েছে। হিন্দুরাও একসময় খুব বড় হয়েছিল জ্ঞানে গুণে—সে গুণ জ্ঞান আর তারা যখন ধরে রাখতে পারলে না, পতন হলো তাদের। মুসলমানরাও তেমনি উঠেছিল তার অনেক সদ্‌গুণের বলে, আজ তা হারিয়েছে বলেই এই দশা! এখনও তো জগতে রাজ্যের সংখ্যা তাদের কম নেই? কিন্তু সে তুলনায় নাম করা মানুষের মতো মানুষ জন্মাচ্ছে ক'জন? ধনী তো আছে অনেক কিন্তু মোহম্মদ মহসীন হচ্ছে কই? নজরুলের মতো অতো বাধা, দুঃখ, ভণ্ডামি, বিপ্লব ঠেলে মাথা তুলতে পারছে ক'জন? আমাদের মধ্যে জন্মেছে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বিবেকানন্দ, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ। তোমাদের মধ্যেও জন্মাবে—তার জন্যে জাতকে সজাগ হতে হবে—লেখাপড়া শিখতে হবে। আজ হিন্দুরা এগোচ্ছে—মুসলমানদেরও তাদের সঙ্গে এগোতে হবে। আজকের যুগে বরং হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান—বা বাবু-সাহেব কুলি-মজুর কোনো কথা নেই, সবাইকে এখন মানুষ হতে হবে। তাই আমাদের আগে লেখাপড়া শিখতে হবে। স্কুল তৈরি করতে হবে। ছেলেদের মানুষ করতে হবে।"

জয়নদ্দি বলে, "ঠিক কথা বলেচ বাবাজী, লাগাও ইস্কুল! শালা এতো বড় গাঁয়ে একটা ইস্কুল নেই। ত্যাখন ভাবতুন, জেলেদের আবার লেখাপড়া শিখে কি হবে?"

রতন বলে, "ওটা ভুল ধারণা। মুচিরও লেখাপড়া শেখা দরকার। লেখাপড়া শিখে যে চাকরিই করতে হবে তার কি কোনো মানে আছে? শিক্ষা হলো আলো, নিজের অন্তরের অন্ধকার ঘোচাবার জন্যে—নিজের প্রাণের জগৎকে আলোকিত করবার জন্যে। যাক্ বাবা, থাক্, অনেক লেকচার দিয়ে ফেললাম তোমার কাছে। আসল কাজ তুমি করো, দামের আন্দোলনটা চালাও—স্কুলের ব্যবস্থা আমি করছি। পরে পরে অনেক কাজ আছে। নিজেদের ভাগ্য নিজেদেরই গড়তে হবে।"

"এসো গো বাবা এসো—খেতে বসো—অনেক বেলা হয়ে গেল।" ভাতপানি বেড়ে ডাক দেয় শকিনা।

হাতের ঘড়িটার ওপরে একবার চোখ বুলোয় রতন। উঠে পড়ে। দেড়টা বেজেছে। খেতে বসে এসে জয়নদ্দির পাশে। মাংসটা খেয়ে দেখে বলে,

"চমৎকার! এতো সুন্দর মাংস রান্না জীবনে খাইনি কখনো আমি। মুসলমান-দের এই একটা গুণ আছে বাবা, রান্না করতে জানে ভালো!" লজ্জা পায় শকিনা। গর্ব অনুভব করে। আড়ঘোমটার আড়ে হাসে মিট্‌মিট্‌ করে' রতনের দিকে তাকিয়ে।

রতন মহা আনন্দেই পেটভরে খায় বসে বসে। জয়নদ্দির মা তার পাশে বসে বাতাস করে আস্তে আস্তে।

খাওয়া যখন শেষ হয়েছে, এসে পৌঁছোয় হরেন আর কাশেম। জালে যাবে তারা। রতনকে জয়নদ্দিদের বাড়ী খেতে দেখে বিস্ময়ে হতবাক্ হয় তারা।

বেশীক্ষণ আর থাকে না রতন। ওদেরও জালে যাবার সময় হয়েছে।

রতন ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ী থেকে বাইরে বেরুতে যাবে হঠাৎ সামনে পড়ে সিন্ধু। অবাক হয়ে একবার তাকায় রতন। আচ্ছা চমৎকার যৌবন তো মেয়েটার! কে এ? বিবাহিতা, হিন্দু মেয়ে। কে হবে—হরেনের বৌ নাকি? যেই হোক্ গে যাক্—তাতে রতনের কি! তবে কেমন করে' যেন তাকালে? তাকালে তো তাকালে, কতো মেয়েই তো তাকায়! কি আছে ওদের? শুধু শরীরটা। মাংস মেদের আকর্ষণ। সে তো স্থূল—তাছাড়া আর কি? যাক্‌গে, চুলোয় যাক্, আরো কিছু থাকে থাক্। তাকে নমস্কার!…

জীব-বিজ্ঞান, ডারুইন আর ফ্রয়েডের কথা মনে পড়লো রতনের।

চলতে চলতে তার প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথের একটা গান ধরে রতন। হাতটা মাঝে মাঝে শুঁকে শুঁকে ভাখে। গরম মশলার গন্ধ। হাসে মনে মনে। হাত শোঁকার একটা হাসির গল্পের কথা মনে পড়ে যায় তার।

হঠাৎ ভাখে পথের পাশে ফণী মনসার ঝাড়ের মাথায় কি অদ্ভুত বিচিত্র বর্ণের ফুল ফুটেছে কয়েকটা। সর্বনাশা কাঁটায় ভর্তি গাছ—মাথায় তার কি অপূর্ব রঙের ফুলের বাহার!

সৃষ্টির একি রহস্য!…

ভরা কোটাল। জোয়ার উঠবার মুখেই ফউতি লাগলো। ঝির্‌ঝিরি বৃষ্টি। পাক খেয়ে খেয়ে ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটা ছুটেছে। আড়বাঁধির মুখ পর্যন্ত ঠেলে উঠেছে জোয়ারের পানি।

জয়নদ্দিরা সবাই এবার কাঁপতে শুধু করেছে ঠাণ্ডায়। কাশেম গান ধরেছে চেঁচিয়ে। গঙ্গায় জাল নামিয়েই এক বোতল চোলাই টেনেছে দু'জনে। তবুও জাড় যাচ্ছে না। গায়ে যেন সুচের মতো বিঁধছে এসে পানির ছিটে। পাহাড় পাহাড় ঢেউ তুলে গরজাচ্ছে নদী। মোচার খোলার মতো টলমল্ করে' দোল খাচ্ছে আর লাফাচ্ছে নৌকাগুলো।

জয়নদ্দি বলে, "আজ ষাঁড়াষাঁড়ির বান ডাকবে! পুঁটে মাঝির ঘোলের কাছের আড়বাঁধিটা আজ যেতি ভাঙে তো ইলিশ মারির চরের দফা ঠেণ্ডা!— রোয়াটা ডুবে গেল না কি তা কে জানে!"

হরেন বলে, "আজ শালা নিঘ্যাত বেশী মাছ গাঁথবে।"

কাশেম বলে, "তাহালে নিকে করবো ফের শালা একটা।"

জয়নদ্দি বলে, "কেন রে, বউটা তোর পুরোতন হয়ে গ্যাচে নাকি?'

কাশেম বলে, "একদম!"

জয়নদ্দি শুধোয়, "হরেনের?"

হরেন বলে, "আমার তো একাবারে যাকে বলে শালা ইয়ে—মানে, চাম্পিয়ান!"

জয়নদ্দি হাসে মিজ্‌মিজ্‌ করে'। তারপর গান ধরে সে খোলা বেপরোয়া গলায় হা হা করে'।

"নদীর ধারে নৌকার বাটে
বাজাও বাঁশি কতোই ঠাটে
আমি তখন জল ভরিতে
ভিজাইলাম মোর শাড়ী রে বন্ধু—
যাইও—যাইও আমার বাড়ী।"...

উল্লাসে হৈ মেরে ওঠে কাশেম : "ছো পাগলী ছো—কোল্‌জেতে কাটারী মেরে দে বাবা! মরে যাই!"

আকাশ ফাটানো চীৎকার ছেড়ে ওঠে হঠাৎ জয়নদ্দি :

"ইয়া আলী! দরিয়ার পাঁচপীর বদর বদর!"

সারা গাঁওের সমস্ত নৌকোয় রব ওঠে ঐ একই কথার, বারবার তিনবার। বান এসেছে গঙ্গায়! ষাঁড়াষাঁড়ির বান। ক্ষ্যাপা উন্মত্ত ষাঁড়ের মতো ছুটেছে। জয়নদ্দিদের নৌকাকে একমানুষ ওপরে তুলে মেরেছে আছাড়। হাল বাগিয়ে ধরেছে জয়নদ্দি। চীৎকার ছাড়ছে, 'দরিয়ার পাঁচপীর বদর বদর'! হুড়মুড় দুড়দাড় শব্দ চারদিকে। ভীষণ টান ধরেছে জালে। পাড়ের বুকে কী ভয়ংকর ঢেউ আছড়ানির শব্দ হচ্ছে। চারদিকে অন্ধকার। বয়ার বাতিটা জল্‌ছে প্রেতের চোখের মতো মাঝে মাঝে দপ্‌ দপ্‌ করে'। জয়নদ্দি ভাবে, একটু মদ না টানলে এই ক্ষ্যাপা নদীর ঢেউয়ের সঙ্গে আজ যুদ্ধ করা মুশকিল! নৌকোটা দেয় বুঝি চরকির মতো পাক্‌ মেরে ডুবিয়ে। দরিয়ার পাঁচপীরকে শরণ করে' আবার হাঁক মারে জয়নদ্দি। ওপারের হীরেপুরের চড়ার ওপর দিয়ে মার মার শব্দে ছুটেছে বান—ওরা তা আন্দাজেই বুঝতে পারে। কালো কালো তাল তাল মেঘ ছুটেছে আকাশের বুকে। আকাশ নেমেছে আজ তেমনি ভয়ংকর হয়ে।

তিন ঘন্টা ধরে সারা জোয়ার ভর চলে এই সংগ্রাম। তারপর বানের বেগ কমে যায়। কমে যায় ঢেউয়ের লাফালাফি। আকাশেও শুরু হয় ইল্‌শে গুঁড়ি ঝরতে। ভাঁটা পড়ছে নদীতে।

জাল টানতে শুরু করে জয়নদ্দিরা। সবাই টানছে এবার।

আনন্দে লাফাতে থাকে জয়নদ্দি। দারুণ মাছ পড়েছে! অগাধ! জাল ভর্তি হয়ে গ্যাছে! এমন মাছ পড়তে সে একবার মাত্র দেখেছিল ছেলেবেলায়। ষোলোটা করে' হয়েছিল টাকায়। মাছ কেনার খদ্দের পাওয়া যায়নি। লোকের দোরে দোরে ঢেলে দিয়ে আসতে হতো। একটা ইলিশের দাম চার পয়সা! নোনা করে' রেখেছিল নাকি জয়নদ্দির মা সেবছরে বিশ পঁচিশ হাঁড়ি! খাবার ধমকে কলেরা হয়ে মারা গ্যাছে কতো লোক!

থর থর করে' কাঁপতে থাকে জয়নদ্দি শীতে আর উত্তেজনায়। জাল থেকে মাছ ছাড়িয়ে নৌকার খোলের মধ্যে ফেলার সময় গুণে গুণে ক্যালে। গোণা শেষ হলে আনন্দে বদ্ধ পাগলের মতো নাচতে থাকে জয়নদ্দি। কাশেম আর হরেন জড়িয়ে ধরে ওকে, "কতো রে শালা, কতো?"

নৌকোর পাটাতনের ওপরে শুয়ে পড়ে জয়নদ্দি। সংখ্যাটা বলে না। অন্য নৌকোর মাঝিরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। আলো-অন্ধকারে ভাল করে' দৃষ্টি চলে না।

পয়রদ্দি হেঁকে শুধোয়, "কি হলো রে সাঁঙাতের?"

কাশেম বলে, "মিরগি আজারের ব্যামো!"

কাছে ছিল কানাইয়ের নৌকো। সে বুঝতে পারে। সেও নাচ জুড়ে দেয়। চীৎকার করে। তারও জালে অনেক মাছ গেঁথেছে নাকি আজ!

তাড়াতাড়ি তিন ফটুকে পোলের কাছে নৌকো এনে ভিড়োয় সকলে। কুড়ি পঁচিশটা নৌকো। এমনি ভিড় আজ সারা গঙ্গার ঘাটে ঘাটে।

ছুটে আসে মেছো পাজারীরা। পদ্মী কাছে এলে জয়নদ্দি বলে, "পদ্মরাণীর ট্যাকায় আজ কুলোবেনে—হে-হে—আজ অনেক মাছ। কেনোর কাছে যাও।"

"তারও ঢের।" পদ্মী বলে, "এক কুড়ি সাতটা। তোমার?"

"মোর? হে-হে—তিন কুড়ি সাতটা! ট্যাকা আছে, সাধ্যে কুলোবে?"

ভুঁড়ো জলধর মেছো এসে হেঁকে বলে, "দাবাও মাছ, দাও আমাকে।"

"কি দর?"

"চল্লিশ। দু'টাকা করে'।"

"পঞ্চাশ। আড়াই টাকা।" দর হাঁকে জয়নদ্দি।

"না, হবেনে।"

"ভাগো তবে। গাঙে টেনে ফেলে দোব, তবু দুবুনি।" বলে চলে যায় জয়নদ্দি অন্য নৌকোর কাছে।

সবাই মাছ পেয়েছে বেশীবেশী আজ। তবে জয়নদ্দির মতো অতো কেউ নয়।

পয়রদ্দি বলে, "তোর নসীব ভাল রে জয়নদ্দি। মোর মোটে সতেরোটা পড়েছে। পুরোনো ছেঁড়া জাল। গোটা ঝাঁকটাই তোর জালে আঁটকে গ্যাচে আজ।"

"আল্লার মরজি দাদা—আল্লার মরজি!" বলে জয়নদ্দি আনন্দের উল্লাসে।

জলধর আসে আবার: "দাও দাদা দিয়ে দাও। আজ মালের ঠ্যাল্ 'ঢ্যার'। 'ঢের' শব্দটাকে বিকৃত করে' উচ্চারণ করে জলধর ইচ্ছা করেই।

গ্রাহ্য করে না জয়নদ্দি। বসে বসে সরু কোল্‌কেতে দম্ মেরে নেয় গোটা কতক বেশ জোর্‌সে। তারপর মনে পড়ে যে জিনিসটা খাওয়া অন্যায় হয়ে গেছে। কানমলা খায় দুটো।

পরেশ বলে, "আচ্ছা জয়নদ্দি-দা, এই বাবা মহাদেবের পেসাদটা পেলে তোমার কেমন হয়?"

জয়নদ্দি শুধোয়, "তোর?"

"মনে হয় যেন আমার পা দুটো মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসে আমাকে বয়ে নিয়ে চলেচে স্বগ্যের দিকে—আর বৌ এসে কাছা ধরে' 'কোথা যাচ্চ' বলে টান্‌তেই ব্যাস্—পটাস্—ছুম্!"

হো হো করে' হেসে ওঠে ক'জনে। ওর কথাই অমনি; একটু রঙ্ ফলিয়ে কথা বলে পরেশ।

জয়নদ্দি বলে, "আমারও মনে হয় যেন শূন্যে উঠে যাচ্চি বোঁ বোঁ করে', তারপর হঠাৎ ছুম্ করে' যেন পড়ে গেনু! এমনি হবে যতক্ষণ নেশা থাক্‌বে।"

ছিধর বলে, "তা বাবার পেসাদটা পেলে মনটা বেশ বড় পানা হয়ে যায়। ন' সেরকে ছ' সের, ন' গোণ্ডাকে ছ' গোণ্ডা—লে শালা—যা দিস্ দে।"

জয়নদ্দি বলে সেই গল্পটা:

"দু'জন গ্যাঁজাড়ের গল্প জানিস্? একজন বলে, 'আমার বাপের এতো বড় গো'ল (গোয়াল) ঘর ছ্যালো যে, এ-মাথায় বাছুর হয়ে ও-মাথা দিয়ে বেরিয়ে আসবার সময় সেই বাছুর, শালা, 'গাবিন' হয়ে যেতো।' অন্য গ্যাঁজাড়েটাই বা হার মান্‌বে কেন? সে বল্‌লে, 'আমার বাপের কতো বড় একটা ছিপ্ ছ্যালো জানিস্? গঙ্গার ই-পারে বসে ফেলতো ও-ই উ-পারে!' পয়লা

লোকটা বললে, "দুর্, শালা! তোর বাপ তাহালে ছিপটা রাখতো কোথা?"
অন্তলোকটা বললে, "কেন, তোর বাপের 'গইলে' (গোয়ালে)!"

সবাই হো হো করে' হাসলে কতক্ষণ। পরেশ একটা অশ্লীল গল্প বার করলে গাল দিয়ে তার পাছায় লাথি মেরে নিজের নৌকায় ফিরে এলো জয়নদ্দি। না, আর কখনো গাঁজা খাবে না সে। বুকের ভেতরটা কেমন যেন খ্যাচ্. খ্যাচ্. করে জোরে দম্ মারলে কোল্‌কেতে। কোল্‌জেটাকে কে যেন টেনে ধরে। আবার দুটো কানমলা খায় জয়নদ্দি। না. আর খাবে না।...

রাত দশটার ভোঁ হয় মিলে। বসে থাকে জয়নদ্দি। কলের লোক এলে খুচরো বিক্রি করবে আজ।

পদী এক বাজরা মাছ নিয়ে চলে গেল সামনে দিয়ে। তার মাসির হাতের হ্যারিকেনের আলোটা দুল্‌তে দুল্‌তে উঠে গেল বাঁধের ওপরে। শিয়াল দৌড়চ্ছে পানির কাছ ঘেঁষে আহারের খোঁজে। হরেন আর কাশেম নেমে যায় কলের লোক ডেকে আনবার জন্যে। ডাকতেও হবে না, ওদের দেখলেই মাছ আছে কিনা জিজ্ঞেস করবে। দু'টাকা করে' দিতে হয় ঘরোয়া খেয়ো-খদ্দেরকেই দেবে—পাজারী-ব্যাপারীদের বড়লোক করে' কি হবে? কানাই ছাড়া মাছ বোধ হয় কেউ ছাড়েনি এখনও সব। কলের লোক এলো হুড়হুড় করে' বাঁধভাঙা স্রোতের মতো এক দঙ্গল।

চ্যাচাতে থাকে জয়নদ্দি, "চলে গেল, সস্তার মাল"—

"কতো করে' গো?"

"দু'টাকা সের?"

"ধরো, পাল্লা ধরো,—দাও আমাকে এই পাঁচটা মাছ।"

পাল্লা ধরে জয়নদ্দি। পাঁচটায় আট সের। যোলোটা টাকা ফেলে দেয় লোকটা। বলে, "তিন টাকা সাড়ে তিন টাকা চার টাকা পর্যন্ত মাছ কিনেছি দাদা মেছোদের কাছ থেকে। তোমরা যদি দাও তো আমরা বেঁচে যাই।"

একটা ডিবের মধ্যে নোটগুলো পোরে জয়নদ্দি। খদ্দেরের ভিড় লেগে গেছে। হপ্তার দিন আজ, টাকা পেয়েছে লোকগুলো। বেশী করে' কিনে নিয়ে যাচ্ছে

পাড়া-পড়শীদের কাছে বেচে দেবে বলে। ক'বছর তো ইলিশের মুখ দেখতে পায়নি কেউ।

জলধর আসে আবার।

"পঞ্চাশ টাকা কুড়ি দিচ্চি, দাও আমাকে,"—বলে জয়নদ্দির হাতের পাল্লা চেপে ধরে সে।

রুখে ওঠে জয়নদ্দি, "ভাগো শালা কাঁহে-কো—পাল্লা চেপে ধরো—এতো বড় আস্‌পাদ্দা তোমার?"

চেঁচিয়ে ওঠে জলধর, "মুখ সাম্‌লে।"

লাফ মেরে ঘুঁষি বাগিয়ে আসে কাশেম, "তুমি শালা ভুঁড়ো মুখ সাম্‌লে।"

হরেন লাফ মেরে নীচে নেমে পড়ে নড়া ধরে টেনে সরিয়ে দেয় জলধরকে।

ফুঁকে উড়ে যায় যেন মাছগুলো। ভূতে কুটি ওড়ানোর মতো।…

একটা মাছ হয়েছে মাপে ন'পোয়া। দেবে না বলে সেটা সরিয়ে রেখেছিল জয়নদ্দি। একজন মিনতিভরা স্বরে বলে, "দাওনা দাদা ঐ মাছটা, আড়াই টাকা সের দিচ্ছি।"

জয়নদ্দি বলে, "ওটা দুবুনি দাদা, উ মোদের খাবার মাছ।"

"তিন টাকা সের দিচ্ছি?"

"কি মুশকিল রে বাবা! কিরে কাশেম দোব?"

"দাও, দিয়ে দাও, খদ্দের লক্ষ্মী—ফিরোতে নেই; আর ভাল দর দিচ্চে য্যাখন।"

"আচ্ছা দাও, ছ'টাকা দও, এক পো'র দাম আর দিতে হবেনে।"

ছ'টা টাকা দিয়ে মাছটা নিয়ে চলে যায় লোকটা।

টাকা গুণতে বসে এবার জয়নদ্দি। অনেক লাভ হয়েছে আজ তাদের। একে বেশী মাছ তার ওপরে সের দরে! গুণে দেখে টাকাগুলো মুঠো করে' ধরে আনন্দে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। চ্যাঁচাতে থাকে, "ওরে বাবারে, এ্যাতো টাকা কি করবো রে!"

কাশেম আর হরেন তাকে হরদম চাপড়াতে থাকে। জয়নদ্দি চ্যাঁচায়, "ওরে শালারা মারিসনিরে আর! মরে যাবো।…তোদের যে আজ অনেক টাকার বখরা দিতে হবে রে—মোর কোল্‌জে ফেটে যাবে। রতন বাবাজী যেতি

ছ'দিন বাদে আসতো রে মুই বেঁচে যেতুম। তাকে কথা দিইচি রে, লতুন হিসেব ধরাতে হবে।"

পয়রদ্দি চ্যাঁচায়, "মাথায় পানি চাপড়া—মাথায় পানি চাপড়া!" উঠে বসে জয়নদ্দি। হেঁকে বলে, "হাঁ হে ভায়রা ভাইয়ের শশুরের ছেলে, তুই মাথায় পানি চাপড়া—মাথা শেতল হোক—মাছ তো পাস্‌নি বেশী, তাই হিংসে হচ্চে!"...

টাকার বখরা করতে বসে এবার জয়নদ্দি। সমস্ত টাকাকে ছ'বখরা করে। মোট এক শো তিরেনব্বুই টাকা আট আনা হয়েছে। বত্রিশ টাকা চার আনা করে' দু'জনকে চৌষট্টি টাকা আট আনা দিয়ে দেয়। চার বখরা নিজে নেয়। নতুন হিসেবটা বুঝিয়ে দেয় ওদেরকে।

জয়নদ্দি বলে, "মুই মাঝি যেতি, এক বখরাও লিতুন, পুরোনো হিসেবে কতো তোদের পাওনা হতো জানিস্? চব্বিশ টাকা দু'আনা করে'। সে জায়গায় নৌকোর এক বখরা, জালের ডেড় বখরা, মাঝির ডেড় বখরা, এই চার বখরা লিয়েও সমান ছ'বখরা করে' তোদের কতো বেশী হলো। রতন বাবু বলে গ্যাচে। এইটাই নাকি আসল হিসেব। মুই চার বখরায় পেনু এক শো উনতিরিশ টাকা আর তরবদি হলে আড়াই বখরাতেই লিতো এক শো কুড়ি টাকা দশ আনা।"

"সবাইকে বলতে হবে তাহালে! বেশ তো হিসেব! মোরা বেঁচে যাই তাহালে। যাই ওদের সব বলে আসি।" নৌকা থেকে লাফ মেরে নেমে গেল কাশেম। হরেনও গেল তার পিছু পিছু।

ডেকে-হেঁকে জোটালে সকলকে এক জায়গায়। জয়নদ্দিও গেল। নতুন হিসেবটা বুঝিয়ে দিলে। কাশেমরা বললে, "হাঁ আমরা ঐ হিসেবেই টাকা পেইচি।" অনেকেই বল্‌লে "আমরাও ওই হিসেব ধরাবো তাহালে কাল সকালে।"

একজন বল্‌লে, "তরবদি তাহালে গালে চড় মেরে জাল-নৌকো কেড়ে নেবে।"

জয়নদ্দি বলে, "নেয় নেবে। এই মাছের মোরশোমে কদ্দিন জাল-নৌকো বসিয়ে রাখবে? কোলজে ফেটে যাবে তাহালে! বল্‌বে অন্যলোকে ঐ হিসেব দিচ্চে তুমি নেবেনে কেন?"

পরেশ মাঝি বলে, "তারিণী দাদার কাছে বল্লেই 'বোম সটকা চালের মটকা, খিদিরপুরের পোল আঁটকা।"

জয়নদ্দি বলে, "তোমরা ভাবতেচ মোদের বন্ধের ক'টা দিন চলবে কেমন করে'? আরে, জেলের ঘরে কি অন্য কুনো জাল নেই? বেংতি খ্যাপলা কেটি ফাঁদি—এই সব লিয়ে পাড়ায় পুকুরে খালে মাছ মেরে খাবে। কেউ ভাবতেচ, ইলিশের মোরশোম গেলে দোরাস্ লোস্কান? আরে, এই দু'তিন মাসের উপায় তো সারা বছরের উপায়। সেই টাকাতেই তো দেনা মেটাতে হবে। গয়না ছাড়াতে হবে। তাহালে যে মাহাজনের দোকানে জীবন-যৈবন থালা-ঘটি সব বন্ধক যাবে।"

পয়রদ্দি বলে, "ঠিক আছে দাদা, লাগাও 'আন্দোলন'। মাছ না পড়লে ত্যাখন চলে কি করে' মোদের? এই যে পনেরো দিন জাল সিকেয় উঠে ছ্যালো—কি করে' চল্‌লো মোদের? দু'চার টাকা বেশী পাই সে তো মোদেরই লাভ! আর মুঠো-বন্দী করে' চোখের সামনে অতো টাকা তুলে লেয়, মোদের জানে কষ্ট হয়নে? তবুও তো মোদের চোর মনে করে। দয়া করে' কুনোদিন খুব কম পড়লেও ছেড়ে দেয়?"

পরেশ বলে, "জয়নদ্দি-দাদা, তোমাকে এ-যুক্তি কে দিলে বলো তো?"

"সে পরে বল্‌বো। পাকা লোকই আছে। লেখাপড়া জানে। আর মাহাজনের গুষ্টিতেই তার 'জয়মো'।"

"ও বুঝিচি বুঝিচি। থাক্ আর নাম বলতে হবেনে।"

পরেশের কানের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করে পয়রদ্দি, "কে র‍্যা?"

"রতন বাবু! তারিণী দাদার ছেলে।" ফ্যাঁস্ ফ্যাঁসে স্বরে পয়রদ্দির কানের কাছে বলে পরেশ।

জয়নদ্দি তাড়া দেয়: "চুপ শালারা, নাম বলিস্‌নি এখন! চলি তাহালে—ঐ কথা রইলো, কাল সকালে বলা চাই। আমার ওপরে কিন্তু চটবে খুব মাহাজনরা।" বলে হাসে জয়নদ্দি। "পয়রদ্দি-দাদা, থাক্‌চো তো, জালটা দেখো।" চলে আসে ওরা তিনজনে।

তিন কটুকে পোলের কাছে এসে ভাখে জনা কয়েক রাতের মোহিনী তখনও তাদের বস্তিটার গলির মুখে লম্ফ জেলে বসে বসে বিড়ি টানছে।

মদ কিনতে যাবার নাম করতেই জয়নদ্দি নিষেধ করে।

বলে, "তাহালে রাগারাগি হয়ে যাবে। আমার নৌকোয় কাজে লুবুনি।"

অগত্যা—ওরা জয়নদ্দির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী ফিরে চলে।

হরেন আসে জয়নদ্দির সঙ্গে তাদের বাড়ী। সিন্ধু আছে সেখানে। জয়নদ্দি ভাবে, একবার বলে সে 'ঘরেই যা হরেন, তোর বৌ মোদের বাড়ী আসেনে,' আবার রতনের কথা মনে পড়ে যায়। বিবেক দংশন করে।... 'যা অন্যায় বা খারাপ বলে জানো তা কক্ষনো করবে না।'...তাই আর কিছু বলে না। সিন্ধুকেও তেমন আর রাস্তার মাঝখানে আকস্মিক ভাবে হয়তো ধরতে পারবে না। শকিনা জানতে পেরেছে। কড়া চোখে তাকায় সে। একদিন সিন্ধু তাকে চোখের দ্বারা কি যেন ইসারা করে' বলছিল—চোখ পড়ে গেল শকিনার। কড়াচোখে তাকিয়ে গুম্ হয়ে গেল, সারাদিন আর কথা বলেনি সেদিন।

ঘুমিয়ে পড়েছিল সিন্ধু, শকিনা তাকে ডেকে তুলে দিলে সে আলোটা জ্বালিয়ে নিয়ে চলে যায় হরেনের সঙ্গে। যাবার সময় আড়েআড়ে তাকায় জয়নদ্দির দিকে, শকিনার তাও চোখ এড়ায় না। শকিনার ভয়ে মাথা গোঁজ করে' থাকে জয়নদ্দি, আখে আর হাসে মনে মনে। যেন চাবুক হাতে নিয়ে জব্দ করে' রেখেছে বাঘকে সার্কাসের মানুষের সামনে! যেমনি লোলুপ চোখে তাকায় অমনি এক খোঁচা। নিরুপায় হয়ে রাগে শুধু গোমরাতে থাকে বাঘটা! খাঁচায় বন্দী থাকে বলেই যা বন্যতার দাপট একটু কমে গেছে। খাঁচাওয়ালার সঙ্গে একটা সন্ধি আছে, সেটা হলো স্বার্থের—তাই একটু হৃদ্যতা।

টাকা দিয়ে আলো নিয়ে গা হাত ধুয়ে এসে খেতে বসে জয়নদ্দি।

ঘুমভাঙা পাখীর মতো যেন নড়ে চড়ে বুড়ী। বলে, "আজকে মাছ পড়ে ছ্যালো হাঁ বাবা?"

"হাঁ।"

"কতগুলি রে?"

"তিন কুড়ি সাতটা।"

আঁৎকে ওঠে যেন শকিনা, "অতো!"

"হাঁ, কাল তোর গয়না দু'খানা তয়বদির বউয়ের কাছ থেকে ছেইড়ে আনতে টাকা দিস্ মাকে। নিজে যাস্‌নি যেন।"...

খেতে খেতে কথা বল্‌ছিল বটে জয়নদ্দি কিন্তু মন তার অন্যমনস্ক কাল দাঁড়ি মাঝিদের নতুন বখরার ব্যাপারে কি ঘটবে সেই ভাবনায়। তারিণী আর তয়বদি ভাববে এর মূল-গাছ হলো জয়নদ্দি।

শুতে এলে শকিনা বলে, "চাল কিনবার টাকা দিতে হবে, খোরাকী একদম নেই। ধান কিনলে এখন আর শুকনো করা যাবেনে— যে বার্ষা নেবেচে।"

"ধানই বা পাওয়া যাচ্চে কোথা? ধানদোকান সব বন্ধ, ধান পাওয়া যায়নে বলে'। কন্টোলের চাল আট্টাও মানুষে খাবার যোগ্য লয়,—শালা, গরমেন্টো যেন মোদের জন্ত জানোয়ার পেয়েচে।...কাল জালে থিকে আসবার সময় চাল নিয়ে আসবো সের পনেরো। অতো হাত লম্বা করে' খরচ করলে চল্‌বেনে—এইতো সেদিনে চাল কিন্‌নু। ধার দিচ্চিস্ বোধ হয় খুব ঠেসে?"

"হাঁ ধার দিচ্চে না বেচতেচে! তোমার একলারই তো পাঁচ পো' চাল লাগে দৈনিক দু'বেলায়।"

"আর তোর লাগে এক ছটাক করে' আধ পো'।"

"উঃ!" অদ্ভুত এক ভঙ্গি করে' মুখ বাঁকায় শকিনা। সেই সঙ্গে একটা গুঁতো মারে স্বামীর পাঁজরে।

জয়নদ্দি বলে, "এই শালী, বড্ড মারবো! এখন 'নিন' (নিদ্) ধরেচে, জ্বালাস্‌নি।"

"নতুন পীরিতে পড়েও এ্যাতো নিদ্? কোথা হা-হুতোশ করবে"...

জয়নদ্দি গুম্ করে' একটা কীল্ মারে শকিনার পিঠে। শকিনা পান সাজা ফেলে স্বামীর বুকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

জয়নদ্দি বলে, "আচ্ছা আচ্ছা ছেড়েদে, নিদে আমার দরকার নেই বাবা, —ভাবতিচি দিশুর কথা!"

আদরের সুরে বলে শকিনা, "পরের মেয়ে মানুষের দিকে কু-নজর ফেল্‌লে কি হয় জানো?"

"জানি!"

"কি ?"

"নিজের মেয়েমানুষের কাছ থেকে ঝ্যাঁটা খেতে হয় !"

"একবার 'জেনা' (ব্যভিচার) করলে 'বাহাত্তুর' হাজার বচ্ছর জাহান্নামের আগুনে পুড়তে হবে।"

"আর নিজের মেয়েমানুষের দিকে নজর ফেল্‌লে কি হয় ?"

"যাও !" বলে শকিনা জয়নদ্দির বাহুপাশ থেকে মুক্ত করে' নেয় নিজেকে। তারপর শুয়ে পড়ে সটান্ আলোটা এক ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিয়ে।

জয়নদ্দি বলে, "মাথার চুলের কি পচা 'গোন্ধ'রে তোর, ভূত পালাবে যে।"

শকিনা অনুযোগের সুরে বলে, "কি করবো, কাপড় কেচে অবেলায় গা ধুনুন্, এই এক রাজ্যের চুল শুকোবো কি করে'? ওগো শোনো, এক শিশি বাস-তেল কিনে দেবে ? তাহালে চুলের গোন্ধ থাক্‌বেনে !"

জয়নদ্দি হেসে বলে, "বাস-তেল ? বেহেস্তে যেয়ে মাখিস্। জেলের বৌ, যার গায়ে মাছের গোন্ধ, সে বাস-তেল মাখলে, পরীর মতন 'ডানোক' গজাবে, কুনদিন জালে থিঙে ফিরে দেখবো, বিবি আমার উধাও !…কেরাসিন তেল মাখিস্, কেউ ঘেঁষতে পারবেনে।"

ফুঁসিয়ে ওঠে শকিনা, "হাঁ মাখবো। মাখবোই তো। মেখে আর দোব একটু আগুন ধরিয়ে।"…

জয়নদ্দি বলে, "না, 'মেজাত' য্যাখন এ্যাতো গরম হয়েচে ঠেণ্ডা তেলের একটা দরকারই বটে ! শালা, যার জন্তে আমার এ্যাতো কষ্ট—এ্যাতো রোজগার, তার মাথাটা যেতি ঠেণ্ডা না রইলো তবে কিসের ঘর-সম্সার—কিসের জীবন-যৈবন—সব অন্ধকার।"

জয়নদ্দি শকিনাকে কাছে টানতে গেলে সে ছিটকে সরে যায় একদিকে। আর গাল দেয় কটকট করে'। জয়নদ্দি হাসে। তারপর অভিমান ভাঙায় অনেক আদর করে'।

॥ ৯ ॥
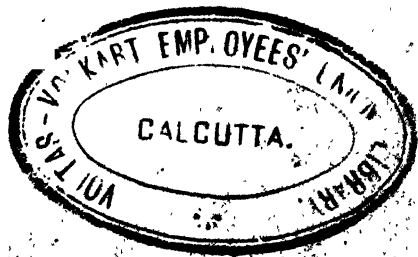
পরদিন সূর্য মুখ দ্যাখাবার অনেক আগেই লাগলো জোয়ার।

তাই সবাই মাছের দামকড়ি দিতে এলো বেলা দশটার সময়।

থেলো হুঁকোটা ভড়াক্ ভড়াক্ করে' এক মনেই টানছিল এতক্ষণ তরবদি তার দলিজের দাওয়ার বেঞ্চিতে বসে, একটা খুঁটি হেলান দিয়ে। দাঁড়ি মাঝিদের দেখে বলে, "কিরে, তোরা সব বাবু বনে' গেলি নাকি? গায়ে হাওয়া লেগিয়ে এই সবে আসা হচ্ছে? সকালে আসতে কি হয়ে ছ্যালো?"

পয়রদ্দি বলে, "আজ যে 'ঝুজ্‌কো' (ভোর) বেলা জুয়ার ছ্যালো!"

"হুম্! দে, টাকা দে। 'ইউনান বোটে'র 'মিটিন্' আছে, ডেকে গেল, যেতে হবে, ই-শালা যেন এক ঝন্‌ঝোট! তরবদি না গেলে কুনো কাজটি হবার উপায় নেই। 'মেম্বর' হওয়াও এক ঝামেলা।"

কানাই হেঁ হেঁ করে' চিতোড় চুলকোতে চুলকোতে তোষামোদের সুরে বলে, "চাচা হলো দশ গেরামের ম চাচা না গেলে কুনো কাজ হয়, না হয়েচে কুনোদিন?"

পয়রদ্দিরা গা টেপাটিপি করে। একজন তার কানের ওপরে মুখ এনে বলে, "শালা থুথু চাটা।"

পয়রদ্দি ঘাড় চুলকে ইতস্ততঃ করতে করতে এক সময় বলেই ফ্যালে, "চাচার কাছে মোদের আজ একটা আর্জি আছে।"

তরবদি হুঁকো থেকে মুখ তুলে না চেয়েই বলে, "বল।"

"মাছের হিসেবটা মোদের এট্টু,"...ভয়ে গলা বন্ধ হয়ে আসে বুঝি পয়রদ্দির।

আমড়া আমড়া চোখ বার করে' পয়রদ্দির দিকে একবার তাকায় বেঁটে খাটো পাঁচ ফুটে লোকটা।

বলে সে রাগ ভরে, "কি বলতে চাস্ খুলে বল। 'হিচ্‌কি' (হিক্কা) তুলিস্‌নি।"

পয়রদ্দি বার দুই কেশে নেয়, বলে, "আপনি হলে মোদের মাহাজন—মোদের কোম্পানি-সায়েব—মোদের 'মুয়ের' পানে এট্টু না চাইলে মোরা মাগ-ছেলে নিয়ে না খেয়ে মরে যাই। সমান সমান ছ'বখরা করে' তারপর আপনি মাহাজন জাল নৌকোর আড়াই বখরা লও, মোদের ডাঁড়ি মাঝিদের সাড়ে তিন বখরা দও।"

"তাই তো দিই—ই-আবার নতুন কথা কি।"

"না, ওর ভিৎরে এট্টু প্যাঁচ আছে। আপনি চার বখরার আড়াই বখরা লও আর মোদের ডেড় বখরা দও।"

"কি রকম?" রেগে ওঠে তরবদি। ভাবে সে, এ বুদ্ধি ওদের মাথায় ঢোকালে কে?

"হাঁ। ধরো, কুড়ি টাকার মাছ হলো, আপনি কতো লও?"

"সাড়ে বারো টাকা।"

"তবে? সমান ছ'বখরা করলে কতো করে' বখরায় পড়ে? তিন ছয় আঠারো টাকা আর থাকে দু'টাকা, মানে, বত্রিশ আনা. পাঁচ ছয় তিরিশ, দু'আনা থাকে, বিড়ি খাবার বাদ দও। হলো তাহালে তিন টাকা পাঁচ আনা করে'। আপনার আড়াই বখরায় এবেরে কতো হচ্চে, না, দু'বখরায় ছ'টাকা দশ আনা আর আধ বখরায় ডেড় টাকা, পাঁচ আনার আদ্দেক দশ পয়সা, এক টাকা সাড়ে দশ আনা, মোট যোগ করো. দু'টাকা দশ আনা আর এক টাকা সাড়ে দশ আনা, হবে তোমার গে যাও, ছ'টাকা, সাত টাকা আর দশ আনা দশ আনা পাঁচ সিকে মানে আট টাকা সাড়ে চার আনা—এই হলো আপনার জালের ডেড় বখরা আর নৌকোর এক বখরার পাওনা—আট টাকা সাড়ে চার আনা। সাড়ে বারো টাকা লয়।—বাকিটা মোদের মাঝির ডেড় বখরায় চার টাকা সাড়ে পনেরো আনা আর দু'জন ডাঁড়ির দু'বখরায় তিন টাকা পাঁচ আনা, তিন টাকা পাঁচ আনা করে' রইলো। এই হলো ঠিক হিসেব।"

তরবদি এতক্ষণ গুম্ হয়ে বসে হিসেবটা শুনছিল। জানে সে ও বখরার হিসেব। তাকে আর অতো শেখাতে হবে না।

বলে, "তোদের মাথায় মগজে 'শয়তান' ঢুকেচে। আরে শালার পাজিগুলো, ধর হিসেব। কুড়ি টাকা হলে মোর দু'বখরায় দশ টাকা হয় কিনা?"

কানাই বলে, "হাঁ হাঁ, তাই তো হবে চাচা!"

পয়রদ্দি বলে, "না। আদ্দেক দিয়ে দিলে আর আদ্দেক থাক্‌বে, মানে, চার বখরা হয়ে গেল। ছ'বখরা হয়নে।"

চেঁচিয়ে ওঠে তরবদি, "না হয়নে, আমার চেয়েও জানিস্ তুই? ঐ হিসেবে দুনিয়া-জাহান চরিয়ে এন্থু, তুই এখন বি-এ পাশ বেরিয়ে এলি! বলি ঐ হিসেব দিচ্চে কোথাও কেউ?"

"না দিলে আমরা বলি?"

"কে দিচ্চে?"

"জয়নদ্দি।"

"ওঃ! শালা লাট হয়েচে একটা নৌকো জমা নিয়ে! সে দিচ্চে, তার টাকা বেশী হয়েচে—তাতে মোর কি? হাঁ র‍্যা, তোরা জানিস্, সে দিচ্চে?"

সবাই বলে, "হাঁ।—কাশেম আর হয়েনকে দিয়েচে।"

তরবদি বলে, "না, আমি দিতে পারবোনি। ইচ্ছা হয় নৌকো বাও আর না-ই বাও।—দে সব টাকা দে।"

কানাই আগেই টাকা রাখে তরবদির পায়ের কাছে অতিরিক্ত বিনয়ের ভঙ্গিতে। তরবদি তার আগের হিসেবেই টাকা কেটে নিয়ে কানাইদের বখরা কানাইকে ভাগ করে' ফেলে দেয়। পয়রদ্দিরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। তারপর সবাই টাকা ফেলে দেয় একে একে। আগের হিসেবেই টাকা কেটে নেয় তরবদি।

পয়রদ্দি বলে, "তাহালে চাচা, মোদের হিসেবটা চল্‌বেনে?"

"না।"

"তাহালে আমরা নৌকো বাইতে পারবোনি।"

"না পারিস্ নেই নেই। আমার তাহালে ভাত হবে আর? জাল তুলে দিয়ে যা!"

"তা দিয়ে যাবো বৈকি।"

"সবাই তোদের ঐ মত,—যুক্তি কেঁদে এয়েচো তাহালে?"

ওরা সকলে আর কোনো কথা না বলে ছড়দাড় করে' নেমে যায় দলিজ থেকে।

হেঁকে বলে তরবদি, "নোকাদের দেনার কথা মনে থাকে যেন!" তারপর

কেটে পড়ে—"এই শালার জয়নদ্দিটা ব্যাতো পাকাচ্চে, শালাকে আমি খুন করবো।"

কানাই বল্‌লে, "টাকার গরম বেধেচে চাচা, ব্যাঙের টাকা হলে হাতীকে লাথি মারে।"

"আর হাতী ব্যাখন ব্যাঙের পিঠে পা তুলে দেয়?"

"ত্যাখনি ফটাস্ ফুস্!—ঐ যো গো চাচা মোর মেয়ে মাল্‌তীটা এয়েচে, কিছু বাজার-হাট দও।" বলেই কানাই চলে আসে বাড়ীর দিকে।

মালতীকে কাছে ডাকে তরবদ্দি। হেসে হেসে বলে, "কি বাজার চাস্ লো?"

মালতী ঘাড় বেঁকিয়ে এক রকম ভঙ্গি করে' বলে, "ডাল-আলু-তেল নঙ্কা"…

"লিয়ে যাবিখন, মোর পিঠের ঘামাচি ক'টা মেরে দিয়ে যা-দিনি। আয়!"

মালতী কটাক্ষ হেনে বলে, "হুঁ!…দুটো ট্যাকা দিতে হবে!"

রস-গদগদ স্বরে বলে তরবদ্দি, "দোব গিন্নি দোব, তোমার জন্যেই তো সব। তোমার পায়ের তলায় নিজেকে বলি দিতেও কুনো দুঃখ নেই আমার।"

পিঠের ঘামাচি মারতে বসে মালতী বলে, "মিন্‌ষের গলায় দড়ি!"

ঘন্টা দেড়েকের মধ্যেই দাঁড়ি মাঝিরা সকলেই জাল তুলে দিয়ে গেল তরবদ্দির; তার বাড়ীর পাশের জাল শুকোবার ভারায় ভারায়। এতোটা অবশ্য আশা করেনি তরবদ্দি। ভেবেছিল ও একটা কথার কথা। তাহলে জয়নদ্দিটা আচ্ছা জোট পাকিয়ে তুলেছে তো! তার সঙ্গে শত্রুতা করতে আরম্ভ করেছে? জালগুলো ভাল করে' দেখে নেয় তরবদ্দি, না, ছেঁড়াগুলো সেরে দিয়ে গ্যাছে।

ওরা সকলে কোনো কথা না বলেই চলে গেল।

জয়নদ্দিকে ডেকে পাঠালে তরবদ্দি মাহিন্দ বুড়োকে দিয়ে। বসে বসে তামুক টানতে লাগলো।

কুলসম বিবি বাইরে এসে বল্‌লে, "কি হলো, জাল যে সব তুলে দিয়ে গেল?"

"শালারা মাছের বখরা বেশী চায়।"

কুলসম মুখ ভেংচে বলে, "এ্যাঃ! বাবুকেলে মাল পেয়েচে!"

মাহিন্দ বুড়ো ফিরে এসে বল্‌লে, "সে আস্‌বেনে দাদা, বল্‌লে তার দরকার থাকে আমার কাছে আস্‌তে বলো।"

"বটে! আচ্ছা!"...কপালের কাছে তিনটে রেখা ফুটিয়ে চোখ দুটো কুঁচ্‌কে দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করে তরবদি। "বড্ড মোসাহেব বনে' গ্যাচে না? ছোটলোকের হাতে দুটো পয়সা পড়তেচে তাই? যাও তো, কানাইকে তারিণীর জাল-নৌকোর খবরটা একবার জেনে আসতে বলো। বুঝেচো?"

সভয়ে মাথা কাৎ করে মাহিন্দ বুড়ো। চলে যায় সে।

ইউনিয়ন বোর্ডের মিটিংয়ে আর যাওয়া হয় না তরবদির। দোকানে এসে গুম্‌ হয়ে বসে বসে ভাবে সে আর হুঁকো টানে। দীর্ঘ দু'বছর পরে যদি বা ইলিশের একটা মোরশুম এলো, শয়তানগুলো ঠিক সেই সময়েই কিনা জাল-নৌকো ডাঙায় তুলে দিলে। দৈনিক এতো টাকা উপায়, সব বন্ধ! তারিণীও কি তাই মেনে নেবে?...জয়নদ্দির মাথায় এ-বুদ্ধি এলো কি করে'? নিজেও তো সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। গরীবের ভালাই করতে চায়? খোদা না বড়লোক করলে কেউ তাকে বড়লোক করতে পারে? সবই কপালের লেখা। তা খণ্ডাতে গেলে খোদার কলমের ওপরে কলম চালাতে হয়। জয়নদ্দিরা তাই করবে, কী আসপাদ্দা! ব্যাটা উচ্ছন্নে যাবে।...গঙ্গার দিকে একবার যেতে হবে। নৌকোগুলো তুলে দিয়েছে, নাকি, গোপনে গোপনে জাল যোগাড় করে' নিয়ে বাইতেছে? মেরে তাহলে পুঁতে ফেলবে না গঙ্গার পাতায়!

চাষের-কাজ-করা একদল জনেরা এলো মুড়ি খেতে। ওরা দলিজে গিয়ে বসলে তরবদির দশ বছরের মেয়ে রাহিলাটা ধামা থেকে পোঁপ রেখ্‌ করে' মুড়ি মেপে মেপে ঢেলে দেয় ওদের গামছায়। পানির কষে লোকগুলোর পা পাটকিলে লাল হয়ে উঠেছে।

তরবদি হেঁকে বলে, "কি রে, ন'বিঘেটা রোয়া শেষ হবে তো আজ?"

মুড়ি গালে পুরে ওদের একজন বলে, "'তলা' ভাল ওঠেনে, গাঁট হয়ে গ্যাচে, কেটে যাচ্ছে, 'বুচ্‌কি' বাধতেচে, সাত আট গোণ্ডা করে' 'বেগুন' হয়েচে সবে।"

তরবদি গজগজ করে, "সাত আট গোণ্ডার বেশী কবেই বা তোরা 'তলা' (বীজ্‌ ধানের চারা) ভেঙিচিস্‌? 'নিজে কাজ কর্‌বিনি, কোদালে ধার নেই'। বসে বসে ক'টা 'বোঁক' মারিস্‌ সব? দ'বিঘে জমি রুইতে কতো জন খরচ লাগে দেখবো খা[illegible] রোই বুকে ভয়ের দাবও[illegible] পাবি।

ওদের একজন বিরক্তস্বরে বলে, "যেমনি তোমার 'তলা' তেমনি তোমার 'কাদা' ধরা। অতো পানিতে 'সিরুলী' ফাঁক পড়ে গ্যাচে. কালের তলাও বেঁধেনে, একদম আচোট মাটি, হাত 'পান্‌শে' হয়ে যায়। ঘরের গরু ঘরের হাল-নাঙোল—ই কি রে বাবা।"

"কেন, কেলো বাগ্‌দি বলে গেল যে ভাল 'কাদা' হয়েছে. চালাকি রাখবার জায়গা পাওনি সব? সে মেয়েমানুষ না শহরের বাবুলোক যে হাল করতে জানেনে?" চিবে চিবে কথা বলে তরবদি।

ওরা আত্মগত সুরেই বলে, "দু'গোছ মেরে দেখে এসো না বাবা, কতো ধক্ ত্তাখা যাবেখন!"

কানাই খবর নিয়ে এলো।...একই দশা। তারিণীরও ভায়ায় সব জাল শুকোচ্ছে! নৌকো ঘাটে বাঁধা!

তরবদি বলে, "তবে? জয়নদ্দি একলা দু'জন ডেঁড়েকে দিলেই হবে? থাক্, কদ্দিন 'কোট' পেতে থাক্‌তে পারে থাকুক্।—তুই জালে যাবি তো?"

"যাবোনি? চাচা কি বলে! নাগালে মোর ভাত হবে কোত্থেকে?"

"আচ্ছা, আরো দু'চারজন লোক জোগাড় করতে পারিস্, নৌকো জাল দিয়ে দিই তাদের?"

"কেউ রাজি হবে কি? মারপিট করবে ওরা!"

"হোক্‌না মারপিট। হলে তো ভালই। জাল-নৌকো সব সিকেয় তুলে দিয়ে জেলে ঢোকাবো শালা জয়নদ্দিকে।"

কানাই চুপ করে' ভাবে, তাহলে মন্দ হয় না। জয়নদ্দির বৌটা আজ বড্ড কয়কয় করে' কথা শুনিয়ে গেল ধার নেওয়া চাল আটাগুলো দেওয়া হয়নি বলে। লক্ষ্মীকেও যা কতেক দিয়ে দিল্লে রাগে পড়ে। কেন সে ধার নেয় ছোটলোকদের কাছ থেকে? মুসলমানের ঘরের চাল ডাল এতোই ভাল লাগে? দরকার হয়, তরবদির দোকান থেকে নিয়ে আসতে পারে না?

জয়নদ্দির মা আবার বলে, "হাঁ রে কেনো, মোরা 'মোচোলমান' আর তরবদি কি? তার বাড়ীর খাবার বুঝিন্ 'গঙ্গাজল' দিয়ে ধুয়ে খাস্?"

কানাই বলেছে, "সে ঢের জানা। তার খেয়ে ই-পাড়াটা বাঁচিছে। তোরা

খাস্‌নি ? হরেনের বৌকে শাড়ী-বেলাউজ দিলে জয়নদ্দির চোখ টাটায় কেন আমরা বুঝিনি ? তার বৌ হিঁদুর মেয়ে হয়ে মোচনমানের বাড়ী এসে শুয়ে থাকে, ত্যাখন তো কেউ কিচ্চু বলেনে ?”

তরবদিকে সমস্তই খুলে বলে কানাই—“এই কথা শুনে তো চুপ। জয়নদ্দি বোধ হয় ঘুমুচ্ছ্যালো ত্যাখন। ওর বৌ বল্‌লে, ‘বেশ তো, সে মাগী না আসে না আসবে, আমরা তাকে আসতে বলি ? একলা থাকে বলে এসে থাকে আমার কাছে।”…

তরবদি শুনে শুধু বল্‌লে, “হু !”

পদী দোকানে আসে।

“দোকানী, সড়ু চাইল দেও তো !” কথা ক’টা একটু বেঁকিয়ে ভঙ্গি করেই বলে সে।

দোকানী হেসে বলে, “সড়ু চাইল ?”

তরবদি বলে, ‘হাঁ, আড়ো সড়ু !”

পদী রেগে ওঠে। গলার নতুন সোনার হারটা বুকের ওপরে বার করে’ দিয়ে কানের পারশি মাকড়ি দুটোতে দোলা দিয়ে বলে, “মোদেড় কথা অতো ধড়ো ক্যানো বলোদিনি ?”

তরবদি বলে, “ধড়ে সুখ পাই, তাই ধড়ি।”

‘ই-মিনষেড় শুধু ঠাট্টা !’ বলে পদী অদ্ভুত এক ভঙ্গি করে’ দাঁড়ায় উপুড়-করা ঝোঁড়াটার ওপরে একটা পা তুলে দোকানের মাচার-গায়ের-কাছে দেওয়ালে-ঠেস-দেওয়া-আধ-শোয়ানো-বাঁশটার-ওপরে হেলান দিয়ে। পদী মোহিনী জানে। তরবদি সব ভুলে গিয়ে ওর কুমারীসুলভ উদ্ধত বুকখানার দিকে তাকিয়ে থাকে। পদী মিট্‌মিট্ করে’ হাসে।

দোকানী চাল মেপে দিলে বুকের ওপরে মাত্র একপর্দা কাপড় রেখে আঁচলটা গলার ওপর দিয়ে বেড় দিয়ে নিয়ে চাল ধরে নেয়। টাকা ফেলে দিয়ে এক মুঠো চাল গালে পুরে চিবোতে চিবোতে কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে চলে যায় পদী।

তরবদি বলে, “হারামজাদী বজ্জাতের ধাড়ি একেবারে।”

কানাইও চলে যায় ওর পিছনে পিছনে বিড়ি টানতে টানতে কানের গর্তে একটা চকচকে আধুলি গুঁজে নিয়ে।

সিন্ধুর কথা মনে পড়ে তরবদির। অনেকক্ষণ ভাবে। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফ্যালে। উঠে পড়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে নদীর দিকে চলে যায়।

দীর্ঘ পাঁচদিন চলে যায়। নৌকো বন্ধ।

ছট্‌ফট্‌ করে তারিণী। স্ত্রীর সামনে চীৎকার করে' ফেটে পড়ে, "সমস্ত কারসাজি ওই খোকার। জয়নদ্দির কানে কামড়েচে যেয়ে ও-ই। সেদিনে তার বাড়ীতে মুরগি খেয়ে তাকে ঐ সব যুক্তি দিয়ে এয়েচে। ঘরশত্রুর বিভীষণ। জাত-জরমো আর কিচ্চু রইলোনি।"...

রোহিণী বলে, "তা বাবা ওদের মতটা মেনে নিলেই তো চুকে যায়।"

"চুকে যায়? তুই বল্‌চিস্‌? সংসারে খরচ নেই? চাষবাস নেই? জাল-নৌকো করতে খরচ লাগেনি? নৌকোর 'ট্যাক্সো' নেই? তোর বিয়ের খরচ নেই?"

"সব আছে বাবা, তবু ওদের পেটের দিকেও তো তোমাকে চাইতে হবে। সেটাও তো তোমার কাজ। দাদা যদি বলেও থাকে, তবে সে মিথ্যে বা অন্যায় বলেনি, সবাইয়ের সে ভাল চায়।"

"তার গুষ্টির মাথা চায়! সরে যা—সরে যা আমার সামনে থেকে। যেয়ে দাদার গুণমতী বোন হয়ে থাক্‌গে যা তার মতন বাগানবাড়ীতে। মুখ স্থাখাস্‌নি আমার সামনে। দেশ উদ্ধারে লেগেচে সব! ছোটলোকদের ভালাই করলে কলা হবে।"

মায়ের চোখ-ইসারায় রোহিণী সরে যায় বাপের সামনে থেকে। কারবালার ছুটিতে স্কুল বন্ধ আজ তার। বাগানবাড়ীর দিকে যাবার সময় হঠাৎ কে যেন ডাকে:

"ও দিদি, চিঠি।"—ফিরে তাকিয়ে দেখলে, পিয়ন-বুড়ো।

"কার চিঠি?"

"রতন বাবুর।"

নীল খামটা হাতে নিয়ে স্থাখে মুক্তোর মতো গোটা গোটা অক্ষরে দাদার

নাম ঠিকানা লেখা। বাঁ দিকের কোণায় লেখা, প্রদীপ আনোয়ার, কলকাতা থেকে। মাঝে মাঝে দাদা বলে বটে ওর কথা। ধনী লোকের ছেলে। এক সঙ্গে চার বছর এক কলেজে পড়েছে। দেশউন্নয়ন বাতিকের ছিট আছে মাথায় একটু। বর্ধমানের কোন পল্লীতে গিয়ে ছিল কতদিন। সেখানের লোকগুলো নাকি তাকে নানান কিছু সন্দেহ করে' শেষে সভা ডেকে গলায় মালা দিয়ে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে 'তায়গির' করে' তবে ছেড়েছে।

ইটের দেওয়াল আর এ্যাজবেস্টারের ছাউনী দেওয়া দু'কামরা ঘর—চারদিকে ঘেরা বারান্দা। সামনে শান-বাঁধানো একটা পুকুর। কতকগুলো দেশী বিদেশী ফুলের গাছ—এই হলো রতনের বাগানবাড়ী। নিরালা আশ্রয়। কাছে পিঠে কোনো বাড়ীঘর নেই। তিন দিকে বাগান—বাঁশঝাড় আর বন-জঙ্গল। শুধু দক্ষিণ দিকটা পুকুরের ওপারে অনেক দূর পর্যন্ত খোলামেলা—তারপর ধানচাষের জমি।

রোহিণী এসে ভাখে রতন কি একটা ইংরেজী নভেল পড়ায় গভীর মনোযোগ সঞ্চার করে' বসে আছে শানের ওপরের চাতালে আধ-শোয়া হয়ে অশোক ফুলের গাছটার নীচে। রোহিণীকে ভাখে একবার মাত্র চোখ তুলে আবার পড়ায় মন দেয়। রোহিণী চিঠিখানা ফেলে দেয় রতনের সামনে। রতন পড়া রেখে চিঠি খোলে :

প্রিয় বরেষু,

রতন, তোমার চিঠি পেতে আর সময় মতো উত্তর দিতে দেরী হওয়ায় আমি দুঃখিত। গিয়েছিলাম ক'দিনের জন্যে বাইরে—বিহার। এসে চিঠি পেয়েও সর্দিজ্বরে ভুগলাম বলে উত্তর দেতে দেরী হলো। তোমাদের গ্রামে ইস্কুল গড়ছো, বেশ তো, সে তো ভাল কথা। আমাকে সাহায্য করতে হবে বলেছ, কি বা কিসের সাহায্য করতে হবে জানাওনি। বলেছ যে, আমার মতো একজন উৎসাহী দেশপ্রেমিককে তোমার সাথে সঙ্গে থাকা চাই। অর্থাৎ আমি কি এই বুঝবো যে আমাকে রতনের গ্রামে গিয়ে থাকতে হবে আর তার ইস্কুল চালাতে হবে? যদি হয়, আমাকে কত্তো মাইনে দেবে হে? পঞ্চাশ-ষাট টাকা? সে তো আমাদের বাড়ীর একজন চাকরের মাইনে। থাকগে, যাবো আমি। ইস্কুলটা ততদিনে ঠিক করে' নাও। কবে যেতে

হবে লিখো। দু'জনে আবার একসঙ্গে থাকবো এই আশাটাই আমাকে পুলকিত করে' তুলেছে। ইতি—

রোহিণীও চিঠিতে চোখ বুলিয়ে নেয়, বলে, "ভদ্রলোক আমাদের এখানে থাকবেন নাকি ?"

"দেখি ইস্কুল আগে গড়ি, তারপর ও-পাগলাকে দিয়ে খানিকটা কাজ করিয়ে নেবো। গ্রামের উন্নতি, তাদের লেখাপড়া শেখানো, এসব নিয়ে ও বড় বেশী বকে, দেখুক না এসে গ্রামের লোকদের উপকার-উন্নতি করা কতো কঠিন ব্যাপার।" বললে রতন।

"বাবা কিন্তু খুব খেপেছে।" অন্যকথা পাড়ে রোহিণী।

রতন এড়িয়ে যায় ওর কথা। বলে, "তোর কাছে কিছু টাকা পয়সা আছে ?"

"কতো ? কেন ?" পাশে বসে রোহিণী বইটা ছাখে—দুর্বোধ্য। চিঠিটা ছাখে—সুন্দর হাতের লেখা। চমৎকার কাগজ।

রতন বলে, "পরেশ, হিমু, ইস্তাজ, প্রহ্লাদ ওরা সব কিছুক্ষণ আগে আমার এখানে এসেছিল লুকিয়ে। তুই আসবার কিছু আগে চলে গেল ঐ বাঁশ-বাড়িটার ভেতর দিয়ে। বাবা দেখলেই সর্বনাশ ! ওদের নাকি ভাত হচ্ছে না —ছেলেপুলেরা কান্নাকাটি করছে খিদেয়। বল্‌ছে আর হয়তো তারা 'কেন' বজায় রাখতে পারবে না।—তাই বল্‌ছিলাম কি.কিছু টাকা যদি ওদের…"

রোহিণী বিস্মিত হয়। তবু হেসে হেসে বলে, "এর নাম ঘরের খেয়ে বিলের মোষ তাড়ানো।"

"না। এর নাম নিজের চোখ উপড়ে অন্ধকে দান করে দু'জনেই কানা হওয়া।"

"দাতা হরিশচন্দ্রের কিন্তু শেষ অবস্থা ভাল নয়।"

"বাজে বকিস্‌নি, দিবি কিছু টাকা এনে ?"

"চুরি করে' ?"

রতন আর কিছু বলে না। গম্ভীর হয়ে যায়। পড়ায় মন দেয়। রোহিণী বোঝে রাগ হয়েছে দাদার। আর ঘাঁটায় না। বাড়ীতে চলে আসে। বাবা

নেই, মা ঘাটে গেছে। গাছ-সিন্দুকের চাবিটা নিয়ে তালা খোলে। দেখতে পেলে বল্‌বে, 'হারটা নিচ্ছি'। টাকা বার করে' নেয় রোহিণী। তাড়াতাড়ি তালা লাগিয়ে দিয়ে চাবিটা যথাস্থানে রেখে দেয়। তারপর হন্‌হন্‌ করে' চলে আসে বাগানবাড়ীতে—দাদার কাছে।

"এই নাও।" টাকাগুলো দাদার সামনে রাখে রোহিণী।

"কতো?"

"দুশো।"

"মা জানে?"

"না।"

"চুরি করেছিস্?"

"যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর!"

উঠে পড়ে রতন। হেসে পিঠে একটা চাপড় মারে রোহিণীর। তারপর চলে যায় দক্ষিণের পথটা ধরে। রোহিণী বাগানবাড়ীতে তালা বন্ধ করে' চলে যায় বাড়ীতে।

রতন এসে পৌঁছোয় একটা বস্তির মধ্যে। চালে চাল ঠেকে-থাকা চোঁঙখোলা আর উলুর ছাউনীওয়ালা ছোট ছোট ঝোবড়া কুঁড়েঘর। প্যাচপেচে কাদা চারদিকে। কালো কুৎসিত ন্যাংটো আধ-খাংড়া বড় বড় ছেলে মেয়েগুলো হুড়োহুড়ি করছে কাদা পানিতে। ছবিতে স্থাখা বেচুয়ানাল্যাণ্ডের জীবন-যাত্রার কয়েকটি দৃশ্যের কথা মনে পড়ে রতনের।—এক টুক্‌রো ছেঁড়া গামছার কানি পরা ঐ বারো তেরো বছরের মেয়েটার দিকে তো তাকানো যায় না। যৌবনের নতুন কুসুমকুঁড়িফোটা বুকে হাত বেঁধেছে বেচারী লজ্জায়!··· ওরা বন্য আর এই অর্থনৈতিক দুর্দশাগ্রস্ত জীবন নিয়ে আমরা সভ্য? নৈতিক জীবনই বা কি? কানে পৈতে লাগিয়ে মাথা গুঁজে যারা রাস্তার ধার নোংরা করতে বসে!···বিদ্যাসাগর না বিবেকানন্দ-রূপী 'গোরা' গ্রামের দুরবস্থা দেখে গিয়ে 'সুচরিতা'-সমস্যায় সেই যে শেষ হয়ে গেল আর তো ফিরে এলো না?···

একটা বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে ডাকে রতন, "পরেশ আছ নাকি, ও-পরেশ।"

কালো গাট্টা মতো লোকটা বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে বলে, "দাদাবাবু, কি খবর? রাজি হয়েচে?"

"না। তোমরা যারা নৌকো বাও আমাদের, সবাইকে ডাকোদিকিনি।"

"কেন দাদাবাবু?"

"দরকার আছে।"

পরেশ ডাকাডাকি করে' সকলকে এক জায়গায় করে কয়েক মিনিটের মধ্যেই। পায় না শুধু ছিধর আর আর করিমকে। পাড়ায় জাল ফেল্‌তে বেরিয়েছে নাকি তারা। পুরোনো ইলিশে চাটিম জালও নিয়ে গেছে খানকতক চাষীদের কাছে বেচবার জন্যে।

গুণে ছাখে রতন। বিয়াল্লিশজন লোক। সবাইকে চারটে করে' টাকা দেয়। ছিধর আর করিমের টাকা আটটা পরেশের হাতে দিয়ে দেয়। সকলে ওরা রতনের এই ব্যবহারে মুগ্ধ হয়। শ্রদ্ধা জানায়, জানায় অন্তরের উচ্ছ্বাসভরা ভালবাসা। দুদিন ধরে শুকিয়ে বা তাল-ছেনে-খেয়ে-থাকা রোগাপট্‌কা বাচ্ছাগুলোর নড়া ধরে টেনে এনে তাকে ছাখায় বাড়ীর মেয়েরা। মেয়েগুলোও কাঁদে, পরনের কাপড় চোপড়ের 'বাহার' ছাখায়, মাথার চুলের ছিরি ছাখায়, খিদেভরা পেট ছাখায় কাপড় তুলে। রতন ছেলেগুলোর দু'চারজনের মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। কি যেন বল্‌তে যায়। পারেনা। স্বর রুদ্ধ হয়ে যায়। জল এসে যায় বুঝি দুটো চোখে!···মানুষের কষ্ট দেখতে তার ভারি খারাপ লাগে।

বন্ধুদের কাছে শোনা গান্ধীজীর জীবনের কথা মনে পড়ে তার। একটি তেজী বাছুর গরু কোনো কারণে খোঁড়া হয়ে গিয়ে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যায়। গরুটি তাঁর সামনে দিয়ে অতি কষ্টে হাঁটতে থাক্‌লে তিনি তার সেই কষ্টে এতদূর বিচলিত হয়ে পড়েন যে তাকে গুলি করে' মেরে ফ্যাল্‌বার কথা বলেন।···জার্মান কবি গ্যেটেও তাঁর একজন দুর্বল খোঁড়া পুরোনো বন্ধুকে আসতে বারন করেছিলেন তাঁর সামনে তাকে কিছু দিয়েথুয়ে। তিনি সহ্য করতে পারতেন না তার সেই কষ্ট।

রতন ভাবে, তবু এমনি তো কতোই আছে আমাদের সারা দেশ জুড়ে। দুর্বল, দুঃস্থ, ক্ষুধার্ত, পীড়িত, উৎপীড়িত, নির্যাতিত—হাজার হাজার—লক্ষ

লক্ষ—কোটি কোটি। রক্তপুঁজঝরা বিরাট একটা পচা ঘায়ের মধ্যে সুখে বেঁচে আছে কয়েকটি ধনী-রূপী পোকা।…পোকাগুলো যত আণ্ডাবাচ্চা ছেড়ে বেশী হবে তাদের কামড়ে কামড়ে দেশের বুকের ঘা-টাও হবে তত গভীর, তত বিষাক্ত, তত বিশাল, গলিত-রক্তাক্ত। যদি কোনো কারণে সে ঘা শুকোতে থাকে তবে ধনীদের হাতে আছে বৈজ্ঞানিক-ব্যবস্থা।…

একজন বিখ্যাত লোকের কথা মনে পড়ে রতনের,…"ধনী মাত্রেই সুখী নয়, দরিদ্র মাত্রেই দুঃখী নয়।"…কিন্তু ধনী আর দরিদ্র এই শ্রেণীবিভাগ থাকবে কেন? তবে কি ধনী মেরে দরিদ্র করবে, না, দরিদ্র মেরে ধনী হবে? শূদ্রকে বাহ্মণ হতে হবে, না, ব্রাহ্মণকে শূদ্র হতে হবে? আসলে, শূদ্র আর ব্রাহ্মণ বলে কোনো পরিচয় না থাকাই ভাল। মানুষ, মানুষ। তাহলে কাজের পরিচয় থেকে লোককে ড্রাইভার, মাঝি, কলু, খালাসি, কেরানী, মন্ত্রী, লাট, বলা হবে না? হবে, তবে সেটা তাদের বংশ পরিচয় হবে না, যদি না তাদের বংশধররা সে কাজ করে।…

আর ঈশ্বর, ধর্ম? ওরা যতদিন আছে ব্রাহ্মণ-মোল্লা-পাদরী তো থাকবেই। কিন্তু নব মানবিকতা-বোধ যখন সবার মধ্যে জাগবে সেদিন?

ভাবতে ভাবতে রতন বাড়ীতে ঢুকে হঠাৎ শুনতে পেলে তার মা বলছে তার নিজস্ব ভাষায়, "বুড়ো হয়েচ যদি তবে বুড়োর মতন ঘরে বসে থাকো আর তামুক খাও। খোকার কাজ খোকাই দেখুক্। তার সংসার সে বুঝে নিক্। বলি, দু'দশ বছর পরে তো খোকার হাতে সব ছেড়ে দিয়ে বিদেয় হতে হবেই। নাকি, মাথায় আকন্দ ডাল পুঁতে অমর হয়ে বসে থাকবে?"

বাবা বলে, "দু'দশ বচ্ছর কেন, এক্ষুনিইতো বিদেয় করতে বসিচিস্ সকলে মিলে। তাই শালা বিদেয়ই হই, কার জন্যে আর! আমার আর কি! ছেলেমেয়ে লায়েক হয়েচে, তারা এখন আমার চেয়ে বেশী বোঝে, বুঝুক্! আজ থেকে যা ইচ্ছে হয় করুক্—কুনো কথা বলতে যাবো না, চোখ আছে দেখবো, কান আছে শুনবো—ব্যাস্! মাঝ থেকে শালা আমারই শুধু বদনাম! রোহিণী, যা বল্‌গে তোর দাদাকে, নৌকো-জালের মহাজনী বখরা সে যেমন খুশী দিক্‌গে। আমার কুনো দরকার নেই ভাখবার।" কথা শেষ করে' হুঁকোটা টানতে থাকে এক মনে কতক্ষণ মাথা গুঁজে। কোল্‌কের

আগুন যে নিভে গেছে—আর যে এতোটুকুও ধোঁয়া বার হচ্ছে না সে-খেয়ালই নেই এখন তারিণীর।

হেসে ফ্যালে রোহিণী। আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে বলে, "আগুন নিভে গ্যাছে বাবা!"

আত্মগত ভাবে বলে তারিণী, "যাবেই তো! বয়েসটা কি আর কম হলো।"

রোহিণী লজ্জা পেয়ে বলে, "কোল্‌কের আগুনের কথা বল্‌ছি বাবা!"

রোহিণীর মা সনকা বলে, "মিন্‌ষে যেন এক ঢং! বুড়ো হয়ে বুড়ো-ভাম হচ্চে।" কালো বেঁটে খাটো মেয়ে সনকা। চর্কির মতো ঘোরে সারাদিন নিজের কাজ কামের মধ্যে। কোল্‌কেটা খপ করে' এক ঝটকায় খুলে নিয়ে চলে যায় আগুনের জন্যে। যেতে যেতে রোহিণীর পড়ে-যাওয়া ব্লাউজ আর বুক-বাঁধাটা তুলে রাখে। কাঁটালের বিচি ক'টা কুড়িয়ে চালুনীতে করে' তুলে রোদ্দুরে দেয়। তারপর উনুন থেকে আগুন তুলে কোল্‌কেটা এনে নল্‌চে-খাড়া-করে'-বসে-থাকা তারিণীর হুঁকোটার মাথায় বসিয়ে দিয়ে বলে, "নও, টানো। 'ধোঁয়া' বার করো বল্‌বল্‌ করে' আর ভাবো! ভাবনার শেষ হয়নে যেন, তাহালে আর পরাণে বাঁচবে না!"

হুঁকোতে বার দুই টান মেরে নিয়ে বিরক্ত চোখে একবার স্ত্রীর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে নিয়ে বলে তারিণী, "হুঁম্!"

রতন এবার তারিণীর সামনে দিয়ে হেঁটে যায় আস্তে আস্তে মায়ের ঘরখানার দিকে। তারিণী প্রথমে কিছু বলে না। বিরক্তিতে শুধু একটু নড়ে চড়ে বসে। রতন ঘরে ঢুকে গেলে বলে, "পাবো খাবো, আমার আর কি! বয়েস হলে মানুষের মতিভোরম হয়—আমারও বলে সেই দশা! 'কাল' যে আস্‌চে তাকে ছেলেমানুষ বলে 'অগেরাজ্জি' করলে কি হবে, সেই কালই তোমাকে ঘাড়ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেবে—বুড়ো হয়ে গ্যাচ, 'গেট আউট'! শালা দু'পয়সা শুকটি মাছ বেচে যে মেয়েমানুষ সাতবার তাগাদা করতে যেতো লোকের বাড়ীতে সেও এখন বলে কিনা সামান্য দু'এক ট্যাকাড় বখড়াড় জন্যে অমন গোঁ ধচ্চো ক্যানো? এখন তোমাড় কিসেড় অভাব? ছেলেমেয়ে ল্যাকাপরা শিখেচে. তাদের মান আছে, তোমাড় মান আছে, নোকে ছি-ছি কড়বেনে?

দাঁরি মাঝিড়া তোমাড় ছেলেমেয়েড় মতন—তাদেড় এটু দেখতে হবেনে !'… লে শালা। বউ সুদ্ধু 'কম্ম-অনিষ্ট' হয়ে গ্যালো !"

সনকা রুখে দাঁড়ায় এবার হঠাৎ ওঘর থেকে এসে পড়ে, "কি হয়ে গ্যালো বল্‌লে ?"

তারিণী গম্ভীর হয়ে বলে, "কম্ম-অনিষ্ঠ।"

রোহিণী, "কি গা—কি বলে ? ইন্‌জিরি নাকি ?"

"হাঁ মা, শক্ত ইন্‌জিরি ! আমরাও বুঝতে পারি না !"

"হুঁ ! মিন্‌ষের ভীমরতি ধরেচে তামুক ধুনে ধুনে। মাথাটা গ্যাচে। নাহালে বউকে কখনো কেউ ইন্‌জিরিতে গাল দেয় ? আর এই ইলিশের মোরশোমে কেউ জাল-নৌকো ডাঙায় তুলে রাখে ? দুটো ট্যাকার জন্যে কতো ক্ষেতি সেকি বুঝতে পাচ্চে ? ঐ যে 'কেন্'—আমার নৌকো-জাল ডুবুনি—কি করিস্ কর—আঃ ! তাহালে আর তাদের ভাত হবেনে…ভগবানের বদলে তুমিই যেন ওদের বাঁচে রেখেচ।"

চরম কথা বলেছে সনকা। তারিণীর বিবেকটা খোঁচা খেয়ে যেন চাঙ্গা হয়ে ওঠে : 'তাহালে আর তাদের ভাত হবেনে—ভগবানের বদলে তুমিই যেন ওদের বাঁচিয়ে রেখেচ !'

ভগবানের বদলে ? কী সর্বনাশ। মহাপাপ ! মহাপাপ ! এমনি তো কত শত টাকা মেরে দিয়েছে ওদের !…মনে মনে ঘাট স্বীকার করে সে শ্রীমধুসূদনের নাম করে'। উঠে পড়ে। না, ওদের নৌকো চালাতে বলবে আজই। বেরুতে গেলে রোহিণী বাধা দিয়ে বলে, "এখন কোথা যাবে বাবা ?"

"ওদের নৌকো চালাতে বলে আসি মা।" শান্ত অবরুদ্ধ গলায় বলে যেন তারিণী।

রোহিণী বলে, "না বাবা, তোমার গিয়ে কাজ নেই। দাদাই বলে দেবে। তুমি গেলে ওরা হাসবে। বল্‌বে দম্ভ ভেঙে গ্যাছে। টাকার লোভ সাম্‌লাতে পারলে না আর।"

"ঠিক বলিচিস্ মা। হাঁ, তোর দাদাই যাক্। রতন—শোন্ বাবা, যা ওদের নৌকো চালাতে বলে আয়। ওদের দাবিই ঠিক। আমিও জানতুম ; তবুও লোভের মোহে পড়ে এতোদিন…কিন্তু তরবদি কি করবে ?"

শান্ত স্বরে বলে রতন, "তাকেও দিতে হবে বাবা।"

"যদি অন্যলোককে দিয়ে নৌকো চালায় ?"

"মারামারি খুনোখুনি হবে।" দৃঢ়স্বরে বলে রতন।

"জয়নদ্দিকে এই যুক্তি দিলে কে ?"

চুপ করে' থাকে রতন। বসে মাথা হেঁট করেই প্রশ্ন করে তারিণী। মাথা হেঁট করেই ভাবে। বোঝে, ছেলেরই কাজ। ভেতরে ভেতরে পরোপকারী ছেলের মন বুঝে খানিকটা শান্তিও পায় মনে।

বলে, "খোকা ওদের জন্যে তোর মনে যদি সত্যিই ভালবাসা থাকে তাহলে মানুষ হিসেবে তুই আমার থেকেও অনেক বড় হবি। আর তা যদি না থাকে, তবে বাবা, ভঁণ্ডামির মধ্যে পড়ে সংসারের ছাপোষাজীব আমার চেয়েও অনেক খারাপ হয়ে যাবি। মহাভারতের গল্প জানিস্ তো ? ন্যায় অন্যায়ের যুদ্ধ হলো। দুর্যোধনকে শিয়াল শকুনে ছিঁড়ে খেলে। যুধিষ্ঠির রাজা হলো, কিন্তু তার রইলো কি? অন্যায়ের পথে অনেক বাধা বাবা—অনেক কষ্ট। সে আমাদের মতন যাই-তাই লোকে সইতে পারে না। ধর্ম করতে হলে অনেক মনের বলের দরকার। তুই যদি ভাল হতে চাস্, আমার সাধ্যি কি তোকে বাধা দিই। তুই ছেলে, তোর জন্যে আমি কিনা করিচি ! তার কি-ই বা তুই জানিস্ ? তুই আজ যোগ্য হইচিস্ তাই বোঝাতে চাইচিস্ বাপের অন্যায়টা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে। তুই যে ভেতরে ভেতরে মানুষ হয়ে উঠিচিস্, তা আমি খেয়াল করিনি,—বি-এ পাশ কর আর যাই কর—তুই চিরকালই আমার সেই শিশু ছেলে ভেবিচি···আজ দেখচি ভুল সে ভাবনা. তুই আজ আমার বুড়ো বাপ হইচিস্ আর আমি হইচি তোর পদে-পদে-ভুল-করা সেই খোকা ? আমি পাপ করিচি বাবা, আমাকে তোরা ক্ষমা কর !" কাঁদতে থাকে তারিণী। সত্যিই কাঁদতে থাকে ! আশ্চর্য মানুষের মন।

"বাবা।"—আর্তনাদ করে' ওঠে যেন রতন।

তারিণী বলে, "হাঁ বাবা, আমি পাপ করিচি। সত্যিই আমি ভেবেছিলুম, আমি যদি না জাল-নৌকো দিই ওদের ভাত হবেনা। ভাবিনি যে ভগবান ওদের দেখবে। মনে অহংকার ছিল. আমিই যেন ওদের হর্তাকর্তা বিধাতা।"

কতকক্ষণ চুপচাপ কাটে।

তারিণী বলে, "সংসার আমি ছেড়ে দিলুম বাবা, আমাকে কোনো তীর্থে পাঠিয়ে দে। শ্রীমধুসূদনের পায়ের কাছে পড়ে থাকি গিয়ে।"

স্ত্রী চীৎকার করে' ওঠে তার, "মরণ! তীথ্যে যাচ্চে! বলি সংসারটা কি তীথ্য না? ছেলেমেয়ের বে' দেবে কে? আপিন গিলে এয়েচো বোধ হয় অম্বিক কয়ালের কাছ থিনে?"

কোনো কথা না বলে উঠে পড়ে এক দিকে চলে যায় তারিণী। মনটা তার হঠাৎ এমন উদাস হয়ে গেল কেন তা কে জানে।...গুরুদেবের চরণ স্মরণ করে। পাপ—পাপ—পাপ থেকে, অন্যায় থেকে বাঁচাও প্রভু! নিজের সন্তানদের সামনে সে আজ হীন প্রতিপন্ন হয়ে গেল।...

আস্তে আস্তে রতনও চলে আসে বাগানবাড়ীতে। টেবিলে মাথা গুঁজে চুপ করে' ভাবতে থাকে বাবার কথাগুলো। সত্যি কি তার প্রাণে ভালবাসা আছে ওদের জন্যে? নাকি ভণ্ডামি? না, বইপড়া রাজনীতির নেশা? বার্ণার্ড শ না কার যেন কথাটা মনে পড়ে যায়, 'রাজনীতি হলো বদমাইসদের শেষ আশ্রয়।' তার মানে কি এই যে রাজনীতি করতে গেলে পার্টির স্বার্থের খাতিরে সত্য-ন্যায়-বুদ্ধি-বিবেক সব বিসর্জন দিতে হবে? কিন্তু তা কেন? যা দেখেছেন তাই হয়তো তিনি বলেছেন। ওদেশে তাই ঘটেছেও। কিন্তু এমন রাজনীতি যদি জন্মায় যার কোলে মানুষ শান্তিতে বাঁচতে পারে—বাড়তে পারে মহীরুহের মতো নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিত্বকে বাঁচিয়ে? ন্যায় নীতি সত্য সুন্দরকে বাদ দিলে মানুষ আর পশুতে কোনো ভেদ থাকে না। তবে আজ কাল বদ্‌লেছে, কাকে ন্যায়নীতি বা সত্যসুন্দর বলবে তা নিয়ে অনেক তর্ক আছে। তর্ক? তবে শান্তি কোথা? দলে গেলেই তো দলাদলি করতে হবে। আর যৌথ-উন্নতি চাইতে গেলেও দল না পাকিয়ে উপায় কি? কিসে মানুষের সুখ হয়, কল্যাণ হয়?...অনেক দেখতে হবে, পড়তে হবে তাকে।

"রতন বাবু!"—হঠাৎ কার যেন ডাকে অন্যমনস্কতা ভেঙে যায় রতনের।

"কে"—সাড়া দিয়ে তখনি বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। একটা বছর আঠারো বয়সের ছেলে। গায়ের কষাটে তেলকালো রঙ, দেখলেই বুঝতে পারা যায় ও জেলে।

রতন বলে কি হয়েচে, কাকে ডাকছো ?"

"তোমাকে বাবু। গাঁঙের চড়ায় মারামারি হয়েচে। তোমাকে খবরটা জানাতে পাঠালে জয়নদ্দি-ভাই। তরবদি মাঝি তিন চারটে নৌকোর লোক জোগাড় করে' নৌকো চালাতে যাচ্ছ্যালো, মোরা বাধা দিইচি। পয়রদ্দির মাথা ফেটে গ্যাচে। ওরা সব 'পাইলেচে'। তরবদির সেকি দৌড়!"—ছেলেটা হো হো করে' হাসতে থাকে।

রতন বলে, "তোমার নাম কি ?"

"ইউনুস।"

"আচ্ছা যাও। আমাদের সব নৌকো চলবে আজ। বাবা হুকুম দিয়েছেন। ওদের দাবি মেনে দিয়েছেন।—পয়রদ্দির মাথা খুব জখম হয়েছে নাকি ?"

"না, লাঠির ঘায়ে কেটে গ্যাচে খানিকটা। তবু কি রোখ্! বাপরে! যেন বাঘের বাচ্চা! যারা নৌকো চালাতে এয়েছ্যালো বাপ-বাপ করে' 'পাইলে' গ্যাচে। আর কাউকে নৌকো গছাতে পারবেনে তরবদি। শুনতিচি সে নাকি মোদের নামে 'কেশ' করবে!"

রতন বলে, "করুক না। ভয় কিসের? নৌকো চুরির কেশ তো? কে না জানে ওরাই নৌকোর মাঝিদাঁড়ি ছিল? প্রমাণের অভাব হবে? ওরাই আরো কেশ করতে পারে ওদের পাওনা বখরা চুরির। আচ্ছা, তুমি যাও; যাবার সময় পরেশদের খবর দিয়ে যাবে যে রতন বাবু তোমাদের এক্ষুনি ডেকে পাঠালে।"

ইউনুস চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই এলো পরেশরা।

রতন বললে, "যাও তোমরা নৌকো চালাও-গে সকলে। বাবা তোমাদের দাবি মেনে নিয়েছেন।"

"নিয়েচে!"—উল্লাসে প্রায় চীৎকার করে' ওঠে পরেশরা। চলে যায় তারা হৈ-হল্লা করতে করতে। জোয়ার উঠেছে তখন। এক্ষুনি জালে যাবে।

রতন ভাবলে একবার ডেকে বলে দেয়, এবার থেকে তার সঙ্গে ওদের সম্পর্ক, তার বাবার সঙ্গে নয়। কিন্তু আবার ভাবলে, তাহলে ওরা অনেক ফাঁকি দেবে। একটু কড়া থাকা ভালো। চুরি করা তো ওদের অভ্যাস হয়ে আছে, সামান্ত

এতোটুকু ভালবাসার বদলে তা কি হঠাৎ যায় ? তবে শাসনের চাইতে ভালবাসার জোর বেশী। ততখানি ভালবাসা সে কি বাসতে পারবে, না, ওরা সহ্য করবে তা ?

রোহিণী আসতে তাকে বললে রতন, "বাবা বারেক অন্যলোক দিয়ে নৌকো চালাতে চেষ্টা করেনি !"

"কেন কি হয়েছে ?"

"তরবদি নৌকো চালাতে চেষ্টা করেছিল, মারামারি খুনোখুনি হয়েছে ! তরবদিও নদীর ধার থেকে মারের ভয়ে দৌড় মেরেছে। পয়রবদ্দি বলে ওদের একজন মাঝির মাথা ফেটে গেছে।"

"ইস ! মাগো মা !"

"আমাদের নৌকো চালাতে হুকুম দিয়ে দিয়েছি।" বলে রতন।

"বাবা কিন্তু খুব ভাল লোক !" শ্রদ্ধা গদগদ স্বরে বলে রোহিণী।

রতন বলে, "একটু চা করদিকিনি. খাওয়া যাক।"

মেঘে ঝুলে এসেছিল আকাশটা। এবার বৃষ্টি এলো ঝমঝমিয়ে। রোহিণী উঠে স্টোভ ধরিয়ে কেট্‌লি করে' পানি এনে বসিয়ে দিলে। তারপর উদাস চোখে তাকিয়ে রইলো ঝাপ্‌টায় দোল-খাওয়া বাঁশের বনটার দিকে তাকিয়ে।

রতন ওর দিকে মন দিয়ে খানিকটা তাকালে। মনে হলো, ও সাথীহারা। ওর এবার সাথী হওয়া দরকার। পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে ও। বললে, "রোহিণী, তোকে এই নীল শাড়ীটায় বেশ মানায় রে !"

খুশী মনে শুধু একটু হাসলে রোহিণী। পরে বললে, "দাদা একটা আবৃত্তি করো, সেই কবিতাটা, 'হৃদয় আমার নাচেরে'...।"

রতন আবৃত্তি আরম্ভ করলে। ওর মুখস্থই ছিল। শুনতে শুনতে রোহিণীর বুকের ভেতরটায় কেমন যেন এক অব্যক্ত আনন্দের ময়ূর শত বরনের কলাপ মেলে নাচতে আরম্ভ করে।

সেই গান আর নাচ শুরু হয়েছে প্রকৃতির মধ্যেও। ওরা দু'জনে ডুবে যায় তার ভিতরে। অদূরের ঝাউবনটা অদ্ভুত অব্যক্ত এক রহস্যের মতো ক্ষ্যাপা ঝাপ্‌টায় দুলে দুলে শন্‌শনিয়ে যেন কোন মহাকাব্যের শেষ বিরহ-বিচ্ছেদের ব্যাপক গভীর খেদের কান্নায় ভরিয়ে ভাসিয়ে দিতে থাকে

আকাশ আর পৃথিবী। নির্বাক, নিঃস্পন্দ, তন্ময় হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে রতন। অনির্বচনীয় এক ভাবের বিহ্বলতায় সে হারিয়ে গেছে তখন সমস্ত চেতনা লুপ্ত হয়ে যেন।

॥ ১১ ॥

জয়নদ্দির চক্রান্তের কাছে হার মানলে শেষে তারিণী? ভাবে তরবদি। আজ দুদিন নৌকো চলছে তার। মাছগুলো ছেঁকে তুলে নেবে ওরাই? লোকগুলো কি বদমাঁইস! ভাত হয়নি, তাল ছেনে, ফেন চেয়ে, খুদচচ্চড়ি করে' আর কন্ট্রোলের মিনি পয়সার তেঁতুলবিচির গুঁড়ো মেশানো গুমো আটার রুটি খেয়ে হাড়ির হালে দিন কাটাচ্ছে, তবু ঘাড় হেঁট করে' আসছে কৈ তার কাছে? আরো কদ্দিন দেখতে পারে সে? বাবাকেলে নৌকো যেন, বাপরে, কি জোর! বলে, 'আমরা তো নৌকো চালাতে বে-রাজি নয়, আমাদের সঙ্গে গণ্ডগোল দামকড়ির। অন্যলোককে যেতি নৌকায় বসাও আমাদেরও জান কবুল!'...মুখখিস্তি করতে তেড়ে এলো সকলে মিলে লাঠি সোটা হাঁকিয়ে। দাঙ্গা বাধালে হবে কি, জয়নদ্দি লেঠেল একাই পঞ্চাশ জনের 'মওড়া' নেবে ওদের হয়ে। তার নিজের গাঁও্চড়ার জমি জবর-দখলের সময় তরবদি তো নিজের চোখেই দেখেছে জয়নদ্দির বীরত্ব! পাঁচ ছ'টা লোক নিয়ে লাঠির পাঁয়তারা কষে' মেরে সুঁটিয়ে বিপক্ষ দলের সকলকে দৌড় করিয়ে তার জমির দখল সাব্যস্ত করিয়ে দিলে!...সেই জয়নদ্দি আছে ওদের পিছনে, দরকার হলেই সামনে আসবে।...

কি বলে মামলা ঠুকবে ওদের নামে? অনেক টাকার খেলা। তাছাড়া ওদের প্রমাণ বেশী, দলেও ভারী ওরা। 'কেশ' করে' এলে ওরা নাকি বখরা চুরির উল্টো 'কেঁশ' চাপাবে।...যাকগে, হুকুমই দেবে আজ থেকে। কে কতো মাছ পায় ওরা, কানাইকে হিসেব নিতে বলে রাখতে হবে। নইলে— রাগারাগি হয়ে গেছে—চুরি করবে জোট বেধে। নিজেও সে গাঁওধারে যেতে পারে না সব সময়—অনেক কাজ এখানে। পাট, নারকেল, কলা, বাঁশ, উলু-কেশে, ধান-খড়, শুকুটি এসব কিনতে পাইকের আসে। তাছাড়া আছে

জমিজমা বা সোনাদানা বন্ধকের ব্যাপার।—হঠাৎ ত্বাখে জালে যাচ্ছে জয়নদ্দিরা। ডাকে তরবদি, "জয়নদ্দি নাকি ? শুনে যাতো একবার ই-দিকে।"

যায় জয়নদ্দি। বলে, "সালাম চাচা, কিচ্চু বলবে মোকে ?"

"একলা জাল টানবার খুব ফন্দি বার করে' ক'দিন বেশ কিছু টাকা কামালি কি বল ?"

জয়নদ্দি বিড়িটাতে অনেকখন ধরে দম্ মারে আর ধোঁয়া ছাড়ে। ঘন ঘন। সেইটাই যেন তার একমাত্র জরুরী কাজ তখন। কথার উত্তর দেবার দরকার নেই ওর। বকে যাক দেদার।

তাই জয়নদ্দি বলে, "বিরলাপুরের দশরথের বিড়িটা ভাল! খাও চাচা একটা। লতুন 'টেস্' পাবে।"

কাশেম হাসে ফিক্ ফিক্ করে'। বিরক্ত মেজাজে জয়নদ্দির দিকে তাকায় তরবদি।

বলে, "তুই হলি ওদের লাটের গুরু—পালের গোদা। কেন তুই ওদের ঐ হিসেব দিতে গেলি ?"

"আল্লার কিরে চাচা, মোর মাথায় কি উ-সব বুদ্ধি খেলে! তোমাদের চুরি ধরা পড়েচে তারিণী দাদার ছেলে রতন বাবাজীর কাছে।"

তরবদি একটু অবাক হয়। ভাবে কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলে, "তারিণী দাদা' আবার 'রতন বাবাজী' !! ভাল ভাল! হিঁদুদের তুই থুথু-চাটা হয়ে যাচ্চিস্ যে রে! মোচোনমানের জাতে জন্মিচিস্ ইমানটা ঠিক রাখ। কাফেরদের 'দাদা' 'বাবাজী' বলবিনিতো বলবি কাকে ?"

"কাফের কাকে বলে চাচা ?" রাগ চেপেই শুধোয় জয়নদ্দি।

"ওই সব বেদ্বীন, শেরেক করে যারা খোদার। ওদের জাতের ঠিক আছে, না, ধর্মের ঠিক আছে ? ওদের যুক্তিতে লাচলে আখের পরকাল সব খোয়াবি।"

জয়নদ্দি বলে, 'চাচা দেখচি 'মৌলু' সায়েবদের চেয়েও ভাল 'বয়ান' শোনাতে পারো! বিষয় আশয় এই সব গরীবদের দান করে' দিয়ে মুসলমানদের ইমান বাঁচাবার জন্তে এবারে মৌলু সায়েব হয়ে কাফের মারতে বেরুলেও তো চাচার অনেক 'নেকি' (পুণ্য) হয়—আখের পরকাল রক্ষে হয়। দাঁড়ি মাঝিদের সামান্ত এক আধ বখরা মাছের টাকা চুরি করে' লাভ কি ?

স্তাখো চাচা, তারিণী-দা আর রতনের মতো লোক যেতি 'কাফের' হয়, তাহালে তুমি কি ?''

"কি আমি ? কি ? বল্‌তে হবে তোকে।"—তেড়ে মেড়ে ওঠে তরবদি।

ভয় পায় না জয়নদ্দি। বলে, "না চাচা, শুনে কাজ নেই। 'মেজাত' ঠিক রাখতে পারবেনে। সে ভারি খারাপ কথা। শুনলে 'মানহানি'র কেশ করতে ছুটবে তুমি আমার নামে এক্ষুনি।''

"কি আমি মামলাবাজ ?"

"মুই কি সেকথা বল্‌নু চাচা !"

অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে কাশেম।

জয়নদ্দি তাড়া দেয়, "থাম শালা ! চাচার সামনে থেকে সরে যেয়ে প্যাট ভরে হাসিস্ ! চাচার রাগ খারাপ ! মেরে 'হেলুয়া টাইট্' করে' দেবে ! তা রাগারাগির কথা লয় চাচা, হিসেবটা মোদের চেয়ে তুমিই ভাল বোঝ। মোরা নাহালে বেইমান পাপী অধর্মী—তুমি তো নামাজ পড়ো, রোজা করো, মৌলুদ দাও—খাঁটি মুসলমান, 'নেককার' লোক। তবে মাছের টাকা চুরি করো, পরের মেয়ে-বৌয়ের দিকে কুলজর ফ্যালো কেন ? 'নেকি' করো আর তার সঙ্গে 'বদি'ও করো ? আল্লার আর 'শ্যায়তানে'র—দু'জনেরই সেবা করো ?"

"কি বল্‌লি শালা হারামি ! যেত বড়ো মুখ লয় তেত বড়ো কথা ! চড়িয়ে গাল তোমার"—

"খবরদার চাচা !" তরবদির হাতটা ধরে ফ্যালে কাশেম খপ্ করে'। কেউ কোথাও নেই দেখে হাতে একটা মোচড় দিয়ে ছেড়ে দিয়ে বলে, "কর কি ! কর কি ! চাচা ভাই-পো'তে মারামারি ! লোকে কি বল্‌বে ? ছি ছি— তৌবা তৌবা।"

"বাবারে, শালা মেরে ফেল্‌লে—মোর হাতটা মুচড়ে দিয়েচে !...দাঁড়া-দিনি শালারা, লগড় স্তাখাচ্চি তোদের—সড়কিটা আনি একবার।"... তরবদি পড়ি তো মরি করে' বাড়ীর ভেতরে সড়কির জন্যে ছুটলে ওরা হৈ হৈ করে' ওঠে "চাচা পালালো ! চাচা পালালো !" বলে নিজেরাই পালিয়ে আসে।

হেসে খুন হয় তিনজনে বাইরে এসে। হাসি থামলে হরেক-ভয়ে ভয়ে বলে, "কাজটা ভাল হয়নে কাশেম! উ-শালা এক্ষুনি থানায় ছুটবে। থানার দারোগা ওর হাতে।"

জয়নদ্দি বলে, "কাপড় খারাপ করলি নাকি?" আবার হাসিতে ফেটে পড়ে। তারপর বলে, "সাক্ষী হবে কুন্ শালা? রাখবো তাহালে তাকে?"

কাশেম বলে, "না বাবা, ওর বাড়ীর সামনে দিয়ে আর যাওয়া হবেনে। কোথা শালা প্যাটে সড়কি ঝেড়ে দিয়ে বসে থাকবে!"

জয়নদ্দি বলে, "হাঁ। তারিণীদাদার উ-দিক্ দিয়ে ঘুরে যাবো। উ-শালার গুণে ঘাট নেই।"

ওদিকে তরবদি সড়কি আনতে বাড়ীতে ছুটলে তার বৌ তাকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে আর চ্যাঁচায়, "ওগো তোমার পায়ে পড়ি, ওদের সামনে তুমি যেওনি। ওদের সঙ্গে তুমি পারবেনে। জয়নদ্দি তোমাকে আছড়ে মেরে ফেল্‌বে! ওর গায়ে হাতীর মতন জোর! যেওনি, তোমার পায়ে ধরি—তোমাকে জোড়হাত করি।"

"ছাড় শালী, ছেড়ে দে! দেখি একবার শালাদের। বড্ড বাড় বেড়েচে।..."

কুলসম বলে, "বাড়ুক। আল্লা ওদের ফেল্‌বে। তুমি মেজাত ঠেণ্ডা করো। ছোটলোকদের সঙ্গে লেগোনি। সবাই তোমার ওপরে রাগ্র। কুন্‌দিন জানটা খোয়াবে অমনি করে'?"

শান্ত হয়ে যায় তরবদি। ছেড়ে দিলে বসে পড়ে হাঁপাতে থাকে। বিশ্রী মুখখিস্তি করে।..."শালাদের ইমান নেই, বেইমান, হারামজাদারা নেমক-হারামি করে' দোজখে যাবে।"...

অনেকক্ষণ পরে মেজাজ আরো শান্ত হয়ে গেলে নিজেই উঠে যায় নদীর দিকে। পয়রদ্দিদের ডেকে নদীতে নৌকো নামাতে বলে জাল এনে।

ওরা সকলে আনন্দে হৈ মেরে ওঠে 'ইয়া আলী' বলে। জালের জন্যে ছোটে সকলে। একটু পরেই জোয়ার লাগবে। লাল পানি ছুটেছে পাক্ খেয়ে খেয়ে।

মাঝ গাঁঙে জাল ফেলে মহা ফুর্তিতে গান ধরেছে জয়নদ্দি:

'মলে পাবো বেহেস্ত খানা
তা শুনে আর মন মানে না
বাকীর লোভে আসল পাওনা
কে ছেড়েছে এই ভুবনে ॥'

লালন ফকিরের গান। শিখেছিল সে নবীন বাউলের আখড়ায় তার কাছে গাঁজা খেতে গিয়ে। তার মনের মানুষ খুঁজতে নবীন বাউলটা যে কোথায় চলে গেল কে জানে! থাকলে অনেক গান শেখা হতো জয়নদ্দির। দেহতত্ত্বের ভারি মজার মজার গান!…

তারপর ভাবে, বখরার আন্দোলনটা তাহলে মেনে নিলে ওরা? কিন্তু তাতেই বা এমন কি এগোবে এই হাঘরে হাভেতে জেলেদের? ওদের সকলের জাল-নৌকো নাহলে বাঁচার কষ্ট কোনোদিনই ঘুচবে না। কার অতো দয়া আছে—কে করবে তা? কিন্তু নেই-মামার চাইতে কানা-মামা ভাল। নুন কিন্‌বার দুটো পয়সাও গরীবের মা বাপ।…ওরা সবাই এসে আবার জাল ফেল্‌ছে। জয়নদ্দিকে দেখে খুশী হয়ে হাসছে। সবাই বন্ধুর মতো আপন করে' নিতে চায় যেন তাকে।

ওদের এই শ্রদ্ধায় প্রাণ থেকে ধীরে ধীরে যেন ভয় মুছে যায় জয়নদ্দির। মনটা বড় হতে চায়।

॥ ১২ ॥

আশ্বিন মাস। মেঘবর্ণের ধানগাছের বুক ফেড়ে থোড় ফেটে শীষ আসছে।

নদীতে মাছ পড়াও বন্ধ হয়ে আসছে ক্রমে ক্রমে। সারাদিনে দুটো একটা পড়ে কি না পড়ে। মাঝিরা জাল সারতে বসে গেছে অবরে-সবরে। জয়নদ্দি টেনে টেনে সাপ খেলানো সুরে 'হাতেমতাই'-এর পুঁথি পড়ে প্রতি রাত্রে আর পাড়ার মেয়েপুরুষেরা এসে ভীড় করে' বসে জাল বুন্‌তে বুন্‌তে বুঁদ্ হয়ে শোনে তা।

এমনি দিনে একদিন রতন সবাইকে ডাক দিয়ে শিক্ষামন্ত্রীকে এনে একটা মিটিংয়ের ব্যবস্থা করলে স্কুলের জন্যে। ভাল করে' সাজালে সভাটা। রেকর্ডের গান বাজালে পাড়া মাৎ করে'। শিক্ষামন্ত্রী এসে গরম গরম বক্তৃতা

দিলেন। রতনও বেশ জোরালো ভাষার বক্তৃতায় সবাইকে চাঙ্গা করে' তুল্‌লে। তারপর চাঁদা সংগ্রহের পালা। প্রথমেই জয়নদ্দি উঠে পড়ে বল্‌লে, "আমি দোব নগদ পঁচিশ টাকা।" সবাই তার দিকে তাকালে। সে সবার মধ্যে দিয়ে গিয়ে টাকা ক'টা দিয়ে এলো মন্ত্রী মশায়ের হাতে। তিনি দিলেন রতনকে। সবাই হাততালি দিলে।

তারিণী বল্‌লে, "আমি দিচ্চি দু'শো টাকা। আর ইস্কুল বসবার তিন বিঘে জমি।"

চেঁচিয়ে উঠলো জয়নদ্দি, "তারিণী দাদার জয়!"

সকলে হাততালি দিলে অনেকখন ধরে।

টাকা বার করে' দিলে তারিণী। এক শো টাকার দু'খানা নোট। রোহিণী গিয়ে দিয়ে এলো মন্ত্রী মশায়ের হাতে। তিনি হাসলেন।

তরবদি ঈর্ষায় জ্বলে গিয়ে বলে, "আমি—আমি দোব তিন'শো!"

জয়নদ্দি আবার চেঁচালে, "তরবদি চাচার জয়!"

সবাই হাততালি দিলে। তরবদি খুশী হলো।

কিন্তু টাকা দেয় কই তরবদি? তার কাছে টাকার জন্যে গেলে বলে, "এখন তো আনিনি, পরে দোব।"

কে একজন বলে উঠলো, "লুয়ো!"

সকলে হেসে উঠলো।

লজ্জায় পড়ে তরবদি উঠে গেল। বলে গেল, "আন্‌চি আমি এক্ষুনি টাকা। আমার নামে জমা লেখো।"

তারপর দু'টাকা এক টাকা আট আনা চাঁদা উঠতে লাগলো। সবাই দিলে। যে মেয়েটা ভিখ্ মেগে খায়—থুথ্‌থুরে বুড়ী—পুণ্যি বেওয়া দিলে চার আনা!··· আনন্দে উল্লাসে ফেটে পড়লো সবাই।

তারিণী বললে, "এর দানই সবার চেয়ে বড়!"

জয়নদ্দিকে চোখ ইসারায় হাত নেড়ে কাছে ডাকলে পদী, সে টাকা দেবে। গেল জয়নদ্দি, বললে, "টাকা দেবে? কতো?"

"তুমি কতো দিয়েচ?"

"পঁচিশ,—এক কুড়ি পাঁচ।"

"আমি দোব এক কুড়ি—দশ !"—বলে পদ্দী টাকা বার করে' দেয় নাই-কোঁচড়ের গিট্ খুলে। চেঁচিয়ে ঘোষণা করে' দেয় জয়নদ্দি। বলে, 'যাও—যাও তুমি নিজে দিয়ে এসো।"

পদ্দীর চলার দিকে সবাই তাকিয়ে থাকে যেন কেমন চোখে। রোহিণীর শুধু বিশ্রী লাগে। মুখ ঘুরিয়ে নেয় অন্যদিকে।

তরবদি এসে তিন শো টাকা ফেলে দিলে।

তারিণী বললে, "জীবনের মধ্যে লোকটা এই একটা ভাল কাজ করলে ! আমার ওপরেও টেক্কা মারতে চায়।"

সর্বশেষে বিরলা জুট মিলের ম্যানেজার হনুমান প্রসাদ দিলেন এক শো এক টাকা ; আর বাৎসরিক সাড়ে সাত টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন—যতদিন স্কুল থাকবে।

রতনের হাতে সমস্ত টাকা রইলো। যা করতে হয় সেই সব করবে। সে হলো সেক্রেটারি, তরবদি হলো প্রেসিডেন্ট। আর জয়নদ্দি হলো একজন অন্যতম সভ্য। তারিণী বললে, "আমার ছেলে যখন আছে তখন আমারও ঐ থাকা সই।"

রতন বললে, "কাল থেকেই তাহলে স্কুল-বাড়ী তৈরির কাজ আরম্ভ হোক ?"

তরবদি বললে, "তারিণী জায়গা দিয়েচে, আমি ইট দিচ্চি যা লাগে।"

"দেবেন, আপনি ইট দেবেন ; বাঃ ! তাহলে তো হয়েই গেল। আজকেই তো অনেকগুলো টাকা উঠে গেল।"—বললে রতন।

অতিথিদের বিদায় করিয়ে দিয়ে আরো কিছুক্ষণ আলোচনা করলে স্কুল সম্বন্ধে। কোন্ দুয়ারী, কতো লম্বা-চওড়া হবে, কতো টালি-খোলা লাগবে, কিসের কাঠামো করা হবে, চেয়ার বেঞ্চি টেবিলের জন্যে গাছ চেরাই, মিস্ত্রি খরচ কতো লাগবে।...

তারিণী বললে, "অনেক টাকার খেলা বাবা, আচ্ছা হোক্ এখন এই টাকা খরচ করে'—তারপর তরবদি-ভাই আর আমি তো আছিই।"

তরবদি হেসে খুশী হয়ে বলে, "সে তো বটেই।"

রতন বললে, "সরকার থেকেও কিছু টাকা সাহায্য পাওয়া যাবে কথা দিয়ে গ্যাছেন মন্ত্রী মশায়।"

স্কুলের নাম কি হবে তা নিয়েও কথা হলো কিছুক্ষণ। ঠিক হলো না কিছুই। তবে তরবদি বললে, "সে ভার রইলো রতনের ওপর।"

জয়নদ্দি বললে, "মুই একটা কথা বলি। হেড মাস্টার চাই মোদের একজন অনেক লেখাপড়া জানা মুসলমান লোক। কেননা, মোদের মুসলমান ছেলেদের সংখ্যা বেশী হবে।"

তরবদি হাসতে থাকে। কাজের কথা বলেছে যেন একটা জয়নদ্দি।

রতন বলে, "আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। ও একজন হলেই হলো। হিন্দু আর মুসলমান। শিক্ষা বা জ্ঞানের কোনো জাত নেই।"

সভা ভঙ্গ হলো। সবাই চলে গেল।

বাবার হাতে টাকাগুলো দিয়ে রতন বেড়াতে গেল নদীর দিকে।

অনেক রাত পর্যন্ত একাই চরের ওপরের সবুজ ঘাসে বসে থাকবে সে নদীর দিকে তাকিয়ে। আকাশ তারা মেঘ আলো অন্ধকার পানি ঢেউ গাছপালা জীবজন্তু সমস্ত মিশিয়ে যে জীবন্ত ছবি অনির্বচনীয় রহস্যে রয়েছে পরিব্যাপ্ত তার মধ্যে ডুবে যাবে সে—ফিরতে রাত হবে তার অনেক।

॥ ১৩ ॥

কার্তিকের শেষের দিক। একটু একটু শীত পড়তে সুরু করেছে। 'কলমকাটি' আর 'কার্তিকে রাঙি' ধানে রঙ্ ধরেছে। কুয়াশা পড়ছে অল্প অল্প। জয়নদ্দি খেসারি কলাই ছড়াতে গিয়ে দেখলে জমিতে এখনো আধহাঁটু পানি। ধানের শীষ যা বেরিয়েছে—ভাখবার মতন। ভাদ্রের দারুণ গরমে কিছু কিছু 'রোষ্‌ণা' ফুটেছিল বলে এক আধ জায়গায় 'মড়্‌কা' বেধেছে। ওখানে আর ধান হবে না। অতো করে' হুড়ে নিড়িয়ে দিলে তবু মড়কা

বাধলো ডহর জমিতেও। তবে পাশের জমিগুলোর চাইতে অনেক ভাল ফলেছে তার 'আঙুর শাল' ধান। তবুও এখন অনেক বাকি, ঝড় ঝাপ্টা আছে, প্রকৃতির কি খেয়াল হয় কে বলতে পারে? জয়নদ্দি ভাবে, সবই আল্লার হাত!...

শুকটি ধরতে জালে যাবে তারা। সময় হয়ে গেছে। আজ যাই কাল যাই করে' দেরী হয়ে যাচ্ছে দেখে সামনের শুক্রবারে অর্থাৎ পরশুদিনেই দিন ঠিক করে' ফ্যালে জয়নদ্দি। কাশেম আর হরেনও যাবে তার সঙ্গে। দু'খানা বেঁংতি জাল নেবে সঙ্গে। একটা নিজের তৈরি আর একখানা ভাড়ার। এ-জালের ঝোলা থলির ভেতরে যে বাছাধন মুখ গলিয়েছে তাকে আর বেরুতে হচ্ছে না।

রতনের সঙ্গে স্থাখা করতে গেল জয়নদ্দি। যাবার সময় দেখে গেল স্কুল ঘরের কাঠামো শেষ করে' খোলা তোলা হচ্ছে। মেঝে দুরমুশ করছে ক'জন লোক। দেড় ইটের গাঁথুনি দেওয়া হয়েছে দেওয়ালে। ব্যাস্—এবার তো হয়েই গেল। শুধু কাঠের কাজ এবার। আর নাহয় এক মাস লাগুক। তারিণী তার বাগানের বড় বড় ক'টা বকুল আর নিম গাছ দিয়েছে। চেরাই হচ্ছে। শুধু মিস্ত্রি দিয়ে কাঠগুলো গেঁথে নেওয়া। তারপর হু হু করে' স্কুল চলবে। সারাদিন কল্‌বল্ করবে ছেলেমেয়েরা। তার ছেলেটাও আসবে এই স্কুলে।...

রতন বাড়ীতে আছে শুনে গেল সেখানে।

বৈঠকখানায় উঠে দেখলে জনকুড়ি পঁচিশ ছেলেমেয়ে নিয়ে স্কুল বসিয়েছে রোহিণী। একটা ছড়ি হাতে নিয়ে খবরদারী করে' বেড়াচ্ছে ছেলেদের কাছে। কার লেখা দেখছে, কারো বা পড়া বলে দিচ্ছে। জয়নদ্দিকে দেখে বাইরে আসে ছড়িটা হাতে নিয়েই। বলে, "বসো জয়নদ্দি-কাকা, দাদা আসছে।"

জয়নদ্দি বলে, "ঠিক আছে মা, আমি এখেনেই বসতিচি। তা তোমার তো বেটি ইস্‌কুল ভালই চলেচে। বাঃ! বেশ বেশ। এই নাহালে মেয়ে।"

হাসলে রোহিণী। ওর ছাঁচে গড়া তিলওয়ালা সুন্দর গণ্ড দুটিতে কেমন একটু টোল খেয়ে যায় হাসলে পরে। রোহিণী ওর বাপের থেকেও ভাল রং পেয়েছে। রতনের রংটা তো বাদামী।

জয়নদ্দি বলে, "পরশু আমি সাগরে যাচ্চি মা রোহিণী।"

"সাগরে? শুকটি ধরতে? কবে ফিরবে?"

"মাসখানেক পরে—ভগবান যেত্তি ফেরায়।"

"'যেত্তি' বলো কেন? 'যদি' বলবে।"

হে হে করে' হাসে জয়নদ্দি। বলে, "মুখ্যু লোক মা, তায় আবার জেলে; জিবের কি আড় ভাঙে আমার!"

রোহিণী বলে, "হলেই বা জেলে। ভাল করে' কথা বলতে শিখলে কি কারো জাত যায় নাকি? তুমি তো একটু আধটু 'ট-ট্টি'ঙো' যা হোক্ লেখাপড়া জানো—পুঁথি পড়তে পারো—নাম সই করতে জানো—তবে?"

জয়নদ্দি বলে, "প্যাটের ধান্ধায় সারা দিনরাত জালনৌকো লিয়ে গাঁঙে কাটে এখন আর কার কাছে কখন শিখি মা!"

রোহিণী বলে, "ঐ তো 'প্যাট', 'নৌকো', 'লিয়ে' বললে! ওগুলো কি হবে নিশ্চয়ই তোমার অজানা নেই? তবে?"

জয়নদ্দি বলে, "অভ্যেস মা অভ্যেস! কয়লার কি ময়লা ঘোচে ফটিক জল দিয়ে ধুলে?"

রোহিণী হাসে, বলে, "কয়লায় আবার হীরে পাওয়া যায় কাকা!"

জয়নদ্দি বোকার মত হে হে করে' হাসে।...

রতন এলো পোশাক আশাক করে' জামাইবাবুটি সেজে। বললে, "কি খবর জয়েনউদ্দীন কাকা? চলো কথা বলতে বলতে যাই। একটু তাড়া আছে। স্কুল বোর্ডের একটু কাজ আছে।"

দু'জনে চলতে থাকে পাশাপাশি। জয়নদ্দির কাঁধে হাত দেয় রতন। ভুরভুর করে' মিষ্টি মধুর গন্ধ বের হয় তার গা থেকে।

জয়নদ্দি বলে, "পরশু আমরা সাগরে যাচ্চি বাবাজী। হরেন কাশেম যাচ্চে আমার সঙ্গে। ঘর-দোর বৌ-ছেলে সব রইলো—দেখো।"

"পরশুই চলে যাচ্ছো?"

"হাঁ বাবা, দেরী হয়ে যাচ্চে আজ যাই কাল যাই করে'।—ইস্কুলের কাজ তো শেষ হয়ে এলো বলে!"

"হাঁ কাকা। সামনের মাসেই স্কুল বসাতে পারবো মনে হয়।"

"অনেক খাটলে বাবা তুমি। গায়ে-গতরে আমরা সবাই 'যদি' খানিকটা করে' খাটতে পাত্তুম, অনেক টাকা বেঁচে যেতো।"

"সবাই কি তা পারে কাকা? সংসার আছে তো? আচ্ছা চলি।" রিক্সাতে উঠে পড়ে রতন। চলে যায় শন্ শন্ করে'।

বাড়ীতে ফিরে আসে জয়নদ্দি। বসে পড়ে খুঁটি হেলান দিয়ে। শকিনা আধ-ঘুমন্ত ছেলেকে মাই দিতে দিতে রান্না করছে। জ্বর মতো হয়েছে নাকি ছেলেটার।

"মা কোথা গ্যাচে?" শুধোয় জয়নদ্দি।

"আমলি' কিনতে। ঘরে চিতোই পিঠে আর নতুন গুড় আছে খাওনা।"

"হাঁ, তুই দিয়ে যা।"

অনুনয়ের সুরে বলে শকিনা, "ওগো তুমি লও গো, ছেলেটা জেগে যাবে।"

পিঠে এনে খেতে বসে জয়নদ্দি আর একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে শকিনার মুখের দিকে। সাগরে যাবে বলে ক'দিন থেকে মনে সুখ নেই ওর। নানান ভাবনা ভাবছে। ছেলের জ্বর। মেয়েমানুষের সংসার—কখন কি ঘটে কে জানে! তারপর সাগরে গেলে কেউ ফেরে কেউ ফেরে না আবার! নোনা হাওয়ায় ভেদবমি হয়ে মারা যায়। মেছো বাঘে খায়। ঘূর্ণিঝড়ে নৌকো যায় তলিয়ে। কতো কি বিপদ! নানান ভাবনা শকিনার। তাই স্বামীর ওপরে যত্নটা যেন বেড়েছে একটু; মেজাজ হয়েছে ঠাণ্ডা ধীর। জয়নদ্দি ভাবে, বাস্তবিক, মেয়েমানুষের জীবনে স্বামী হলো এক মহা অবলম্বন। যেন একটা বটগাছ সে। তার ছায়াভরা শান্তিতে লতার মতো তার গায়ে জড়িয়ে থাকে মেয়েমানুষ। বটগাছ পড়লো তো লতারও দফা শেষ।

বাজার-হাট যোগাড়-জাত সব ঠিক-ঠাক। কথা হয়েছে, হরেন আর কাশেমকে তাদের খোরাকী দিতে হবে। ইলিশের যেমন বখরা তেমনি রেবে শুকটির বখরাও।

সন্ধ্যার দিকে হরেনদের বাড়ী গেল একবার জয়নদ্দি, এমনি বেড়াতে; আরো

চারেক চা চিনি ছোলা কিনে নিয়ে। গল্প করতে করতে খাওয়া যাবে। গিয়ে দেখলে হয়েন নেই।

সিন্ধু বললে, "বসো বেই। সে-মিন্‌ষে গ্যাচে তার কাশেম স্যাঙাৎকে নিয়ে বোধ হয় তাড়ি গিলতে।"

বসে জয়নদ্দি। শুধোয়, "কখন ফিরবে তাহালে তো কুনো ঠিক্ নেই? পরশু সাগরে যাচ্চি জানো তো?"

কোনো উত্তর দেয় না সিন্ধু। লম্ফটা নিয়ে একটু এগিয়ে এসে কাছ ঘেষে বসে।

সিন্ধুর লম্ফের আলোয় বিড়ি ধরায় জয়নদ্দি। বলে, "কিচ্চু বল্‌চোনি যে?" সিন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে তারপর সে। চোখোচোখি হয় দু'জনে। হাসে সিন্ধু একটু মধুর করে'। বলে, "কি বল্‌বো। শুনে থেকে তো বুকের ভেতরে খালি কেমন করতেচে আমার।"

"তোমার বেনের তো 'মুখ শুকিয়ে কুল-আঁটি'।" মাথা নীচু করে' আত্মগত সুরে বলে জয়নদ্দি।

সিন্ধু হঠাৎ উঠে পড়ে। বলে, "কেউ যেতি এসে পড়ে? দাঁড়াও, সদোরের দোরটা দিয়ে আসি।"

দোরে 'হুড়কো' দিয়ে এসে নিজেই লম্ফটা নিভিয়ে দেয় সিন্ধু—প্রজাপতিটা তাড়াবার নাম করে'—আঁচলের এক ঝাপ্‌টা মেরে।

"আলো নিভিয়ে দিলে?" হক্‌চকিয়ে যায় যেন জয়নদ্দি।

"পরজাপতিটা তাড়াতে যেয়ে নিভে গেল! দেশলাই নেই?"

"না।"

"তবে? আমাদেরও নেই।" তারপর একেবারে জয়নদ্দির গা ঘেষে বসে পড়ে কেমন করে' হাঁপায় যেন সিন্ধু। বলে, "দিনু—এমনি! কেউ দেখে যেতে পারে তাই!"

"হয়েন যদি এসে পড়ে?"

"তার আগেই যেতি দু'জনে কোথাও পালাই?" হাসি কান্না মেশানো এক অদ্ভুত কণ্ঠস্বর সিন্ধুর।

"যাবে? সত্যি!" উৎসাহিত হয়ে ওঠে যেন জয়নদ্দি। দু'হাতে টেনে নেয় ওকে।

সিন্ধু ওর বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে বলে, "হাঁ। এক্ষুনি আমাকে নিয়ে তুমি কোথাও চলে যাও! আমি তোমার! তুমি সাগরে যেয়ে অদ্দিন থাকলে আমি পাগল হয়ে যাবো!"

পাগল হতে যে আর কিছুমাত্র বাকি নেই জয়নদ্দি তা বুঝলো।

তাই আদরভরা স্বরে ডাকলে সে ওর মাথায় পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে।

"সিন্ধু!"

"বলো!" কান্নাভাঙা আবেগভরা কণ্ঠস্বর যেন জলতরঙ্গের মতো কেঁপে কেঁপে ওঠে সিন্ধুর।

"ওকে তোমার ভাল লাগেনে?"

"না। তোমাকে!"...কতো সহজেই ধরা দিতে চায় মেয়েটা! তবে কি ভাল নয় ও?

চুপ করে' বসে থাকে কতক্ষণ জয়নদ্দি।...হরেন জানতে পারলে এক্ষুনি হয়তো খুনোখুনি হয়ে যাবে। শকিনার কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে রতনের কথা। তবুও সাংঘাতিক স্পষ্টভাবেই অনুভব করে জয়নদ্দি, তার রক্তের মধ্যে আগুন ধরে গেছে। কিন্তু হরেন...

পাখীর গানের সুরে বলে সিন্ধু, "জীবন-ভর যেতি তোমাকে এমনি করে' পাই মরতেও আমার কুনো কষ্ট হবেনে! তুমি সাগরে যেওনি। সাগর থেকে ফিরে আর হয়তো আমাকে দেখনে পাবনে।"

"বল্‌তে নেই। ছি! কিচ্চু ভয় নেই। ভগবান দেখবে।"

"আমি পাপী, আমাকে ভগমান দেখবে?"—কেঁদে ফ্যালে বুঝি সিন্ধু। "এই যে একজনের বৌ হয়ে আর একজনের সঙ্গে ঢলাঢলি কচ্চি—ই-কি পাপ নয়?"

"না!"—জয়নদ্দির ভেতর থেকে যেন অন্য আর একজন কেউ কথা বলে। চেহারাটা তার বনমানুষের মতো বুঝি-বা!

"কি তবে? ভালবাসা?" খিল্ খিল্ করে' হেসে ওঠে সিন্ধু। রহস্যময় সে হাসি। চম্‌কে ওঠে জয়নদ্দি।

চমকে ওঠে আকাশের তারাগুলো।···মেয়েমানুষ কখন কি ছল্ ধরে কে জানে! ধরিয়ে দেবে নাকি তাকে?···কিন্তু সিন্ধুর এই যৌবন···এই আত্মদান··· বড় শক্ত—বড় কঠিন তাকে এড়িয়ে যাওয়া। তবু···কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে···

তবু উঠে পড়ে জয়নদ্দি। সিন্ধু বাহু বিস্তার করে! জড়িয়ে ধরে ক্ষিপ্ত বাঘিনীর মতো।

আর ঠিক সেই সময়েই দোরে কে যেন আছাড় খেয়ে পড়ে হঠাৎ!

"এই—দোর খোল!"

চমকে ওঠে জয়নদ্দি। কট্‌মট্ করে' তাকায়। কিন্তু অন্ধকারে সিন্ধুর মুখের ভাব বুঝতে পারে না। খপ্ করে' চেপে ধরে ওর হাত দুটো। কিন্তু না··· সিন্ধুও চুপ!

তারপর জয়নদ্দিকে ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে নিয়ে যায় সে খিড়কির দিকে। বার করে' দেয় দোর খুলে। নিঃশব্দে আবার দোর এঁটে দেয়। ঘরে উঠে গিয়ে তারপর সেখান থেকে সাড়া দেয়,—"যাই!"

"কতো দেরী হয় র‍্যা শালী! সন্ধ্যেবেলাই দোরে হুড়কো মেরে শুয়ে পড়িচিস্?" নেশায় কিছু আড়ষ্ট কণ্ঠস্বর হরেনের।

দোর খুলে দেয় সিন্ধু। হাই ভাঙে। যেন কতো ঘুম থেকেই না উঠলো সে এক্ষুনি! আলো জ্বালে। তারপর সাপের মতো পাকিয়ে পাকিয়ে চুল বাঁধে অদ্ভুত এক মদলস ভঙ্গিতে। দাওয়ায় কি যেন তিনটে কাগজে মোড়া পড়ে রয়েছে, ভাখে হরেন। বলে, "কি ও?"

ঝট্ করে' তুলে নেয় সিন্ধু। খুলে ভাখে। বলে, "এ মা! রূপোর বোনটাকে চা-চিনি-ছোলা কিনতে দিয়েছেনু সেই বিকেলবেলা—তুমি যাবার পর এসে দিয়ে গেল। তা পেট কন্ কন্ করচে বলে আর তোলাও হয়নে— খাওয়াও হয়নে। শুয়ে পড়েছেনু। উঁ! মিন্‌ষের গায়ে যেন পাঁটার গন্ধ বেরিয়েছে!" নাকে কাপড় দেয় সিন্ধু।

মাতালে স্বরে বলে হরেন, "পাঁটাই তো বাবা, পাঁটাই তো! তোর বাপ-চোদ্দপুরুষের পাঁটা নয় আমি? এই শালী বল্—তুইই বল্! দে আলো দে।" আলো নিয়ে ঘাটে চলে যায় হরেন। গায়ে তার তাড়ির গন্ধ ভট্‌ভট্ করছে।

পাঁচিলের পাশে কলা ঝোপটার মধ্যে আত্মগোপন করে জয়নদ্দি। হরেন চীৎকার করে' গান ধরে চলে যায় ঘাটের দিকে 'ওমা কালী করালী তোর, কালো রূপে জগৎ আলো।"

জয়নদ্দি বেরিয়ে এসে আবার বাড়ীতে ঢোকে।

সিন্ধুকে বলে, "চল্‌লুম।"

"দূর মুখপোড়া মিন্‌ষে! চা-চিনিগুনো ফেলে গ্যাচ কেন? আমাকে মারবার কল্ না?"

জিব কাটে জয়নদ্দি। বলে, "মাইরি মনে নেই! জান্‌তে পারেনে?"

"না। আঃ! ছাড়ো! ঐ আসচে, পালাও পালাও।"

পালিয়ে আসে জয়নদ্দি।

অন্ধকার। চারদিকে কোকাফ অন্ধকার। আর হঠাৎ মনে হয় তারা যেন এই অন্ধকারেরই জীবজন্তু। কিছু দূরে এসে গান ধরে সে। সাথে, আলো নিয়ে কানাইয়ের বৌ আর মেয়ে ফিরছে তরবদিদের বাড়ী থেকে। ওরা চলে যায় পাশ কাটিয়ে—কথা বলে না।

জয়নদ্দি ভাবে, সে একটা দুর্বল গাধা! ... এমন মুহূর্ত মানুষের জীবনে ক'বার আসে? কে তাকে অমন করে' নষ্ট করে? একটা মুহূর্ত—একটা মুহূর্ত—একটা মুহূর্তের অপেক্ষা! ... কি মধুর কি ভীষণ কি ভয়ঙ্কর ভালো লাগে সিন্ধুর ওই দুরন্ত যৌবন!...

কিন্তু যদি ধরা পড়তো আজ? না, সিন্ধু ছলনা করেনি। ও সুখী হতে পারেনি নাকি!—কে সুখী হয় জীবনে?—তার সঙ্গে পালাতে চায়! যাবে নাকি জয়নদ্দি? দূরে কোথাও—দু'জনে থাকবে, খাটবে খাবে। কিন্তু শকিনাদের চলবে কেমন করে'? মা আছে, ছেলে আছে। জমিতে ধান আছে। জাল করেছে। আর ইস্কুলের 'মেম্বর' হয়েছে। জেলেদের মধ্যে তার নাম যশ হয়েছে। পুঁথির গল্পের সেই মায়াবিনী ছলনাময়ী হরিণী নাকি সিন্ধু!...

না, সে অন্যায় করছে—কখনো এমন কাজ করবে না। রতন সেদিন বলছিল, মানুষ হাজার পাপ করেছে তবু সে চেষ্টা করলে ভাল হতে পারে। 'হয় ভালো হও, নয় মন্দের ভয়ংকর পাঁকের মধ্যে ডুবতে থাকো, মাঝামাঝি কোনো জায়গা নেই দাঁড়াবার।'

সে কি মন্দের মধ্যে তলিয়ে যেতে চায়? তবে? কেন—কেন গেল সে হরেনদের বাড়ী? হরেন নেই যদি দেখলে তবে সে তো চলে আসতে পারতো! সিন্ধুর মধ্যে নতুন কি আছে? শকিনাও তো একদিন অমনি ছিল। আজও সে ফুরিয়ে যায় নি। সিন্ধুকে পেলেই সেও ফুরিয়ে যাবে! যতক্ষণ না পাও ততক্ষণই যা আকুলি বিকুলি। এই তো জগতের খেলা!

রোহিণীর চেহারাটাও ভেসে ওঠে হঠাৎ জয়নদ্দির মনে।…কি সুন্দর!… কিন্তু সে কাকা বলে। লেখাপড়া জানা মেয়ে। ভারি ভালো লাগে মেয়েটাকে। কেমন সুন্দর করে' কথা বলে। তাদের এই কলুসিত আবর্জনা-সংকুল জীবনের কাঁটা গাছে ও যেন একটা ফুটন্ত ফুল। যেমনি রঙ্, তেমনি সৌরভ। ওর জন্ম যেন একটা আশ্চর্য!

কিন্তু সিন্ধু!…দীর্ঘনিঃশ্বাস ফ্যালে জয়নদ্দি। সিন্ধু যেন সেই 'হাড়ভাঙা' গাছের মোচার মতো দীর্ঘাকার বিচিত্র ধরনের গন্ধহীন একটা ফুল! চমক লাগে দেখলেই। একবার নিতে ইচ্ছে করে হাতে। কতক্ষণ নাড়াচাড়ার পর ফেলে দিতে হয় বিবর্ণ হয়ে গেলে। বর্ণ ছাড়া আর কিছু নেই। শুধু রূপ। শুধু যৌবন। শুধু দেহ।

কিন্তু জয়নদ্দি বোঝে সিন্ধুর বিরুদ্ধে হাজার উল্টো চিন্তা করলেও সে তার মন থেকে সরে না। রামধনুর মতো রঙের বাহার নিয়েই তার সজল মেঘভরা আকাশের এক প্রান্ত জুড়ে রয়েছে—তাকে 'না' বলে হাঁকিয়ে দেবার মতো শক্তি নেই জয়নদ্দির।

শুক্রবার এলো। সকলেই ওরা আজ সমুদ্র-যাত্রা করবে। চাল ডাল আলু মরিচ মশলা নুন পান সুপারী তেঁতুল কাঠকুটো জালসুতো কাপড়চোপড় তেল আলো, 'গোলসানে রুম কেচ্ছায় দীল্ খোশ' আর 'হাতেমতাই' পুঁথি দুটো—যা যা দরকার সব কিছু নৌকোয় তুললে। নদীর ঘাটে এলো শকিনা, সিন্ধু, জয়নদ্দির মা, কাশেমের মা, বৌ সকলে। পাঁচপীর বদরগাজির নাম করে' ওরা নৌকো ছাড়বার সময় চোখের পানি পুঁছতে লাগলো মেয়েরা। জয়নদ্দি তাকিয়ে রইলো অনেকক্ষণ। সিন্ধুও কাঁদতে লাগলো তার দিকে চেয়ে। দাঁড়িয়ে আছে সে একটা সরল রেখার মতো। শকিনার চোখ দুটো কুঁচের মতো

লাল হয়ে গেছে কাল থেকে কেঁদে কেঁদে। আরো দূরে সরে গেলে ভাল করে' আর চেনা যায় না কোন্‌টা কে।

হলুদ পালতোলা নৌকোটা যতক্ষণ স্থাখা যায়, আড়বাঁধির ওপরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে শকিনারা। চোখের পানি পোঁছে আল্লা তায়ালার নাম শরণ করতে করতে। কে জানে কার কপাল ভাঙবে আর কার কপাল ফিরবে। শুক্‌টি-খেতে-আসা চরের মেছো বাঘের থাবা থেকে বেঁচে ঘরে ফিরে এলে পয়লা হাটের 'মাল' বেচা পয়সায় দরিয়ার পাঁচপীর বাবা বদরগাজির 'হাজুত' শুধ্‌বে সবাই। কাশেমের 'দিন-মেসে' পোয়াতি বউটা কোলের ঘুমন্ত ছেলেটাকে বুকে তুলে নিয়ে আঁচলে চোখ মুছে কান্নাভাঙা গলায় বলে জয়নদ্দির মাকে, "রাক্কুসে প্যাটের লেগে ঘরের মানুষকে পাঠাতে হচ্ছে চাচী যমের মুয়ে।...তুটি বাসিপান্তা খেয়ে গেল, রাঁধা হলোনিকো চেলের জন্তে! 'কাঙোলে'র কি চাল লেয়েচে মা, ডাবাপচা খালি 'গন্ধ'! যা টাকাকড়ি পাবে মিন্‌ষে খালি তাড়ি মদ গাঁজা খেয়ে খেয়ে ওড়াবে। খুঁটির ভেতরে কতগুনো টাকাপয়সা জম্মেছেনু, তা পরশু 'কাদ্‌দা' দে' কেটে 'বেই' করে' লিয়ে তাড়ি গিল্‌তে গেল। তাড়ি মদ না গিল্‌লে নাকি ডাঁড় টান্‌তে পারেনে।"

জয়নদ্দির মা বলে "নেশার চিজ, তা একটু খায় খাক্‌না মা—যাবার সময় তারা অমন অলক্ষুণে কথা বলিস্‌নিকো। খারাপ হয়। বাবা পাঁচ-পীর তুই-ই রক্ষে করিস্‌ মোর বাল্‌-বাচ্চাদের। বিপদ-আপদ অসুখ-বিসুখ যেন না হয়। পাঁচপীরের সিন্নি দোব, বদরগাজির হাজুত দোব।"

নৌকোটা দুল্‌তে দুল্‌তে ক্রমে ক্রমে এতোটুকু হয়ে দূর থেকে দূরে দৃষ্টির বাইরে সরে গেল। ছলাৎ ছলাৎ শব্দে কেবলই একটানা বয়ে চলে হুগলী নদী। মেঘলা মেদুর আকাশের প্রতিবিম্বটা দুলতে নাচতে থাকে ঘোলাটে পানির আয়নার ওপরে।

ঝোড়ো হাওয়ায় নাচতে থাকে জয়নদ্দির মায়ের মাথার পাকা চুলগুলো। হরেনের বৌ সিন্ধু, জয়নদ্দির বৌয়ের নিদন্ত ছেলেটাকে তার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে কাপড় পরে নেয় ভালো করে'।

জয়নদ্দির মা বলে, "মোর কি আর সে গতর আছে যে উ-মিন্‌ষেকে

কোলে করে' করে' এতোটা রাস্তা বইবো। ধান 'ভেবিয়ে' ঢেঁকি ঠেঙিয়ে কোমর আমার গ্যাচে। লে মা বৌ লে এট্টু। তোরও হবে লো—তোরও হবে। এ্যাহ! আবার লজ্জা! ছাখ, চিম্‌টি কাটে ছাখ্! ও লো মুই চাচী হই লো—মোর কাছে লুকুস্‌নি। তা বাছা কতো আর তোর বয়েস—ল'চ্যাংড়া। অসুখ থাকে মোর কাছ থিঙে ওষুধ খাস্‌দিনি।···ও আল্লা রে! সে আভাগীর বেটারা করেচে কি? এ্যা! 'আম্‌লি'র ভাঁড়টাই ফেলে রেখে গ্যাছে! ও বাবা কি হবে! বিল্‌ঝন্‌ঝনির গাছের আওড়ালে ভাঁড়টা পড়ে আছে তা কে জানে! নোনা হাওয়ায় নাকি 'প্যাটের অসুখ' হয়—কি করে' বাঁচবে মোর ছওয়ালরা—হায় আল্লা কি হবে—কার হাতে আবার পাঠাবো—কে লিয়ে যাবে—সবাই যে অগ্‌গেরে চলে গ্যাচে"···

জয়নদ্দির মায়ের ভাবনা যেন বুক সমান হয়ে ওঠে তেঁতুলের ভাঁড়টা ফেলে যাওয়াতে। নোনাপানির হাওয়ায় আঁশ্‌টে গন্ধে গা বমি বমি করে, ভাত রোচে না—বমি হয়ে যায়। টক্ খেলে তবেই নাকি বাঁচোয়া।

শকিনা এতক্ষণে কথা বলে, "ঐ সিন্ধু মাগীই তো আমলির ভাঁড়টা লিয়ে এলো হাতে করে'। মদ্দমানুষের জন্তে, কি কার জন্তে জু-জাহান দৃড়কড় কত্তেচে উ-দিক পানে—আর খাটা নাহালে যে ভেদবমি হয়ে 'খাল-ভরা'রা মরবে তোমার। এ্যাখন জান 'খাটা' (টক্) করে' খাটার ভাঁড়টা হাতে নিয়ে ফিরে চলো।···আর ই-এক 'সক্‌শো'র ছওয়াল হয়েচে বাবা—নিদ্ আর নিদ্—ঝুলে ঝুলে হাত কাঁকালটা দিলে আমার দ' ফেলে।"

ওরা এবার গাঁঙ্‌ধার থেকে ফিরতে আরম্ভ করে বাড়ীর দিকে।

কাশেমের বৌ বলে, "মোকে এটু খাটা দিস্ গো চাষী।"

সিন্ধু হঠাৎ খিল্ খিল্ করে' হেসে ওঠে। তার হাসিতে কাশেমের বৌ কেন যে টক্ খেতে চাইছে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

জয়নদ্দির মা বলে, "লিস্‌খন মা। পোয়াতি মানুষ, এটু খাটামাটা খাবার সাধ যায়। তা খাস্। দিস্ লো বৌ—দিস্ তো এট্টু ওকে।"

সিন্ধু শকিনার কানের কাছে মুখ এনে বলে, "আমাকেও এট্টু দিস্ লো বেন।"

"কেন, তোরও হয়েচে বুঝিন্?"

লজ্জা পায় সিন্ধু। মাথার ঘোমটার একপ্রান্ত দাঁতে চেপে মুখটা আড়াল করে' চোখের ইসারায় অদ্ভুত এক ইংগিত জানায়।

শকিনা বলে, "তাই অমন ফুলো ফুলো ঠ্যাকে গতরটা!"

চিম্‌টি কাটে সিন্ধু। ধাক্কা দেয়।

শকিনা বলে, "দ্যাখ্‌ মাগীর কাণ্ড ত্থাখ্‌—ছেলে পড়ে যাবে যে লো!...তা, হ্যাঁ লা, ক'মাসের?"

শকিনার কানে কানে কি যেন বলে সিন্ধু।

শকিনা বলে, "পাঁচ ছ'মাসের! তা কই তোকে দেখে তো বাইরে থেকে বোঝা যায়নে! অতো কষে কষে কাপড় পিন্দিস্‌নি। মোর কতো বড়ো ঝোঁড়ার মতন হয়ে ছ্যালো দেখিস্‌নি? আল্লা যার যেমন দেয়।"

জয়নদ্দির মা'রা দু'পা পেছিয়ে পড়েছে, শকিনারা একটু দাঁড়ায়, তার শাউড়ীকে বল্‌তে শোনে,..."শুধু তরবদি ঐ রকম? ওর বাপ ছ্যালো ওর চেয়েও তিগুণ খচ্চর। মাছের বখরা নিয়ে কি কল্‌লে তো দেখলি? ইমান? ওর যেতি ইমান থাকবে তাহালে আল্লা বেইমান করবে কাকে? একটা 'নমুন্নো' (নমুনা) থাকা চাইতো। আর বড়লোকের কি ইমান থাকে? ইমান থাকলে বড়লোক হওয়া যায়নে।"

কাশেমের মা বলে, "বুবুর হলো হক্‌ কথা। তোমার ছেলেটা খালি শক্তপানা ছ্যালো বলে ওর সঙ্গে পেরে ওঠেনে। হাত ধরতে যেয়ে এট্টু মুচড়েপানা গেছ্যালো বলে মোর ছেলেকে কদিন নারবার জন্যে কী! ঘুরে ঘুরে অন্যরাস্তা দিয়ে জালে যেতো সবাই।"

ওরা যে যার বাড়ীতে চলে যায় তারপর চোখের পানি পুঁছতে পুঁছতে।

একটার পর একটা দিন এগিয়ে চলে ধীরে ধীরে।

যারা সব শুকো ধরতে সাগরে চলে গেছে তাদের মেয়ে-বৌয়েরা সবাই এক জায়গায় জুটে গল্প-গুজব করে। দু'তিন টাকায় ফুরোন করে' আনা ইলিশের জাল সারে। মিহি, চুনো, কইলে, খ্যাপলা, বেংতি, ফেটি, চাটিম নানান সব জাল বোনে। চরকা ঘুরোয়—তক্‌লি ঘুরোয়। বাঁশের নল তৈরি করে। কেঁড়ে-নালি

চলে দ্রুত গতিতে হাতে হাতে। মুখে চলে, সাগরে মাছ ধরতে যাওয়ার কতো আজব কাহিনী—রূপকথার গল্প। সিন্ধু খিল্‌খিল্ করে' হাসে কারণে অকারণে। কাজকর্মহীন কুড়ে গরু স্বামীর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে' মার খেয়ে কেঁদেকেটে এসে বসে থাকে ওদের কাছে কানাইয়ের বৌ লক্ষ্মী। বেচারী খিদে-পাগল চার-পাঁচটা ছেলেমেয়ে নিয়েই জ্বালাতন!

শকিনা মিহি ফাঁদি বুন্‌তে বুন্‌তে শাউড়ির মুখের আজব কাহিনী শুনে যায় চুপটি করে'। প্রায় উদোম গায়ে বসে জটপাকানো চুলের উকুন বাছায় কালু বারুইয়ের বৌ।

গল্প বলে চলে জয়নদ্দির মা, জবুথবু হয়ে মাটিতে হাত পেতে বসে তার ঘোলা চোখের পিটপিটে ঝাপ্‌সা দৃষ্টি মেলে তাদের ঝোবড়া বস্তির দিকে তাকিয়ে।

…"শুকো থেকে ডেড় মাস বাদে মদ্দমানুষ মোর ফিরে এলো গায়ে নোনা পানির কামড়ে 'পান-টিপ' ভরিয়ে লিয়ে। শরীলখানা এগবারে রোগা কাঠ—যেন মড়া উঠে এয়েচে 'শ্মাশন' থিঙে। কলেরার মুখ থিঙে দু' দু'বার বেঁচে গ্যাচে নাকি। তারপর মাটিতে থেবড়ে বসে পড়ে খুটি হেলান দিয়ে হাঁপাতে লাগলো। তার আবস্থা দেখে মোর চোখে তো আর পানি ধরেনে। বুকের ভেতরটা কেমন হাউ হাউ করতে লাগলো। হাওয়া করে' নিম পাতা দিয়ে গরম পানি করে' গা ধুইয়ে মদ্দমানুষকে মোর কোলে করে' টেনে তুলে লিয়ে এসে শুইয়ে দিনু 'বেচোনে'। একদম লাতাপাতা—লড়তে পারেনে—সারা গায়ে পাকা ফোড়ার মতন ব্যথা! বুকে টেনে গলা ধরে কাঁন্‌তে কাঁন্‌তে বললে, 'মুই আর বাঁচবোনি গো 'জয়নদ্দির বৌ'!—মুই ছুটে গেনু লখাই কোবরেজের কাছে—দুটো পায়ে তার জড়িয়ে ধনু। সে এসে টিপেটাপে দেখে বললে—গায়ে এতো ব্যথা কেন—ব্যথা হওয়ার কথা তো ডাঁড়িদের—তুমি মাঝি'—তারপর মিন্‌ষে আমার কেঁদে বললে,'লখাই-দা, তরবদির বাপ মোকে জুতোর বাড়ি মেরেচে বড্ড! অনেক মাছ ধরেছেনু মোরা—আসবার সময় ঘুরন ঝড়ের ঘুয়ে পড়ে লৌকো ডুবে পানি উঠে শুকনো মাছ সব ভেসে গেল গাঁঙে। মন দুই যা ছ্যালো তাও গালে চড় মেরে কেড়ে লিলে মাহাজন।…এই তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলতিচি লখাই-দা, যেতি মিছে কথা বলি তো মোর জানবাচ্চার মাথায় বাজ পড়বে। মাহাজন বললে, 'সব তোদের কারসাজি!' আল্লার 'কসম' খেনু—কোরানের কিরে

খেনু—বিশ্বাস করলেনে মারলে রেগে যেয়ে। গায়ের ব্যথায় লড়তে পারিনি।”…

ঝরঝর করে’ বুড়ীর তোবড়া গাল বেয়ে চোখের পানি গড়ায় মরণে যাওয়া স্বামীর দুঃখের কথা স্মরণ করে’। স্তব্ধ হয়ে শোনে সবাই। শকিনারও চোখ ছল্ ছল্ করে।

বুড়ী বলে, “সেই মারের ধমকে খোলে ‘লৌ’ (রক্ত) পড়ে যেয়ে একমাস লৌ-আমেশা হেগে হেগে মরে গেল। মোর বাপের দেওয়া বাটিঘটি সব গেল। তাবিজ পৈঁছি সব। সে যাক, তার জন্যে মোর কুনো খেদ ছ্যালোনি—মনে জেনেছেনু মদ্দমানুষ মোর বেঁচে উঠলে সব হবে। সব দুঃখ ঘুচে যাবে।… দশ এগারো বচ্ছরের চিগ্‌নে ঐ জয়নদ্দিকে লিয়ে মুই ‘রাঢ়’ (বিধবা) হনু। দেনার দায়ে জরবদির বাপের খপ্পরে লৌকো জাল তো অগ্‌গেরেই গেছ্যালো—মিন্‌ষে মরতে দোকানের অনেক টাকা দেনা দেখিয়ে জমিটুকু আর ঘরের টিনটাও দখল করলে। মিছে কথা বলবোনি, মোর কাছে এক কুড়ি পাঁচ টাকা ছ্যালো, চুরি করে’ করে’ রেখেছেনু, তাই দিয়ে ঐ চোঁঙ্‌ খোলা আনানু হরেনের বাপকে দিয়ে। সেই কাঠামো করে’ ঘর ছেয়ে দেয় তবে ছেলে লিয়ে মাথা গুঁজে থাকি। কম কষ্টে দিন গ্যাচে মা মোদের? লোকের ধান কুটতে গেচি, ছেলে খিদেয় ‘ভিমরি’ লেগে পড়েচে,…জাল বুনে দিইচি পয়সা পাইনি। শেষ বেলা অনেক কষ্টে ক’টা টাকা জমিয়ে এক বস্তা শুকটি কিনে মাথায় করে’ বাখরার হাটে লিয়ে যেয়ে বিক্‌কিরি করি। সেই টাকা থেকে পাজারী-মেছুনী হয়ে বার্ষাকালে ইলিশের ব্যবসা করনু।… কতো কষ্টে দিন গ্যাচে মা—ভাবলে চোখের পানি থাকেনে। ছেলে এমনি মানুষ হয়? ঐ যো, কিছু করলেই ছেলেটাকে ধুম্‌ ধুম্ করে’ মারে আমার বৌ—উ-তো খুব ঠেঙো—জয়নদ্দি ছ্যালো কী খাণ্ডৎ—তবু কক্ষনো দুটো আঙ্‌ল তুলে মারিনি। বলি না, আমার এইটুকুনি দুধের চিগ্‌নে—জানের টুক্‌রো বাঁচলে, তবে আমার দিনকাল ফিরবে, দুঃখু ঘুচবে। তা আল্লা আজ মোর মুয়ের পানে চেয়েচে।…মেয়েমানুষের, ঐ ছেলেই হলো ‘বেহেস্ত’। আখেরের সুখ। মদ্দমানুষের কি! সে ছেলে পয়দা করেই খালাস।…তা মোর মদ্দমানুষ সে-রকমটা ছ্যালোনি—নেশাটা-আশটা কত্তো বটে কিন্তু বড্ড ‘পিয়ার’ কত্তো মোকে।” নাতনী সম্পর্কিতা ষোড়শী

মালতীকে শুনিয়ে জয়নদ্দির মা 'পিয়ার' কথাটা একটু রসের ভিয়ান দিয়েই উচ্চারণ করে।

কাশেমের বৌয়ের ওসব কথা শুনতে আর ভাল লাগেনা। ওতো তাদের সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ওতে রসকষ কিছু আছে যে শুনবে? তাই বলে, "তুই আর কাঁদিস্‌নি চাচী, থাম্। মন্দমানুষ তোর কান্না থামাতে উঠে আসবে আবার কোথা!"

কথা শুনে খিল্ খিল্ করে' হেসে গড়িয়ে পড়ে সিন্ধু। যৌবনপ্রমত্ত সিন্ধুর মতোই উদ্বেল উতালা হয়ে ওঠে যেন সে।

কাশেমের বৌ পোয়াতিমানুষ—কবে দিন এসে পড়ে—বুড়ীকে রাগালে আবার বিপদের সময় পাওয়া যাবেনা। ওই একটা গুণ আছে, ভাল খালাস করতে জানে জয়নদ্দির মা—তাই একটু খোসামদের সুরে বলে, "তার চাইতে তুই বল্ চাচী, সেই বাঘে নিয়ে যাওয়ার গল্পটা। নাহালে সেই পুঁটে মাঝির ঘোলে যে জ্যান্ত কাঠটা উঠতো আগাশ সমান হয়ে আর দড়াম করে' পড়তো পানির ওপরে—সেই গল্পটা বল্।"

জয়নদ্দির মা বুড়ীর রাগ তবু যায় না। সে আর কোনো গল্প করবেনা ঐ ছোটলোকের মেয়েদের সাথে। কথা কাটলে ভারি রাগ হয় তার।

শকিনা বলে, "হাঁ মা, যা গুড়ুক তামুক আর পান সুপুরি দিয়ে ছ্যালে তাতে চলবে তো? অতো পান দিলে সব হয়তো পচে যাবে হাপ্তাখানেক বাদে। চালের টানা পড়ে যেতি? নঙ্কা হলদিগুনো যেতি গুঁড়ো করে' দিতুন্!—আঃ! ছাখো খালি ছেলের ব্যাভার—সাধে মারি—সাধে মারি আমি! কানটা আমার দিয়েছে ছিঁড়ে ফেলে।"

জয়নদ্দির ছেলেটা আধোআধো বুলি শিখেছে সবে দুটো চারটে। মার খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ে চীৎকার জোড়ে আকাশ-ফাটা। মাকে গাল দেয়, —"ছালার বেতা ছালা!"

তার কথা শুনে হেসে লুটোপুটি খায় সকলে। জয়নদ্দির মা বলে, "আভাগীর বেটির হাতে বিষ আছে, মেরেমেরে মেরে-ফেলে দিলে বাচ্চাটাকে।—না দাদু, ছিঃ! মাকে গাল দিতে নেই। 'গোনা' হয়। চলো তো আমরা 'বুল্‌তে' যাই, চলো।"

জয়নদ্দির মা তার নাতিকে তুলে নিয়ে চোখমুখ মুছে দেয়। তারপর গুটি গুটি করে' নিয়ে যায় একদিকে নানান কথা বলে ভুলিয়ে।

এমনি করে' ওদের দিন যায়। মাস পেরোয়। তারপর আশায় আশায় দিন গোণে কবে সাগর থেকে ফিরবে জয়নদ্দিরা। জয়নদ্দির মা বুড়ী রোজ একবার করে' নদীর ঘাটে গিয়ে দেখে আসে ওরা এলো কিনা।

॥ ১৪ ॥

কাছের পিঠের তিন চারটে গ্রাম থেকে আর নিজের গ্রামের সমস্ত ছেলেমেয়ে সংগ্রহ করে' রোহিণী আর রতন স্কুল চালু করে' দিয়েছে।

সরু মোটা সমস্ত ধানই পেকে গেছে তখন সারা মাঠে মাঠে। যাদের খোরাকীর টানাটানি এক আধ বিঘে কাটাও হয়ে গেছে তাদের। বেশ জাঁকিয়ে শীত পড়েছে তখনি। হঠাৎ এমনি দিনের এক বিকেলে দুটি চামড়ার বড় বাক্স আর হোল্ড-অল-আদি নিয়ে রিক্সায় করে' ইলিশমারিতে নামলো এসে একজন তরুণ। সুদর্শন গৌর বর্ণের চেহারা। খোপদুরস্ত পোসাক-পরিচ্ছদ। দেখলেই বোঝা যায় শহরের কোনো উচ্চ মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। পাড়ার ছেলেমেয়েদের দল জুটলো তার পেছনে। তারা সবাই অবাক হয়ে দেখলে লোকটার কাঁধে কি একটা ছোট্ট মতো চামড়ার বাক্স ঝোলান আর তা থেকে গান হচ্ছে কি মজার!

একজন বললে, "সায়েব রে—সায়েব!"

কানাই আর গুলে দুটি বাক্স আর হোল্ড-অল বয়ে নিয়ে যেতে রাজি হলো দু'টাকাতে রতনদের বাড়ী পর্যন্ত।

হঠাৎ সেখানে তরবাদি এসে পড়ে বলে, "আপনি কোথা যাবে গা?"

লোকটা বললে, "রতনদের বাড়ী।"

"ও:! রতন কেউ হয় বুঝিন্?"

"জী না। এমনি বন্ধু আর কি। এক সঙ্গে পড়েছিলাম।"

"ওঃ! তা বেশ। বায়ে নিয়ে যা। আপনার নামটা কি?"

"প্রদীপ আনোয়ার।"

"হিন্দু না, মোসলমান গো?"

"তা বলা শক্ত। আমার বাবা মুসলমান, মা হিন্দু। অতএব আমাকে বলতে পারেন দুই-ই।"

"কেন বাবু, বাপ মোসলমান হলে তো ছেলেও তাই হবে?"

সুন্দর করে' হাসলে প্রদীপ। বললে, "তাইতো লোকে বলে। কিন্তু আমি মাতৃপরিচয়কেও অশ্রদ্ধা বা অস্বীকার করতে চাইনে। আচ্ছা চলি এখন!" করজোড়ে বিনীত নমস্কার জানিয়ে চলে এলো প্রদীপ। তরবদিও হেসে খুশী হয়ে প্রতি নমস্কারের একটা ভঙ্গি করলে বিস্ময়ে কৌতূহলে।

ছেলের দলও পিছনে পিছনে ছুটলো প্রদীপের।

রতনদের বাড়ী আর কতটুকুরই-বা পথ। বড় জোর দশ মিনিট লাগে।

বাইরে লোকজনের সাড়া পেয়ে চুলে চিরুনী টানতে টানতে একবার বৈঠকখানাতে এসে উঁকি দিতে গেল রোহিণী। চমকে উঠলো। ওরে বাবা—এ কে! দাদার সেই শহুরে বন্ধু নাকি? সুন্দর চোহারা তো! চোখে চশমা। মাথায় বিস্তর সুন্দর কালো চুলের রাশি। টিকোলো নাক। রাঙা ঠোঁট। টুকটুকে ফর্সা রঙ্। চকচকে ঝকঝকে দামী সুটপরা। গলায় ঝোলানো ক্রিষ্ট্যালসেট্ রেডিও।

প্রদীপ হেসে শুধোলে, "রতন আছে তো?"

সম্মতিজ্ঞাপক মাথা নাড়লে শুধু রোহিণী। তারপর চলে গেল ভেতরে। কয়েক মুহূর্ত পরেই রতন বেরিয়ে এলো। সোল্লাসে প্রায় চীৎকার করে' উঠলো সে, "হ্যালো! প্রদীপ। আরে দাঁড়িয়ে কেন? উঠে এসো। বাক্সগুলো এখানে রাখবে, না, চলো সেই বাগানবাড়ীতে। রোহিণী বাগানবাড়ীর চাবিটা নিয়ে আয় শীগগিরই।—চলো।"

ওরা সকলে চলো এলো বাগানের দিকে। রতন বললে, "তোর আসার কথা ছিল না কাল?"

"শুভস্য শীঘ্রম। একটু আগেই চলে এলাম।"

"আ বেশ করেছিস্। বাবা মার খবর ভাল তো?"

"ওঁরা দিল্লী গ্যাছেন।"

"হঠাৎ?"

"ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপার!" হাসলে প্রদীপ। "আরে, এতো বেশ ভাল জায়গা,—বাঃ! চমৎকার! বাংলোর মতো যে!"

"গরীবের ভুঁইকুঁড়ে ভাই!" রোহিণীর হাত থেকে চাবি নিয়ে দোর খোলে রতন। বলে, "এ আমার বোন—রোহিণী। গত বছর ম্যাট্রিক পাশ করেছে সেকেণ্ড ডিভিশনে।"

"নমস্তে দেবী!" একটু ঠাট্টার ভঙ্গিতেই করজোড়ে অভিবাদন জানায় প্রদীপ।

লজ্জায় মরে যায় রোহিণী! হাত তুলে বলে, "নমস্তে!"

একটা কার্পেটের ইজিচেয়ারে বসে পড়ে প্রদীপ। তারপর লাফিয়ে উঠে পকেট হাতড়ে ব্যাগ বার করে' বলে, "ওই যা! কুলিদের পয়সা দেওয়া হয়নি তো! স্যারি!"...

"কতো? থাক্ আমি দিচ্ছি।" বাইরে চলে আসে রতন।

টেবিলের এককোণ ধরে দাঁড়িয়েছিল রোহিণী! প্রদীপ তাকিয়ে বললে, 'তারপর রোহিণী, তুমি আর পড়ছো না যে? তোমাকে 'তুমি'ই বলি, রতন আমার বন্ধু, তার তুমি ছোট, অতএব"...

রোহিণী বলে, "আজ্ঞে হাঁ, আমাকে তুমি বলবেন! এখানে কাছে তো কোনো কলেজ নেই, যা করে কোলকাতা, যেতে আসতে অসুবিধা—তাই"...

রতন এলো। বললে, "তোকে ওরা সায়েব পেয়ে তো খুব করেছে? একেবারে দু'টাকা ভাড়া?"

"লেট দেম গো বাবা, এই নাও, তোমাকে আর পস্তাতে হবে না!" দু'টাকার একখানা নোট বাড়িয়ে দেয় প্রদীপ।

রতন বলে, "রাখ। দিয়ে এসেছি। কাপড়চোপড় ছাড়। চা খা একটু। রোহিণী স্টোভটা জেলে চা করে' দে একটু।"

রোহিণী চলে গেল পাশের ঘরে।

বাক্স খুলে কাপড় বার করে' নিয়ে পোষাক বদলে ফেললে প্রদীপ।

স্টোভে চায়ের পানি চড়িয়ে দিয়ে রোহিণী বাড়ীতে চলে এলো। মুখে হাতে সাবান দিয়ে এসে পরা কাপড়টা ছেড়ে একটা নীল রঙের তাঁতের শাড়ী বার করে' পরলে। চুল বাঁধলে যত্ন করে'। সিল্কের লাল টকটকে ব্লাউজটা পরলে। চোখে দিলে সরু করে' কাজলের রেখা টেনে। স্নো-পাউডার দিয়ে মুখখানা ঘষে মেজে শহুরে মেয়েদের মতো মনোলোভা করে' তুললে। ঘর ছেড়ে বেরুতেই তার মা বললে, "কে লা, কে এলো ?"

"দাদার বন্ধু।"

"কি নাম ?"

"প্রদীপ।"

"আমাদের জেতের তো ?"

"হাঁ মা, বাঙালী !—জলখাবার আছে কিছু, দাও তো।"

"আছে, দিচ্চি। তোর মামা এসে কাল দিয়ে গ্যালো, সবইতো পড়ে রয়েচে, খেইচিস্ কেউ ? তা তুই যে ফুলবিবি হয়ে সাজলি এখন, কোথাও বেরুস্নি যেন মা, তোর বাবা এসে বকবে।"

রোহিণী বিরক্ত হয়ে বলে, 'যাব কোথা ? লোকের সামনে ঐ কাপড়ে বেরোনো যায় ?"

"খুব বড় লোকের ছেলে বুঝিন্ ?"

"হাঁ মা। খুব বড়লোক। রান্নাবান্না একটু ভালো করে' করো। থাক— এতো মিষ্টি দিও না। ব্যাস্ ব্যাস্—এই থাক।"

"রান্না তুই করিস্। তোর দাদার বন্ধু, ভাল হলে তোরই যশ গাইবে।"

মায়ের দিকে ভেংচি কেটে দিয়ে মিষ্টির থালাটায় একটা চীনেমাটির প্লেট চাপা দিয়ে নিয়ে চলে আসে রোহিণী।

চা আর খাবার দিতে গেলে প্রদীপ আর রতন দু'জনেই তাকায় ওর দিকে। রতন খুশী হয়ে চোখ নামিয়ে নিয়ে একটা ছবি সংগ্রহের খাতার পাতা উল্‌টে যায়। ছবিগুলো সমস্তই প্রদীপের আঁকা।

প্রদীপ বলে, "বাঃ! চমৎকার! এই তো বাবা শহুরে মেয়েকেও মিতু

হার মানাতে পারো !—মানুষ একটু চেষ্টা করলেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে পারে ; এতে মনটাও সুস্থ থাকে। গ্রাম ভাল কিন্তু গ্রাম্যতা ভাল নয়।”

মিষ্টি করে' একটু হাসলে রোহিণী। বুঝলে লোকটির হয় একটু লজ্জাশরম কম, নয়তো তাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে পরিচয়ের স্বল্পতাটুকুকে কোনো আমল দেবার দরকার মনে করছে না আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নাগরিকতার সৌজন্যে।

রতন বলে, “এ ছবিটা কার রে, মিলির না ?”

“হাঁ। আমার বোন মিলি। ওর বিয়ে হয়েছে আই, সি, এস এক মাদ্রাজীর সঙ্গে।”

রোহিণীও দেখলে ছবিটা। বেশ দেখতে মেয়েটি। তবে একটু বেশী আধুনিকা যেন।

প্রদীপ বলে, “নাও, তুমিও খাও।”

রোহিণী সলজ্জভাবে বলে, “না। আপনারা খান।”

হঠাৎ এসে ঢোকে তারিণী।

পরিচয় করিয়ে দেয় রতন, “ইনি আমার বাবা। ও আমার বন্ধু, প্রদীপ।”

উঠে দাঁড়ায় প্রদীপ। পায়ের ধুলো নিতে যায় তাড়াতাড়ি রসগোল্লাটা গালের মধ্যে পুরে দিয়ে।

তারিণী ব্যস্ত হয়ে বলে, “থাক্ বাবা থাক্।—খাও তোমরা। তা, খবর ভালো তো বাবা ?”

“আজ্ঞে, আপনার আশীর্বাদে।”

“ভগবানের আশীর্বাদ বাবা।—রতন, শোনো বাবা এদিকে একটু। একটা কথা আছে।”

উঠে যায় রতন বাইরের দিকে।

প্রদীপের মুখের দিকে তাকায় রোহিণী। শত বরনের কলাপের পেখম মেলে বুকের রক্তে নাচতে আরম্ভ করলো হঠাৎ এ কোন্ ময়ূর ? প্রদীপ তাকায়। সম্মোহিত হয় বুঝি সেও। বিহ্বল দৃষ্টি দু'জনের। প্রথম দৃষ্টিতেই প্রেম নাকি ?

প্রদীপ বলে, “খাও, অন্তত একটা মিষ্টি, প্লিজ।”

রোহিণীর বড় লজ্জা করে। হাতে দিতে যায় প্রদীপ। সংকুচিত হয়ে পড়ে বলে, "না, না—আপনি খান। কি আশ্চর্য !"

"প্লিজ ! একটা।"

"দিন তবে !" দীপ্তচোখে তাকিয়ে হেসে হাত বাড়ায় রোহিণী। দুঃসাহসিক হতে সেও যেন কম জানে না।

"উঁহু ! হাতে হচ্ছে না !" দুষ্টুমি বুদ্ধি জাগে বুঝি প্রদীপের মনে।

লজ্জায় সংকোচে হাত টেনে নিয়ে একেবারে বোকা বনে' যায় যেন রোহিণী। ভাবে, লোকটা কি রে ! দাদা এসে দেখলে কি মনে করবে ?

"দেখি, হাঁ করো, এই—এই ব্যাস্।" মন্ত্রমুগ্ধের মতো গাল মেলতে যেন বাধ্য হয় রোহিণী। একটুক্ষণ মুখটা ঘুরিয়ে নেয় অন্যদিকে লজ্জায়। তারপর হাসে দু'জনে অদ্ভুত এক অব্যক্ত আনন্দে। সে হাসি যে তাদের মরণের হাসি তা বুঝতে আর বাকি থাকে না রোহিণীর।

রতন এসে পড়ে বলে, "উঃ ! কি হলো, হাসছো যে বড় ?"

প্রদীপ রোহিণীর দিকে চোখের ইংগিত করে' বললে, "না, কিছু নয়। একটু জল দাও রোহিণী।"

রতন চুপ করে' যায়। বোঝে, রোহিণী ওকে দেখে বিহ্বল হয়েছে। হওয়াই স্বাভাবিক। কোন্ মেয়ে না হবে তা, ওর অপূর্ব ঐ চেহারা দেখে ? তবে প্রদীপ হলো বহু মেয়েকে নাকাল করা শহুরে ছেলে। অতো সহজে ওকে বিশ্বাস করা ঠিক নয়।···

রতন বলে, "স্কুলের মাস্টারি করবি তাহলে দিন কতক ?"

"করি না, মন্দ কি। ছোট হোক্ বড় হোক্ একটা কিছু তো করা।"

"তোর বাড়ীর চাকরে যা মাইনে পায় তাই পাবি কিন্তু !"

"এইতো দাদা, সাম্যবাদের যুগ ! কি আর করা যাবে। খোরাকীর বদলে সেটা নাহয় তুই কেটে নিস্।···আসলে কি জানিস, মাস্টারিটা আমার কিছু নয়, এখানের মানুষদের নিয়ে ছবি আঁকবো, নিরিবিলিতে কবিতা লিখবো আর এই নীচুশ্রেণীর মানুষদের সাথে মিশে তাদের জানবো, পরে একটা কিছু লিখবো ওদের নিয়ে।"

রোহিণী বিস্ময়বিহ্বল চোখে তাকালে ওর দিকে।

রতন হাসলো শুধু।

প্রদীপ শুধোলে, "হাসছিস্ যে ?"

রতন সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলে, "এই নীচজাতের লোকদের নিয়ে লিখবি শুনে তাই হাসছি। ওদের সঙ্গে জীবনে জীবন যোগ করে' মিশতে বা ওদের জানতে পারবি তো ! নইলে নিজের মতলবে আর ওদের কিছু দূর থেকে জেনে খিচুড়ী পাকিয়ে জেলেদের বাস্তব-জীবন বলে ছেড়ে দিবি, কেউ হয়তো-বা পুরস্কারও দেবে, আমরা পড়ে হাসবো না কাঁদবো, ভেবে পাবো না। উলঙ্গ আদিম জীবনের লীলা-নিকেতন করিস্‌নে যেন জেলেদের গ্রামকে। তাতে তুই তৃপ্তি পাবি, পাঠক-পাঠিকার রক্তে আগুন ধরবে বটে কিন্তু আমাদের কি হবে তাতে ?"

প্রদীপ বলে, "বেশ তো, তুই আমাকে সাহায্য করিস্।"

রতন বলে, "সাহায্যের কি আছে ? ফটো তুলে লোককে ছাখাস্, তাহলেই হবে ! তার চেয়ে 'বাস্তব' আর কি আছে ?"

হেসে উঠলো রতন আর প্রদীপ।

রোহিণী চলে গেল বাড়ীতে রান্না করতে হবে বলে।

প্রদীপ বলে, "ও একটা কথার কথা বললাম। অন্যকাজ আছে আমাদের। বড় দায়িত্বের কাজ। মানুষের সর্বমুখী কল্যাণের পথ পরিষ্কার করবো আমরা।"...রীতিমতো বক্তৃতা আরম্ভ করলে এবার প্রদীপ।

রতন শুনে গেল নীরবে। শেষে বললে, "না, শুধু ভাঙার গান গাইলে চলবে না। গড়ার কাজই আসল কাজ। দেশের অন্ধকার দূর করবার জন্যে দেশের বুকে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার চাইতে তাকে আলোর মালায় সুসজ্জিত করা অনেক ভালো।"

এরপর রাজনীতি, সাহিত্য, ইতিহাস, গান্ধী, বিনোবা, রবীন্দ্রনাথ, টলস্টয়, ফ্রয়েড, কার্ল মার্কস্, এলোমেলো নানান আলোচনার মধ্যে ডুবে গেল দু'জনে।

কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নেই।

সন্ধ্যা হতে কখন একসময় আলো জেলে দিয়ে গেছে রোহিণী।

আবার একসময় খেতে ডাকতে এলে দু'জনে আলোচনার 'গাঁজা' ভঙ্গ দিয়ে

চললো তারা হ্যারিকেনের আলো ধরে এগিয়ে-চলা রোহিণীর পিছনে পিছনে। চারদিকে অন্ধকার। ঝিল্লী ডাকছে একটানা। আলো-লাগা নীল শাড়ী-পরা রোহিণীর গতিভঙ্গির মধ্যে অনবদ্য কবিত্বের রসে মগ্ন হয়ে যায় শিল্পী প্রদীপের মন। বুক তার ভরে ওঠে এখানকার এক বুনো ফুলের গন্ধে।…

॥ ১৫ ॥

অঘ্রানের শেষ। দীর্ঘ একটা মাস কেটে গেল।

চুণের কৌটা দিয়ে দিয়ে রেখেছে শকিনা বন-ঝুমকোর ফুল দিয়ে। তারার মতো আকার হয়েছে সারি সারি দাগগুলোর। সিন্ধু এসে রোজ একবার করে' গুণে ছাখে।

আজ এক কুড়ি পনোরো দিন হলো।

পাড়ার পরেশরা ফিরে এসেছে। কালো জেঁাকের মতো হয়ে গেছে চেহারা। খবর আনলে জয়নদ্দির মা গিয়ে। মাছ পেয়েছে সবে মণ আড়াই। জয়নদ্দিরা নাকি দিন পাঁচেক এক সঙ্গেই ছিল। তারপর বার দরিয়ার দিকে চলে গেছে—অনেক দূরে। সাগরে এ বছর দারুণ ঝড়তুফান। শেষের দিকে মাছ পড়ছিল। খোরাকী ফুরিয়ে গেল বলে চলে এলো পরেশরা। গদাখালির নন্দ হাজরা ভেদবমি হয়ে মারা গেছে। একটু হলে এক রাত্রে বাঘের মুখে পড়তো নাকি পরেশ। চরের ওপরে মাছ ঢালতে গিয়ে ছাখে, বসে বসে ম্যাচ্ ম্যাচ্ করে' মাছ খাচ্ছে! চোখ দুটো জলছে আগুনের মতন! পরেশের ভাই বলে, "বাঘ না হাতি! শ্যাল-ট্যাল হবে বোধ হয়। কিম্বা মাছ-বাঘরোল।"

গালে হাত দিয়ে বসে শোনে শকিনা। বলে, "ওরা আজও এলোনি কেন?"

"আল্লা জানে মা!" হাত উল্টে এক অদ্ভুত ভঙ্গি করে' হা-হুতাশ ছেড়ে বলে জয়নদ্দির মা।

ফুঁসে ওঠে যেন সিন্ধু, "আবার বারগঙ্গায় মরতে গেল কেন?"

"মরার নাম আনিস্?"—ঝাঁজিয়ে ওঠে শকিনা,—"আঁটকুড়ির কথা ছাখ না! যেরো—দূর হ এখেন থেকে!"

সিন্ধুর রাগ হয়। ফয়কর করে' চলে যায় জয়নদ্দিদের বাড়ী ছেড়ে।

খানিকটা দূর এলে সামনে পড়ে তার কানাই আর তরবদ্দি। ঘোমটা টেনে দেয় সিন্ধু। কানাই কি যেন বলে। খানিকটা শুনতে পায় সিন্ধু। খারাপ কথা। তরবদ্দি খল্ খল্ করে' হাসে।

সিন্ধু শুনিয়ে শুনিয়ে বলে যায়, "যে পোড়ার-মুখোরা আমার কথা কিছু বলবে তার মাথায় আ-ধোয়া ঝাঁটা মারবো!"

তরবদ্দি রাগে একবার থমকে দাঁড়ায়।

কানাই বলে, "বিষ নেই, কুলোপানা চক্কর!"

তরবদ্দি বলে, "ঘাড়ে লাথি মেরে চক্কর ভেঙে ফেলবোনি!"

শুনতে পেয়েও কিছু আর বলে না সিন্ধু। চলে আসে হন্‌হন্ করে' নিজেদের বাড়ীতে। এসে বসে পড়ে দাওয়াতে। গুম্ হয়ে থাকে কিছুক্ষণ। রাগে ফুলতে থাকে : তরবদ্দির ওপরে—কানাইয়ের ওপরে—শকিনার ওপরে—জয়নদ্দির ওপরে—শেষে হরেনের ওপরেও। ঘরে খোরাকী নেই এক মুঠো। ক'দিন থেকে দুয়েকখানা করে' রুটি খেয়ে খেয়ে উপোস দিচ্ছে সে। আজ গোটা কতক চাল ধার চাইতে গিয়েছিল শকিনার কাছে। তা, তাকে বললে কিনা 'বেরো—দূর হ এখেন থেকে?' খিদেয় পেটের ভেতরটা পাক দিচ্ছে সিন্ধুর। মাটিতেই চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো সে। ভাবতে লাগলো, ইলিশের মরশুমে অতো টাকা কামালে মিন্‌ষে চোখেও দ্যাখালে না। জয়নদ্দির কাছে নাকি জমা রেখেছে! তবু মেয়েমানুষের কাছে রেখে যাবে না! আসলে বোধ হয় মদ তাড়ি খেয়ে সব ফুঁকে দিয়েছে।...সত্যি, এখনো ওরা আসছে না কেন—নৌকো সমেত ডুবে গেল না তো?...বালাই ষাট!... কাশেমের বৌটার জমজ ছেলেমেয়ে হয়েছে।...না, খিদে সহ্য করা দায়! নোনা ইলিশের খান চারেক 'গাঁতা' নিয়ে পুঁইশাক দিয়ে রেঁধে খেলেও হয়। হাঁ, তাই করবে। উঠে পড়ে শাক কাটে সিন্ধু বঁটি দিয়ে রান্নাঘরের চাল থেকে। মাত্র একটা গাছই হয়েছিল তাদের। বসে বসে শাক কোটে আর ভাবে সে : কাল ওরা নিশ্চয়ই এসে পড়বে। না যদি আসে, থালাটা রূপোর মায়ের কাছে বন্ধক দেবে দু'টাকাতে দু' হপ্তার কড়ারে। সাগর থেকে এলে ছাড়িয়ে নেবে।...রঞ্জন বাবুর সঙ্গে কে ঐ লোকটা আসে? কি সুন্দর দেখতে! মালতী বললে, ইস্কুলের

মাস্টার। লোকটা একটু পাগলা মতন। ছেলেদের নিয়ে দৌড়োয়—নাচে—খেলায়। আবার ছবি আঁকে। যেমন লোক দেখবে তেমনি এঁকে দেবে! তরবদির আর জয়নদ্দির মা বুড়ীর ছবি এঁকেছে। তার যদি একটা আঁকে! মালতী বলে, 'তরবদিদাদা বলেচে ঐ মাস্টার 'মুচুম্মানের' ছেলে! তারিণীর বাড়ী থাকে আর তারিণীর মেয়ের সঙ্গে পীরিত করে। তরবদিদাদা বলেচে, ছেলেটা ভাল. ওদের খপ্পরে পড়ে খারাপ হয়ে যাবে। আবার শুনি রতনবাবুকে ঐসব ব্যাপারের কথা বল্‌তে, সে বলেছে নাকি, ওদের বিয়ে হবে! তারিণীর তো বাড়াবাড়ি অসুখ। কোলকাতা থেকে বড় ডাক্তার এনে ছ্যালো সিদ্‌নে। রতনবাবু বলে নাকি এখানের সমাজে না বিয়ে হলে 'কোর্টে' থেকে দলিল করে' বিয়ে হবে।···তারিণী বোধ হয় জানেনে। তরবদিদাদা খুব খুশী। বলে, হলে তো ভাল হয়। শালার মান যায়।'···

সব কথাতেই ওর 'তরবদিদাদা'!

তাই সিন্ধু বলেছিল, "তোর নাকি বর দেখেচে তরবদি, কবে বে' হচ্চে লো?"

মালতী গাল দিয়ে পালালো। সিন্ধু জানে, ওকে না তাড়াতাড়ি পার করলে আর বাঁচোয়া নেই। গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হবে। তরবদি লোকটা একেবারে যাচ্ছেতাই। মেয়েটার জীবনটাই নষ্ট করে' দিলে। ওর বাপও কিছু বলে না।

রান্না করে' পেট ভরে এক থালা তরকারী খেয়ে নিয়ে ঘরদোর এঁটে শুয়ে পড়ে সিন্ধু। মাথার কাছে কাটারীটা রেখে দেয়। হরেনের কথা ভাবে। ভাবে জয়নদ্দির কথা। কালই বোধ হয় তারা এসে পড়বে! কি চেহারা নিয়ে সব ফিরবে তা ভগবান জানে।—কী ভীষণ শীত পড়েছে বাবা!···

আলোটা নিভিয়ে দেয় সিন্ধু কাঁথাটা মুড়ি দিয়ে। গর্ভের মধ্যে স্পষ্টই অনুভব করে সে সন্তানের নড়াচড়া। কতো আশা আকাঙ্খায় মন ভরে ওঠে। সে মা হবে! ভাবতে ভাবতে একসময় কখন যেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

রাত বেড়ে চলে ক্রমে ক্রমে।

ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় দিগ্‌দিগন্ত।

ঘুমে অচেতন পৃথিবী।

রাত্রি গভীরা।

যমদূতের মতো কালো আর ভয়ঙ্কর চেহারার তিনজন লোক আনাগোনা করে হরেনের বাড়ীর চারপাশে। ছোট্ট টর্চের আলো ফ্যালে এখানে সেখানে। কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে। তারপর একসময় তারা ঘরের পিছনে গিয়ে সিঁদকাঠি দিয়ে দাগ মেরে সিঁদ কাটতে আরম্ভ করে। পুরোনো দেওয়ালের নোনাধরা নরম মাটি খসে পড়তে থাকে ঝুরঝুর করে'। ওরা কি চোর? কি চুরি করবে হরেনের ঘরে? দু'খানা থালা আর দুটো বাটি, পুরোনো হাঁড়িকলসি আর ছেঁড়া কাঁথাকাপড়? খানিকটা পরেই বড় একটা গর্ত হয়ে যায় দেওয়ালের নীচের দিকে। ওদেরই টর্চের অল্প একটু আলোতে ভাখা যায় তিনজনের মুখেই কালি মাখানো। চুণ দেওয়া চক্ষুবৃত্তের চারপাশে গোল করে'। নাকে চুণ দেওয়া। কপালে চুণের তিনটে করে' সরলরেখা টানা। ভূতের মতোই দেখতে যেন।

একজন আগে গর্তের মধ্যে একটা ঠ্যাং চালিয়ে দেয়। নেড়েচেড়ে ভাখে। পায়ে কিছু ঠ্যাকে কি না। তারপর একজন মাথা গলিয়ে আলো মেরে ভাখে ঘরের মধ্যে। মুখচাপা দিয়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে হরেনের বৌটা। তিনজনেই ঢুকে যায় ঘরের মধ্যে। কাটারীটা সরিয়ে ফ্যালে। একজন আলোটা জেলে দেয়। তবুও ঘুম ভাঙে না সিন্ধুর। কাঁথাটা খুলে ফেলে দিয়ে ডাকে একজন অদ্ভুত গলায়. "এই শালী, ওঠ্!"

"কে—কে!" সিন্ধু চীৎকার করে' উঠতে গেলে একজন তার গলাটা টিপে ধরে। ছুরির খোঁচা মারে!…"চুপ!"

আর্তনাদ করে' উঠে ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে' কাঁপতে থাকে সিন্ধু। বলে, "ওগো তোমরা আমাকে মেরো না গো! তোমরা আমার বাবা হও গো!"

একজন লাথি মারে, "ভাতার বল্ শালী!"

"ওগো মাগো—বাবাগো—মরে—গেনু—গো—ওগো আমাকে মেরো না গো! আমার পেটে ময়না আছে গো—মরে যাবে গো বাবারা—তোমাদের পায়ে ধরি।"

"চোপ শালী, মৎ কথা বলো।" আবার ছুরির খোঁচা। আর্তনাদ করে

সিন্ধু। হঠাৎ একসময় ঝেড়েমেড়ে উঠে ওদের একজনের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে গায়ের জোরে কামড়ে ধরলে অন্য আর একজন তাকে ছিনিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে মাটিতে পেড়ে ফেলে চেপে বসে সিন্ধুর পেটের ওপরে। ছুরি ছাখায়। ভয়ে সিন্ধু আমড়া ভ.মড়া চোখ বার করে' আর্তনাদ করে শুধু।

মদ ঢালে আর খায় কতকখন ওরা।

পাশবিক অত্যাচার চালায়।

বলে, "তরবদিকে চেনোনা শালী, ছাখো মজা! তোমার ভাতার কোথা? সে শালা থাকলে তাকেও ছু'টুকরো করে' যেতুন।"

ভীষণ যন্ত্রণায় একবার প্রাণপণে চীৎকার করে' উঠতে যায় সিন্ধু। গায়ের জোরে গলাটা টিপে ধরে একটা লোক বুকে বসে। কাপড় গুঁজে দেয় মুখের মধ্যে। মাতলামিতে তাদের পেয়ে বসেছে তখন। কি আনন্দ—কি ফুর্তি! মদের বোতলটা মেরে দেয় সিন্ধুর মাথায়। সিন্ধু ছট্‌ফট্‌ করে কতকখন। তারপর দম্ আট্‌কে যায়। নীরব। স্থির। কোনো প্রতিবাদ প্রতিরোধ নেই আর।

মেয়েটা যে মারা গেছে সে হুঁসও তাদের নেই তখন। তারা তখন কুকুরের মতো ভাগাড়ের মরা গরুর মাংস নিয়ে যেন ছেঁড়াছিঁড়ি কামড়াকামড়ি আরম্ভ করছে।

অনেকখন পরে যখন নেশার ঝাঁজ একটু জলো হয়ে এলো, দেখলে তারা, মেয়েটা মরে গেছে কখন! ভাবনা জুটলো মনে। ভয়ও হলো বোধ হয়।...টেনে বার করে' নিয়ে এলো তিনজনে ধরাধরি করে' সিন্ধুর দেহটা। বয়ে নিয়ে গেল খালধারের জঙ্গলের মধ্যে। ভাঁটা পড়ে-যাওয়া খালের কাদাপাঁক টেনে গর্ত খুঁড়ে সিন্ধুকে তার মধ্যে ফেলে তার ওপরে উঠে চেপে চেপে লেথিয়ে লেথিয়ে পাঁকের তলায় নামিয়ে দিলে। তারপর পাঁক টেনে ভাল করে' ঢাকা দিয়ে পানি ছেঁচে মিশ্‌মার করে' দিয়ে উঠে যে যার পালিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে কে কোথায় কে জানে!

ঘণ্টাখানেক পরেই জোয়ার এসে ভরে গেল খালের বুক। আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা-বাসনা সমস্তই শেষ হয়ে গেল সিন্ধুর। প্রাণহীন দেহটা তার পোঁতা রইলো খালের পানির নীচের চোরাবালির পাঁকের মধ্যে।

তারপর সকাল হলো।

শীতের সূর্য উঠলো জ্বরাগ্রস্ত রোগীর মতো কাঁপতে কাঁপতে।

কুয়াশা কেটে গেল ধীরে ধীরে।

॥ ১৬ ॥

খবর এলো সেইদিন সকালেই সাগর থেকে শুকটি ধরে ফিরেছে জয়নদ্দিরা।

গাঁওধারে ছুটে গেল শকিনা, জয়নদ্দির মা আর কাশেমের মা।

পচাশুকো মাছের দুর্গন্ধে চারদিক ভরে উঠেছে। জয়নদ্দির মা ছেলের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে চোখের পানিতে ভাসতে ভাসতে বলে. "এলি বাবা আমার! সোনা মানিক আমার। এতো দেরী হলো কেন বাবা? ই-কি চেহারা হয়েচে বাবা তোর?"

শকিনার সাথে চোখোচোখি হয় জয়নদ্দির। হাসে দু'জনে। স্বামীর চেহারার আহাল দেখে দু'চোখে পানি টল্‌টল্‌ করে শকিনার। তবুও হাসে একটু। কাশেম আর হরেন ঝোড়ো কাকের মতো কেমন বিছ্‌ছিরি হয়ে গেছে। মাথার চুলগুলো হয়েছে লাল-টাঁঙি বোমি পাটের মতো। চোখ ঢুকে গর্ত হয়ে গেছে। কাঁধের কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে পড়েছে ঠেলে।

জয়নদ্দি বলে, "শেষের দিকে বেশী মাছ পড়তে লাগলো তাই দেরি হলো মা। ভাত আর একবেলা রুটি খেয়ে তবে এ্যাদ্দিন কেটিয়িচি। মাছ পেইচি অনেক। ঐ ছাখোনা, নৌকোর খোল পেরায় ভর্তি। এতো মাছ বোধ হয় কেউ কক্ষনো পায়নে। দেখলেই লোকের চক্ষু চরকগাছ হয়ে যাবে।"

জয়নদ্দির মা কেঁদে হেসে বলে, "বাবা বদরগাজি মুখ তুলে চেয়েচে গো—মুখ তুলে চেয়েচে। বড় মোরগের 'হাজুত' শুধবো বাবার দরগায় পয়লা হাটের মাল বেচে এলেই।"

হরেন সিন্ধুকে দেখতে না পেয়ে বলে, "চাচী, তোমার বৌ কোথা? তাকে তো দেখচিনি?"

"কি জানি বাবা। কাল একবার মোদের বাড়ী এয়েছ্যালো। তোরা দেরী করে' ফিরতিচিস্ তাই বলেছ্যালো 'বার-গাঁঙে আবার মরতে গেল কেন ?' তাই মোর বৌটা কতো বকলে।—ঘরে আছে বুঝিন্। খবর পায়নে।—মাছ-গুনো, এই বস্তা এনিচি, তুলে ফ্যাল বাবারা—তিনজনেই লিয়ে যা—মুই এখেনে বসতিচি।"

ওদের পয়লা ক্ষেপ মাছ রাখতে আসবার সময়েই শকিনা আর কাশেমের মা চলে এলো। উঠোনেই মাছ ঢেলে দিয়ে যেতে লাগলো জয়নদ্দিরা। ক্রমে ক্রমে শেষপর্যন্ত উঠোন যেন ভরে উঠলো মাছে। পাড়ার লোক এলো দেখতে, মাছ দেখে গালে হাত দিলে। জয়নদ্দির কীর্তিই হলো আলাদা। ঈর্ষার চোখে তাকাতে লাগলো সকলে তার দিকে।

কাশেম বললে, "পয়রদ্দিরাও মেলাই মাছ পেয়েচে।"

জয়নদ্দি বলে, "নিআঁকড়ে নাহালে কুনো কাজ হয়নে। জেদ থাকা চাই। জয় করবো নাহয় মরবো। তবেইতো পুরুষমানুষের জীবন।"

হনে বললে, "তোমার মতো নিআঁকড়ের পাল্লায় যে শালা পড়বে তার জান নিয়ে টানাটানি!"

হাসলো সকলে।

মাছগুলো তখনি মেপে ফেলতে চাইলে জয়নদ্দি।

তার মা বললে, "না বাবা, উ-সব এখন থাক্‌দিনি। আর তোকে নিআঁকড়েমো করতে হবেনে! যা, গা ধুয়ে এসে খেয়েদেয়ে নিদ্ যা এট্টু। বিকেলে মাপিস্। মোরা বেছে আলাদা করে' ফেলি মাছগুনো।"

জয়নদ্দি বলে, "হাঁ মা, তেল-চাপটি, বোমলা, চিংড়ি, তরোয়াল, নিহেড়ে, রূপো,পাটি সব আলাদা করে' ফ্যালো। ভেক্‌টিগুনো এখনো কাঁচা রয়েচে। কি রকম বালি জড়িয়েচে খালি ভাখনা।—তা যাবার সময় 'আমলি'র ভাঁড়টা বুঝিন্ তুলে দিতে মনে ছ্যালোনি তোদের ? হরেন তো বমি করে' করে' মরে যাবার লক্ষণ কদিন! আমার আবার সর্দি-জরপানা ধরেচে। কপাল যেন খসিয়ে ফেলতেচে। গা গতর সব কামড়াচ্চে। যা তোরা, চলে যা—বিকেলে আ!সিস্।"

জয়নদ্দির মা বলে, "হাঁ বাবা, যা তোরা। কাশেমের বরাত ভাল, ঘরে যেয়ে ছাখ, সোনার চাঁদ এয়েচে তোর একজোড়া। মিষ্টি খাওয়াস্ মোদের।"

মাছ চুরি করার ভয়ে কাশেমের মা আর যায় না। মাছ বাছ্‌তে লাগে। বলে সে ছেলের হয়ে, "খাওয়াবো বুবু, চিঁড়ে মুড়কি খাওয়াবো, একুশে যাক।"

হরেন আর কাশেম চলে যায়।

একমাস বিরহভোগের পর শকিনা যেন কনে-বৌ হয়ে উঠেছে। তার চোখে আজ লজ্জা জড়ানো এক অদ্ভুত হাসি! স্বামীর গায়ে কপালে হাত দিয়ে ছাখে। আদর পেয়ে জয়নদ্দি শুয়ে পড়ে দাওয়াতে! গায়ে তার বালি-ধুলো, মাছের আঁশ আর আঁশটানি গন্ধ। কপালটা টিপে দেয় শকিনা। দু'জনে চোখো-চোখি হয়। হাসে। জয়নদ্দির ছেলেটা এসে উঠে বসে বাপের বুকের ওপরে। জয়নদ্দি তাকে একটু আদর করে। শকিনা হাসে, বলে, "বলো, বাব্বা! মিষ্টি এনে দও।"

ছেলেটা মায়ের কথার পুনরাবৃত্তি করতে চেষ্টা করে।

জয়নদ্দি বলে, "দোব দোব—এ্যাতো মিষ্টি এনে দোব।"

ছেলেটা দুই হাত প্রসারিত করে' ছাখায়—'এ্যাতো'—!

শকিনা বলে, "গরমপানি করে' দিই, গায়ে ধুয়ে ফ্যালো. ঠেণ্ডা লেগিয়ে কাজ নেই। জ্বর হতে পারে।"

উঠে গেল শকিনা। জয়নদ্দি ছেলেকে নিয়ে ছেলেমানুষি করতে লাগলো ছেলেমানুষের মতোই।

একটু পরেই হরেন ফিরে এলো। ডুক্‌রে কেঁদে উঠে বললে, "জয়নদ্দি-ভাইরে, আমার সব্বোনাশ হয়েচে!"

"কি, হয়েচে কি!"—লাফিয়ে উঠে পড়ে জয়নদ্দি।

হিঁ হিঁ করে' কাঁদতে লাগলো হরেন।

কৌতূহলী হয়ে উঠলো সকলে।

হরেন বলে, "আমার ঘরে সিঁদ কেটেচে! ঘরে বৌ নেই! খিড়কী, সদোর, ঘরের দোর সব বন্ধ! ঘরের ভেতরে রক্তের ঢেউ—মদের বোতল…!"

"এ্যাঃ! বলিস্ কি তুই!"—দাওয়া থেকে নেমে পড়ে জয়নদ্দি—"সিন্নু নেই!!"

"হায় আল্লা! কি হবে!"—কপাল চাপড়ায় জয়নদ্দির মা।

ছুটে যায় সকলে হরেনের বাড়ী। ঘরের পিছনে গিয়ে ভাখে হাঁ হাঁ করছে গর্ত্তটা! রাক্ষসের ভয়ঙ্কর হাঁ যেন একটা!

সমস্ত দেখে-শুনে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফ্যালে জয়নদ্দি।···মনে পড়ে তার সাগরে যাবার আগে বলেছিল সিন্ধু, তাকে নিয়ে পালিয়ে যাবার কথা! বলেছিল, ···"এসে আর হয়তো আমাকে দেখতে পাবেনে"···

সত্যিই তাই হলো!

মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠলো। এসব কার চক্রান্ত বুঝতে কি বাকি আছে তার? তখনি সে হরেনকে থানায় খবর দিয়ে আসতে বল্লে। প্রেসিডেন্টের কাছে লোক পাঠালে।

কিন্তু সিন্ধু কোথায়? তাকে কি দূরে কোথাও সরিয়ে ফেলেছে? ঘরে অতো রক্ত কেন? তবে কি মেরে ফেলেছে সিন্ধুকে? পাজি শয়তানটার টুঁটি ছিঁড়ে ফেল্‌বে তাহলে!··

"এই সরো সব। কেউ কিচ্চুতে হাত দিস্‌নি! পুলুশ আসুক। এই লে হরেন, পয়সা লে, রাস্তায় কিছু খেয়ে লিস্, খিদেয় মরে যাবি। শক্ত হতে হবে।" তারপর চীৎকার করে' ওঠে জয়নদ্দি, "যে শালা এমন করেচে, তাকে আমি একবার দেখে ছাড়ল্মো। গলায় পা তুলে দিয়ে জিব টেনে ছিঁড়ে বার করবো। আমরা গরীব বলে, 'মগের মল্লুক' পেয়েচে।"

কানাই এসে বল্‌লে, "তাইতো রে জয়নদ্দি, ই-রকম করলে তো মাগছেলে নিয়ে ঘরসংসার করা মুশ্‌কিল হবে আমাদের!"

জয়নদ্দি বলে, "রতনবাবুকে একবার ডেকে আনতো কেউ, আচ্ছা আমিই যাচ্চি।"

শকিনা বল্‌লে, "ওগো তুমি এখন গা হাত ধোও, এট্টু ঠেণ্ডা হও, ওরা যে-হোক্ যাক্।"

"এখন ঠেণ্ডা হবার সময়?" লাল চোখে একবার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠলো জয়নদ্দি। তারপর চলে গেল প্রায় ছুটতে ছুটতে গোঁ-ভরে একটা ক্ষ্যাপা ঝড়ের মতো!

বাড়ীর সামনে দু'একটা হাঁক দিয়ে রতনকে না-পেয়ে বাগানবাড়ীর দিকে

গেল সে। দেখলে রোহিণীকে অশোকতলার নীচে রোদে বসিয়ে কে একজন অচেনা লোক ছবি আঁকছে। হঠাৎ জয়নদ্দিকে দেখে রোহিণী যেন একটু চমকে ওঠে। সংযত হয়। বলে, "জয়নদ্দি-কাকা! সাগর থেকে কবে ফিরলে?"

"এই তো আজ, কিছুক্ষণ আগে। রতন বাবাজী কোথায়? উনি কে— চিনতে পারলুমনি তো মা!"

"উনি। হাসলো রোহিণী"—"আমাদের স্কুলের মাস্টার মশায়। দাদার বন্ধু। —দাদা এখুনি ছিল, ও-বাগানের দিকে গ্যাছে—ঐ যে আসছে।"

রতন এসে বলে, "কি জয়নদ্দি-খুড়ো, খবর কি, আজ ফিরলে নাকি? মাছ পেয়েছ তো?"

"হাঁ, আজ ফিরিচি বাবা, অনেক মাছ পেইচি। খবর সাংঘাতিক। হরেনের ঘরে গত রাত্তিরে সিঁদ হয়েছে। ঘরে রক্ত—মদের বোতল পড়ে আছে। হরেনের বৌ নেই।"

"সে কি!"—চম্‌কে ওঠে রতন খবর শুনে।

প্রদীপ আর রোহিণী হতভম্ব হয়ে যায়। হাঁ করে' তাকিয়ে থাকে।

রতন বলে, "চলো চলো—দেখি—থানায় খবর পাঠিয়েছে তো?"

"হাঁ।"

দুজনে চলে আসে। রতন বলে, "এতো সাংঘাতিক ব্যাপার! হরেনের বৌকে পাওয়াই যাচ্ছে না?"

"খুন করে' গাপ্‌ করে' দিয়েচে বোধ হয়।"

"কাউকে সন্দেহ হয় তোমাদের?"

"তয়রবদির কাজ। হরেণের ঐ বৌকে একবার চুরি করে' কাপড়-বেলাউজ দিয়ে অপমান হয়েছ্যালো আর অন্তলোকের লৌকো বাইতিচি বলে' মোদের ওপরে রাগ ছ্যালো। আমরা নেই দেখে এই সুযোগে মেয়েটাকে গাপ্‌ করে' দিয়েচে বোধ হয়।"

রতন অনেকখন কি যেন ভাবে। বলে "এই ক'দিন আগে দেখলাম

মেয়েটাকে—ঐ মাস্টারের আঁকা ছবি ভাখাতে গিয়েছিলাম তোমার মাকে—তোমার মায়ের একটা চমৎকার ছবি এঁকেছে প্রদীপ…তা, অসাধারণ যৌবন ছিল মেয়েটার।"

"হাঁ, সেইটাই তো ওর কাল হলো।"

রতন এসে গর্তটা দেখলে। বল্‌লে, "এর মধ্যে দিয়ে ঢুকে ঢুকে পায়ের দাগ করে' ফেলেছ তো সব? থাক্, পুলিশ আসুক, পরে দেখবো। দোর-টোর খুলোনা এখন।"

ঘুরেঘারে ভাখে সকলে এদিক সেদিক। কোথাও লাসের চিহ্ন পাওয়া যায় না।

"পেস্‌ডিণ্ডিবাবু নেই, কোলকাতায় গ্যাচে।" জয়নদ্দির পাঠানো লোকটা এসে বল্‌লে।

রতন চলে এলো জয়নদ্দিদের বাড়ী। মাছ দেখে অবাক হলো। বল্‌লে, "করেছ কি কাকা, মাছের পাহাড় করে' ফেলেছ যে!"

জয়নদ্দি বলে, "গত বছরে এ্যার সিকিও পাইনি।"

রতন বসে বসে কথা বল্‌তে লাগলো। জয়নদ্দি গা হাত ধুয়ে নিয়ে মা আর শকিনার পিড়াপিড়ীতে খেয়ে নিলে দু'মুঠো।

ঘন্টা দুয়েক পরে রতন যখন উঠি উঠি করছে, এলো থানার বড় দারোগা, ছোট দারোগা আর ছ'জন পুলিশ।

হরেনদের বাড়ীতে তাদের আনলে রতন।

দোর খোলা হলো পুলিশের সাহায্যে।

ঘর দেখলে দারোগারা। বিছানায় রাজ্যের কালো কালো চাপ চাপ রক্ত জমাট বেঁধে আছে। মদের বোতল গড়াগড়ি যাচ্ছে মেঝেয়। আর পড়ে আছে ভাঙা শাঁখাচুড়িগুলো।

বাইরে এসে সমস্ত বর্ণনা লিখলে দারোগা। চারদিকটা খোঁজতল্লাস করতে বল্‌লে পুলিশদের। পুকুরে জাল নামালে। কোথাও কিছু পাওয়া গেল না।

হরেনের সন্দেহমতো তরবদিকে ডেকে আনা হলো। সে এসে হেসে হেসে দারোগাকে সালাম করলে। দারোগাও হাস্‌লে।

বললে, "এহানে খুন হইয়াছে জানেন ত ?"

"আজ্ঞে, খুন !" —আকাশ থেকে পড়ে যেন তরবদি। "কই, তা তো জানিনি ! তবে যে শুনমু হরেনের ঘরচুরি হয়েচে ? তা বড়বাবু, এখেনে বসলে আপনি ? চলো আমার দলিজে। —খুন হলো,—এতো বড় সাংঘাতিক ! এমন কাণ্ড হলে দেশে বাস করা যে দায় হবে।"

দারোগা উঠলো। তরবদির সঙ্গে চলে গেল তার বাড়ীতে। যেতে যেতে ওরা ফিস্ ফিস্ করে' কি সব কথা বলাবলি করলে।

রতন নিরাশ হয়ে হাত উল্টে বললে, "কিস্সু হবে না ! মুখ শোঁকাশুঁকি আছে। কিছু টাকা খেয়ে চলে যাবে।"

জয়নদ্দি দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করে' বলে, "শালা দারোগার মাথা কাটালে হয় না ?"

হাসলে রতন, "তাতে আর কি হবে ? বরং তোমারই হাতে দড়ি পড়বে।"

"তরবদির তাহালে কিচ্চু হবেনে ?"

"হওয়া না হওয়া ওদের মতলব। সমস্তই টাকার খেলা কাকা। মানুষের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে এযুগে টাকার বদলে।"

গুম্ হয়ে থাকে জয়নদ্দি। হরেনকে নিয়ে, যায় একবার ওরা তরবদির ওখানে। গিয়ে ছাখে ডাব পাড়িয়ে পুলিশ দারোগাদের খেতে দিয়েছে তরবদি। তারা খাচ্ছে আর হাসিখুশী করছে। সিগারেট পান সামনে বসানো। তরবদি নিজেই এই শীতকালের দিনেও মোটা দারোগাকে হাওয়া করছে হেঁ হেঁ করে'। বোধ হয় তার বিধাতাকেও এতোখানি ভয়ডর বা খাতির করে না সে।

দারোগা বলে, "খাইবার গুর থাহে ত আন কিছু তরবদি ছাহাব। বালো গুর পাওয়া যাইতাছে না। কয়ডা জুনা নাইরকেল আর ডিমও দিব্যান।"

"পায়ের ধুলো ব্যাখন অধমের বাড়ীতে আপনি দিয়েচ বড়বাবু, সবই দোব। আমার অ-দেয়া কি আছে আপনাকে ?"

হরেন গিয়ে জড়িয়ে ধরলে বড় দারোগার দুটো পায়ে। কেঁদে উঠে বললে, "আমার কি হবে দারোগাবাবু ! আমার বৌ কোথা ?"

"আরে করছস্ কি বেটা ! লাস ত মিলতাছে না—পেরমান টেরমান না

পাইলে কার হাতে দরি দিমু! পাল্লাসুদ্ধ সবাইরে পাকরাইলা কি বালো হইবা ?"

"তাই তো—বটেই তো বড়বাবু!" —তোষামোদ করে তরবদি। —"তা কি কক্ষনো হয় ? বড়বাবু আমাদের সে-রকম লোক লয়। উনি হলো দেবতা।"

রাগে একাকার হয়ে বলে জয়নদ্দি, "গরীবের ওপরে তাহালে এমনি অত্যেচার হবে আর তার কুনো পিতিকার হবেনে হাঁ 'দেবতাবাবু' ? এটা কি মগের মুল্লুক হয়ে যাবে ?"

তির্যক চোখে তাকিয়ে দারোগা হাসে। পা নাচাতে নাচাতে ভুঁড়িতে দোল খাওয়ায় কিছুক্ষণ। তারপর বলে, "পিতিকার' হবে বইকি ! পেরমান ত্থাও !"

অল্পক্ষণের মধ্যেই তরবদির হুকুমে ছ'টা গুড়ের কলসি, এককুড়ি ডিম আর বারোটা ছাড়ানো নারকেল এসে হাজির হয়।

দারোগা বলে, "দামডা কত ওইতাছে একদিন থানা থেহে আইনো তরবদি মেয়া। আইজ আমরা উঠি, আছিপুইরা একডা কেশ আছে।"

দারোগা পুলিশরা চলে গেল। তরবদি একবার ছুটে বাড়ীতে ঢুকে আবার বেরিয়ে পড়ে পরনের খুলে-যাওয়া লুঙ্গিটাকে চেপে ধরে হন্তদন্ত হয়ে ছুটলো তাদের পেছনে।

চুপ করে' দাঁড়িয়ে সমস্তটা এতক্ষণ দেখছিল রতন। বল্লে, "এবার টাকা দিতে ছুটলো মিয়া সায়েব। এসো জয়নদ্দি-কাকা, চলে এসো। ওরা জানে-বোঝে সব। ওদের বোঝাতে যাওয়া পাগলামি। টাকা ছাড়া দয়া-মায়া দায়িত্ব-মনুষ্যত্ব কিছু বোঝে না। ওরা দেশের বুকে বসে হৃৎপিণ্ডের তাজা রক্ত চোষে। ওদের পিপাসা অনেক 'সিন্ধু'তেও মেটাতে পারে না।"

মাথা নীচু করে' গুম্ হয়ে দল বেঁধে ওরা সকলে চলে এলো।

সমস্ত গ্রামটা যেন থম্‌থম্ করছে ভয়ে—বিভীষিকায়।

স্কুলের বেলা হয়েছে—রতন চলে গেল। সে এখন মাস্টারী নিয়েছে বাওয়ালী হাই স্কুলের।

হরেন নিজের ঘরের মধ্যে বসে রক্তভরা বিছানাটাকে বুকে আঁক্‌ড়ে ধরে কাঁদতে লাগলো পাগলের মতো হাউ হাউ করে':

…"সিন্ধু! আমার সিন্ধু! তোকে ফেলে আমি কেন সাগরে গেছু—ও-হোঃ-হোঃ-হোঃ…তোকে আমি কোথা গেলে পাবো—কেমন করে' ভুলবো! আমার সিন্ধু! ও-হোঃ-হোঃ-হোঃ"…

সিন্ধুর দেহের রক্তগুলো নিজের হাতে তুলে মাখতে লাগলো পাগলের মতো। তারপর একসময় ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় শোকে-দুঃখে একাকার হয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।…

কিছুক্ষণ পরে এলো জয়নদ্দি! তাকে টেনে তুললে। সিঁদকাটা গর্তটা ভরাট করে' দিলে। ঘরদোর পরিষ্কার করালে। অনেক বোঝালে। বললে,—"যা একবার তোর ভায়রা-ভায়ের কাছে, তাকে খবর দে।"

জয়নদ্দিকে জড়িয়ে ধরে অনেকখন কান্নাকাটি করার পর ঘরদোর বন্ধ করে' কাঁদতে কাঁদতেই হরেন চলে গেল।

জয়নদ্দি মাথা হেঁট করে' ঘরে ফিরে আসতে আসতে বারকয়েক চোখের পানি পুঁছলে। নদীর ধারে গিয়ে মাথা গুঁজে বসে রইলো কতক্ষন। সিন্ধু! সেই প্রমত্ত-যৌবনা মেয়ে আজ কোথায় চলে গেল!…

একসময় ভাবলে সে নিজেই তরবদিকে খুন করে' জেলে যাবে। গ্রাম থেকে নিশ্চিহ্ন করে' দেবে শয়তানকে।…কিন্তু তার ছেলে-বৌ-মা…

সিন্ধু!…আবার কাঁদতে লাগলো জয়নদ্দি। না-না-না—এতবড় পাপকে সে সয়ে যেতে পারবে না। এর প্রতিকার করবেই। যাক্ ছেলে-বৌ-মা—যাক্ দুনিয়া আখেরাৎ।…

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে জয়নদ্দি মায়ের কথা মতো মাছ মাপতে বসলো কাশেমকে নিয়ে। কাশেমের ঘরে যে চাল নেই!

পাল্লা ধরলে জয়নদ্দি। কাশেম মাছ তুলে দিতে লাগলো।

শকিনা, জয়নদ্দির মা আর কাশেমের মা মাপা মাছগুলো ধরে নিয়ে রাখতে লাগলো নিজেদের তত্ত্বাবধানে। চার পাল্লা জয়নদ্দির। তারপরে এক পাল্লা হরেনের আর এক পাল্লা কাশেমের।

মাছ মাপা শেষ হতে না হতেই তিনজন পাইকের ঘুরে গেল। আট আনা সের দরে পাইকিরি দেবে কিনা। জয়নদ্দি বলে, "লুটের মাল না? পাঁচ সিকে

ডেড্ টাকা দু'টাকা সেরে চিংড়ি শুকটি বেচিস্ তোরা আর আট আনায় এই বাছাই মাছ পাইকিরি চাস্?"

পাইকেররা বলে, "মাছ তো এখনো তোমার কাঁচা। রাজ্যের বালি জড়িয়ে আছে।"

"থাক্। হবেনে—হবেনে। বাজারে বসে বেচবো। ভাগো সব।"

পাইকেররা চলে গেল।

আরো এক পাল্লা এমনি বেশী দিলে জয়নদ্দি কাশেমকে।

বখরা মাছ ধান শুকোনো বস্তায় করে' তুলে নিয়ে চলে গেল কাশেম খুশী হয়ে। হরেনের বখরাটা উঠোনের একপাশে মেলে দিয়ে ছেঁড়া ইলিশে জাল চাপা দেয় জয়নদ্দি। নিজেদেরগুলোও উঠোনের চারদিকে মেলে দিতে থাকে শকিনা আর তার শাউড়ী।

জয়নদ্দি বলে, "ভাল করে' চাপা দাও, ইঁদুর-বেরালে যেন একটা নষ্ট না করে। বহুৎ মেহনতের চিজ্!"

শকিনা একটা মাছ তুলে ধরে বলে, "ইটা কি মাছ গা—এতোবড়ো ঠোঁট?"

জয়নদ্দির মা বলে, "সাগরের কেকলেশ মা। জেলের ঘরের মেয়ে মাছ চিনিস্নি, তুই কি আভাগীর বেটি লো এঁ্যা!"

শকিনা বলে, "কে জানে বাবা, হাজার মাছ হাজার নাম, কে সব জেনে বসে আছে? তুমি কি করে' সব মনে রাখো তা আল্লা জানে!"

জয়নদ্দির মা বলে, "গাছের নাম, মাছের নাম, ধানের নাম, মানষের নাম, এ্যার কি কুনো সীমে আছে মা! কেউ হদ্দ-হদিস্ করতে পারবেনে।"

জয়নদ্দি হাত পা ধুয়ে এসে বসে বসে বিড়ি টানে আর ভাবে।

সাগরে যাবার একদিন আগের সেই সন্ধ্যা: সিন্ধু আলো নিভিয়ে দোরে বেড়া দিয়ে এসে বসেছিল তার পাশে।...সেই সিন্ধু গায়েব হয়ে গেল! ফিরে এসে সে নতুন করে' তাকে পাবে ভেরে কতো আনন্দে উৎসাহেই না সাগরে মাছ ধরেছে—ঝড়তুফানের সঙ্গে লড়াই করে'। পানিতে কুমীর, ডাঙায় বাঘ—সেসব ভয় তার মনকে কাবু করতে পারেনি। মন তার ভরেছিল সিন্ধুর যৌবনরসে—কানায় কানায়—কামনার আশায় কল্পনায়—দুর্বার—দুর্নিবার হয়ে। সেই সিন্ধুকে সে একবার চোখের দেখাও দেখতে পেলে না!...

শকিনা মাঝে মাঝে তাকায় তার স্বামীর দিকে। সেও ভাবছে সিন্ধুর কথা। …গ্যাছে বেশ হয়েছে। আবার ভাবে, নাগো, বেশ ছিল মেয়েটা। পেটে বাচ্চা ছিল নাকি তার ছ' মাসের! যারা মেরেছে তারা কি পাষণ্ড! …কাল তাকে 'বেরো—দূর হ' বলে তেড়ে দিলে বাড়ী থেকে। আজ এমন হবে তা কে জানে? তার যদি অমনি হতো? শিউরে ওঠে শকিনা। তরবদ্দির রাগ আছে তো তাদের ওপরেও।…'বেন' বলে যখন তখন আসতো তার কাছে! ভাবতে ভাবতে শকিনার চোখেও পানি এলো।

সিন্ধুর বড়দিদি বিন্দু আর তার ভগ্নিপতিকে নিয়ে হরেনের ফিরতে সাঁজ-বাতি জ্বলে গেল।

বিন্দু চীৎকার করে' কাঁদতে কাঁদতে এলো পাড়া মাথায় করে'। পাড়ার মেয়েরা জড়ো হলো। কিছুক্ষণ জটলা হলো আবার হরেনের বাড়ীতে।

সবাই চলে গেলে, বিন্দু থামলে, হরেন একটু শান্ত হলে, জয়নদ্দি বলে, "মাছ আনবিনি?"

জয়নদ্দির মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেঁদে ওঠে আবার হরেন, বলে, "মাছ নিয়ে কি করবো দাদা,—কে খাবে?"

তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সান্ত্বনা দেয় জয়নদ্দি, "চুপ কর ভাই, চুপ কর—তোর কান্না আর আমি সইতে পারিনি! সবুর কর—ভগবানকে ডাক—সে-ই সব ঠিক করে' দেবে!"

"ভগবান? ভগবান নেই জয়নদ্দি-দাদা! থাকলে এই অত্যেচার সইবে কেন?"

"আছে রে আছে। নিশ্চয় আছে। বিশ্বাস আন। মনে বল আন। এতো লোকের বৌ মরে যায়, কই কেউ পাগল হয়েচে?"

"মরার মতন মরলে দুঃখু ছ্যালোনি বেই, চোখের দ্যাখাও দেখতে পেন্নুনি তাকে। যাবার সময় কতো কাঁদতে রইলো। যে ভয় সে করে' ছ্যালো তাই ঘটলো। —শালাকে আমি খুন করবোই করবো। আমার জেল হয় ফাঁসি হয় যা হয় হবে।"

"চুপ কর—চুপ কর! অতো উতালা হলে চলেনে। আরো দু'একদিন খোঁজখবর নিয়ে দ্যাখ,—কাঁচা রক্ত ছড়িয়ে দিয়ে যদি কোথাও সরিয়ে

দিয়ে থাকে। যে মেয়েমানুষের ওপরে লোভ থাকে তাকে কি জানে মেরে ফ্যালে কেউ ?”

হরেনের ভায়রা-ভাই বলে, “তোমাদের গেরামটা এ্যাতো খারাপ ? এ্যাতো সাংঘাতিক !”

ম্লেষের হাসি হাস্‌লে জয়নদ্দি, বল্‌লে, “গেরাদের দোষ নেই দাদা। দোষ গেরামের মাথাওলাদের। অনেক গেরামই এই রকম। তবে আমাদের এই জেলে-বাগ্দিদের গেরামে মানুষ কে আছে যে অন্যায় হবেনে ?— মানুষ হতে হলে লেখাপড়া শিখতে হবে। জ্ঞানগম্য—ইয়ে, মানে কথা— জ্ঞানগম্যটা চাইই। আমাদের ভেতরে তো সেসবের বালাই নেই। তাই কুকুরের মতো খেয়োখেয়ি—মারামারি—এর বৌকে টানাটানি—ওর বৌকে গায়েব করা—থানা-কোর্ট—মাওলা-মোকদ্দমা—হাজত-জেল—এই তো আমাদের আবস্থা ! আমাদের ধর্ম গ্যাচে, মান গ্যাচে, এজ্জৎ গ্যাচে, লজ্জা-শরম জ্ঞানগম্য সব গ্যাচে, তার বদলে পেইচি কি, শুধু হিংসা, দলাদলি, চোকোল খুরি, ভাঁড়ামি, গোঁয়ারতুমি—পেইচি শুধু লোভ লালসা - তাড়ি মদ্ মেয়েমানুষ ! তবু বল্‌বো আমরা মানুষ ? হাঁ বল্‌বো। কেননা এখনো মাকে মা বলে ডাকি—বৌকে ভাত দিই—সংসারের দায়িত্ব আছে—ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে হবে—কিন্তু আমাদের ঝাড়বংশ নিপাত করে' দিলে বাঁচি কি করে' ? দুঃখ কষ্টের পায়ে মাথা 'কুড়লে' কি বাঁচা যায় ? রতনবাবু বলে, “আমাদের সব ব্যবস্থা গোলমাল হয়ে গ্যাচে। আমাদের সারা গায়ে বিষের ঘা। চোখে ছানি পড়ে' গ্যাচে। এই চোখের ছানি আগে তুল্‌তে হবে। নইলে আলো কাকে বলে চিনবো কি করে' ?” আমি বলি, 'বিষ যে ছড়াচ্চে এসো তাকে নিপাত করি।' সে হাস্‌লো। আর কথা বল্‌তে পারেনে। জানি তার শক্তি নেই—সাহস নেই—সে শুধু ভাল ভাল কথা—বইয়ের কথা বক্‌তে পারে। শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজেনে। কাজ চাই। কাজ। তুমি মারবে অন্যায় করে' আর আমি শুধু ভগবানের নাম করে' সইবো—তুমি আমার বৌয়ের এজ্জৎ নেবে, আমি চুপ করে' কাঁদ্‌বো ভাগ্য বলে—এ হতেই পারেনে।”…

আরো কিছুক্ষণ নানান কথা বলে ওদেরকে একরকম শান্ত করে' বাড়ীতে এলো জয়নদ্দি। আশ্বাস দিয়ে এলো, একটা বিহিত হবেই হবে। নইলে তার জীবনপণ।

পচা শুক্‌টি মাছের দুর্গন্ধে বাড়ীঘর ভরে উঠেছে।

তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া সেরে নেয় জয়নদ্দি।

অনেকদিন পরে স্বামীকে কাছে পেয়ে বুকে টেনে নিয়ে আনন্দে আবেশে বিভোর হয়ে যেতে চায় যেন শকিনা। অনেক টাকার মাল রোজগার করে' এনেছে তার স্বামী। কতো কথা বলে। কিন্তু লক্ষ্য করে, কেমন যেন মনমরা আর অন্যমনস্কভাব জয়নদ্দির। ঠাট্টা করে। খোঁচা দেয় একটু, "সিন্ধুর জন্যে মন কেমন করতেচে বুঝিন্?"

বিরক্ত হয় জয়নদ্দি। বলে, "হাঁ, করতেচে, হিংসুটে মেয়েমানুষ, সরে যা!" নড়া ধরে একটু সরিয়ে দিতেই ছিট্‌কে তিনহাত দূরে সরে যায় শকিনা। অভিমানে রাগে ফুল্‌তে থাকে চুপ করে' পড়ে। তার অভিমান ভাঙায় না আর জয়নদ্দি।

রাত কেটে যায়।

রাগে সাতসকালে উঠে পড়েই শকিনা মশারির কোণগুলো না খুলেই চটপট করে' ছিঁড়ে ফেলে দেয়। ছেলেটাকে হেঁচাহিচি করে' টেনে তুলে কাঁদায়।

জয়নদ্দি চেঁচিয়ে ওঠে, "দোব শালীকে ঝাঁ্যাটারবাড়ি যা কত্তেক। বিষ ছেড়িয়ে দোব।"

"ওঃ! ঐ বা মুয়েরই সাপোট আছে!" পদ্মগোখরোর মতো হিস্‌হিস্ করে' ওঠে শকিনা।

"তবে র‍্যা!" জয়নদ্দি উঠে পড়তেই ছেলেকে উল্টে ফেলে দিয়ে দৌড় মারতে যায় শকিনা। কিন্তু চৌকাটে ঠোক্কর লেগে কাপড়ে বেধে আছাড় খায় পটাস্ করে'!

জয়নদ্দি খুশী হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, "ইয়া আল্লা—ইয়া আল্লা!"

জয়নদ্দির মা-বুড়ী হন্তদন্ত হয়ে উঠে পড়ে ছুটে আসে বিছানা ছেড়ে, 'কি হলো কি হলো করে'।

শকিনা নাকে কাঁদে। খুশী হয়। উঠে এসে স্বামীর পিটে একটা কীল্ মারে। জয়নদ্দিও আদায় করে' নেয় তার বদ্‌লি। ছেলেটা তার মায়ের অবস্থা দেখে ভয়ে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে পালিয়ে যায় তার দাদির কাছে। দাদি চক্ষুলজ্জা এড়াবার জন্যে তাকে নিয়ে চলে যায় পাড়ার দিকে।

দুপুরে খেয়েদেয়ে স্কুল দেখতে গেল জয়নদ্দি।

নতুন স্কুল। ঝক্‌ঝক্ করছে। ছেলেও জুটেছে ষাটসত্তরজন। ভেতরে, দেখলে একজন বুড়ো মতো লোক, রোহিণী আর রতনের বন্ধু সেই ছবি-আঁকা-লোকটা মাস্টারি করছে। ওদের দু'জনের মধ্যে একটা মধুর সম্পর্ক দানা বেঁধেছে বোধ হয়। কাল সকালে বসেছিল যেভাবে তাতে তা-ই মনে হয় জয়নদ্দির। লোকটাকে দেখতে খুব ভাল। মানাবে বেশ বিয়ে হলে। অন্যমনস্কভাবে সেখান থেকে চল্‌তে চল্‌তে গেল সে ভাগ-চাষে নেওয়া জমিটার দিকে। ধানগাছগুলো অনেক জায়গায় ঘূর্ণি হাওয়ায় চোরা পাক্‌মেরে শুয়ে পড়েছে। কাটতে কষ্ট দেবে। গোড়ার নল পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে। কালই কাটতে আরম্ভ করে' দিতে হবে। আট দশমণ ধান আর কাহন চারেক বিচুলি পাবে। মাস পাঁচেকের খোরাকী হবে আর খড়টা বেচে ঘরের কাঠামো বদলে ভাল টালিখোলা চাপাবে। বারকুঁচির বিনয় পালের খোলা আন্‌বে। ইলিশমারির খাতির মোল্লার কারখানার খোলা একদম বাজে —নোনা ধরে। কিন্তু ওদের কারখানায় গেলে নামাজী মুসাল্লি ম্যানেজার ইয়াকুব আলী লোকটা বেশ খাতির করে। খাতির মোল্লার কারখানার ম্যানেজার কিনা, তাই!…হেসে ওঠে জয়নদ্দি আপন মনেই।

জমি দ্যাখা শেষ করে' ট্যাক্ থেকে একটা পান বার করে' গালে পুরে বিড়ি ধরিয়ে টানতে টানতে গেল নদীর ধারে।

নৌকোটা ধুয়েপুঁছে গামছা পেতে শুয়ে পড়লো পৌষের মিঠেল রোদ্দুরে। নৌকোর গায়ে ঢেউয়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। দূর থেকে হাঁক শোনা যায় ফেরি নৌকোর মাঝির, "যাবে—যাবে, হীরেপুর, নলদাঁড়ি, বুড়ুল, বাগাণ্ডা—।"

ঘুম জড়িয়ে আসে জয়নদ্দির চোখে। মধুর ঘুম। মিষ্টি ঘুম।…

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে যখন তখন ঘুম ভাংলো জয়নদ্দির। উঠে বসলো। কয়েকটা শিয়াল পানির ধারে ধারে মাছ কিংবা কাঁকড়া খুঁজে ফিরছে ছুটোছুটি করে'। গর্তের মধ্যে ওরা ল্যাজটা গুঁজে দেয়, কাঁকড়া কামড়ে চিপ্‌টে ধরলে একটান মেরে বার করে' নিয়েই দেয় এক কামড়। ডিঙ্গিনৌকো জাল ফেলে ভেসে চলেছে। জোয়ার লেগেছে গাঙে। বড্ড শীত শীত করছে জয়নদ্দির। গামছাটা গায়ে দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে বাড়ীর দিকে চলে আসে। পথে এক জায়গায় চা খায়। ছেলে আর মায়ের জন্যে মিষ্টি কেনে। শকিনার জন্যে কেনে ঝালফুলুরি। আসতে আসতে আবার ভাবে, কাল থেকে ধান কাটতে শুরু করবে।

তরবদির দলিজে কানাই গুলে আর কেলো ভুট্‌ভাট্‌ করে' কথা বলছে তরবদির সঙ্গে। কান পাতে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে।

তরবদি বলছে, "ঐ তো, একশো টাকার পঞ্চাশ টাকা গেল দোকানের দেনায়। বাকি পঞ্চাশ টাকা দিয়ুন্‌।"

কানাই বলে, "না চাচা, ওতে হবেনে। আরো দিতে হবে।"

জয়নদ্দি আর দাঁড়ালে না। ওদের কি সব হিসেব হচ্ছে। একটু এগিয়ে আসতেই টর্চের আলো পড়লো তার পিঠে। তরবদি দেখছে, কে যায়। কিছু আর বলে না। ওরা সবাই চুপ!

তবু কেমন যেন ভয় করে জয়নদ্দির। কোকাক অন্ধকার। চল্‌তে চল্‌তে বার বার পিছনে তাকায়। কেউ নেই। পাখীর ডানা ঝট্‌পট্‌ করে। আকাশের তারাগুলো মিট্‌মিট্‌ করছে শয়তানের চোখের মতো। ঝিল্লী ডাকছে একটানা। বাঁশবন। জমাট অন্ধকার। এখানেই সিন্ধু একদিন তাকে জড়িয়ে ধরেছিল, ভয় ভাখাতে!...থমকে দাঁড়ায় জয়নদ্দি।...সাপ ডাকছে...কি সাপ ওটা? চন্দুরে বোড়া!...তাড়াতাড়ি চলে এলো জয়নদ্দি।

পরদিন বেলা দশটার সময় মাতাল অবস্থায় কানাই এসে তার কাছে কাঁদতে আরম্ভ করে পায়ে জড়িয়ে ধরে।

"ভাইরে...আমাকে...জুতোরবাড়ি মেরে মেরে ফেলচে শালা...তরবদি! তোর সঙ্গে যেতি ত্যাখন থাকতুন্‌...তাহালে মোর এই দশা হয়? শালা দোকানের দেনার নাম করে...আমার সব টাকা ঝেড়ে দিয়েচে।...বললে

তিনজনে ঐ কাজটা কর, একশো টাকা করে' দোব। হাঁ একশো টাকা করে'। কাজ ফুরোতে বলে পঞ্চাশ টাকা নে। দোকানের দেনায় পঞ্চাশ টাকা কাটা গেল। গুলে আর কেলোকে তবে একশো টাকা করে' দিলে? কেন, তারা কি বাবা হয় তোর…"

চট্ করে' ধরতে পারলে জয়নদ্দি। বললে, "ই-টাতো একাবারেই অন্যায়। আচ্ছা আচ্ছা, তারিণীর কাছে চ'—নৌকো করে' দোব। কাল থেকে ধান কাটবি মোর সাথে। ছেলেবেলা থেকে মোরা একঠিঙে কাজ করনু, তোর ওপরে মোর একটা 'ময়া' নেই? চ'দিনি, এক্ষুনি যাই তারিণীর কাছে।"

জয়নদ্দি কানাইয়ের গলা জড়িয়ে ধরে পিয়ার করতে করতে নিয়ে গেল তারিণীদের বাড়ীতে। রতনকে দেখে চোখ ইসারা করে' বললে, "রতন বাবাজী, একে একটা লৌকো দও তো। আমি টাকা দোব। একাবারে ওর নামেই লিখে দেবে।…কাজটা করলে ওরা, গুলে আর কেলোকে লগ্দা একশো টাকা করে' দিলে আর ও-বেচারী গরীব বলে একেবারে 'অগেম্বাজ্জি'! দোকানের দেনার বদলি নাকি পঞ্চাশ টাকা কেটে লিয়েচে। তরবদ্দির এই কি আক্কেল হলো?"

রতন বললে, "লোকটা একেবারে বেইমান!"

চেঁচিয়ে উঠলো কানাই, "ওই কথা বাবা…'বেইমান' বলেছেনু বলে…জুতোর বাড়ি… মারলে আমাকে। আর বললে…যা শালা…আমার নৌকোয় আর উঠিস্নি।"

রতন বললে, "ভয় নেই। নৌকো আমি দেবো। জালও দেবো। জয়নদ্দির সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করবে। কিন্তু কানাই-কাকা, ওদের একশো টাকা করে' দিলে কেন?"

কানাই বললে, "ওরা যে ওর বাবা হয়—তাই! শালা, এক কাজ করনু তিনজনে—বলে, বলিস্নি—জান চলে যাবে! বলবেনে, শালাকে ফাঁসিতে ঝোলাবো!"

রতন বলে, "চুপ চুপ, আস্তে! সব খুলে বলোদিকিনি কি হয়েছে। আমি তোমাকে পঞ্চাশ টাকা দিচ্ছি। বেইমান তরবদ্দি যা-ই দিক্। বসো টাকা আনছি।"

বাড়ীর মধ্যে চলে গেল রতন।

জয়নদ্দি বলে, "দেখলি এরা কতো ভালো লোক। টাকাকে এরা টাকা বলে গণ্য করে? ঐ জন্তেই তো তরবদিকে ছেড়ে এনু মুই।"

লাঠিতে ভর দিয়ে বেরিয়ে এলো তারিণী। সালাম করলে তাকে জয়নদ্দি। বড় কাহিল হয়ে পড়েছে বেচারী। এসে কানাইয়ের সামনে বসলো।

বললে, "কাজ করিয়ে টাকা দেয়নে তরবদি? হে!—'শালুক চিনেচে গোপাল ঠাকুর।' আমার কাছে আসতে তোদের কি হয়? ঐ যে, জয়নদ্দি এলো, ওর উন্নতি হয়নে? না, কানাই আমাদের লোক হিসেবে খুব ভাল। মন্দলোকের পাল্লায় পড়ে খারাপ হয়ে গ্যাচে, না কি বলো জয়নদ্দি-ভাই?"

"আজ্ঞে, সেই তো হলো কথা! পচা চিজের ঐতো দোষ, সে একলা পচা বলে একধারে পড়ে থাক্‌বে যে তা লয়, সব্বাইকে পচিয়ে তবে ছাড়বে—সেইটিইতো হলো আরো খারাপ।"

রতন টাকা এনে হাতে দেয় কানাইয়ের। কানাই খুব খুশী হয় অনেকগুলো টাকা হাতে পেয়ে।

তারিণী বলে, "ওদের কি দোষ, ওরা হলো হুকুমের চাকর, আসল দোষ তো তরবদির। তা মেয়েটা বেঁচে আছে তো, না, একেবারে সাফ্‌?"

কানাই আমতা আমতা করে প্রথমে, পরে বলে, "আজ্ঞে আমাকে মারবেনে, জেলে দেবেনে?"

"না না কেউ কিচ্চু করতে পারবেনে।"—সাহস দেয় তারিণী—"আমি আছি, তোর জন্তে যেত টাকা যায় যাবে। তরবদিকে জব্দ করা চাই। নাহলে কোনদিন আবার তোর বৌটাকে অমনি গাপ্‌ করে' দেবে।" হেসে কটাক্ষ হান্‌লে তারিণী জয়নদ্দির দিকে।

কানাই বলে, "তা শালার গুণে ঘাট নেই। হরেনের বৌ সেই খালের গেঁয়োবনের ভেতরে পাঁকে পোঁতা আছে!"

শুনে শিউরে ওঠে ওরা।

জয়নদ্দি বলে, "দ্যাখাতে পারবি? তোকে আমরা সবাই বাঁচাবো। ভয় নেই। যা হয় তরবদির হবে।"

মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় কানাই। হাঁ, দ্যাখাবে সে!

সঙ্গে সঙ্গে তখনি সাইকেলে চেপে রতন প্রেসিডেন্টের কাছে গেল। ধরে আনলে প্রেসিডেন্ট আর চৌকিদারকে। কানাইকে নিয়ে এলো হরেনের বাড়ীর পিছনে। সাড়া পেয়ে বাইরে এলো হরেন।

বনের মধ্যে দিয়ে সকলকে নিয়ে এলো কানাই। খালের ধারে আকাট জঙ্গল। এক জায়গায় একটু ফাঁকা মতো। চারদিকে গেঁয়োবন। জোয়ারের পানি সরে গেছে এই কিছুক্ষণ মাত্র আগে। কানাই একটা ঢিল ছুঁড়ে ছাখালে। বললে, "ওই যো, ওখেনটাতে।"

প্রেসিডেন্ট বললেন, "নাবো, লাস ছাখাও। তুলতে হবেনা। কাদা সরিয়ে লাসটা ছাখাও শুধু। কোনো ভয় নেই, বরং পুরস্কার মিলবে তোমার।"

জয়নদ্দি ভরসা দিয়ে বললে, "যা—ভয় কি! তোকে কেউ কিচ্চু বলবেনে।"

নেমে যায় কানাই। নেশা তখন তার কেটে গেছে। আন্দাজ মতো জায়গায় মাড়িয়ে মাড়িয়ে দেখে কাদা টানতে আরম্ভ করে। একটু পরেই একটা হাত টেনে বার করে সিন্ধুর।

হরেন চীৎকার করে' কেঁদে ওঠে, "সিন্ধু! আমার সিন্ধু!"...

হরেনকে টেনে সরিয়ে নিয়ে যায় দু'তিনজন।

কানাইকে উঠে আসতে বললেন প্রেসিডেন্ট। একটা চিঠি লিখে চৌকিদারকে থানায় পাঠালেন তিনি তখনি।

ঘণ্টা দেড়কের মধ্যেই থানার দারোগা পুলিশ এসে পড়ে। কানাইকে দিয়ে লাস টেনে তোলায়। ফুলে ঢোল হয়েছে সিন্ধুর শরীরটা। জিব বেরিয়ে আছে! গায়ের এখানে সেখানে সাদা সাদা কাটা দাগ। পেটটা ফুলে উঠেছে অসম্ভব রকমে।

ভয়ে কাঁপতে থাকে কানাই।

দারোয়া প্রশ্ন করে, "কে কে কইরাছস্ এই কাম?"

"গুলে, কেলো আর আমি হুজুর!"

"ক্যান করলা?"

"আমাদের মাহাজন তরবদি মাঝির হুকুমে। একশো করে' টাকা দেবে বলে ছ্যালো।"

দারোগা হুকুম দেয় গুলে, কেলো আর তরবদিকে বেঁধে আনতে ছোট দারোগা পুলিশ নিয়ে চলে যায়।

রতনের নির্দেশ মতো পুলিশদের পুবদিক্ দিয়ে এনেছিল চৌকিদার। পশ্চিমদিকে ওদের তিনজনেরই বাড়ী। ওরা কেউ জানতে পারেনি তখনো।

তিনজনকে বেঁধে পিটতে পিটতে আনলে ছোট দারোগা। তার রাগ ছিল তরবদির ওপরে। সেদিন সে যে সব গুড় নারকেল ডিম টাকা দিয়েছিল সবই বড়বাবু আত্মসাৎ করেছে। তাকে কিছুই দেয়নি।

ওদের আনতে বড়দারোগা উঠে পড়েই রুলের বাড়ি গায়ের জোরে সৌঁটাতে আরম্ভ করলে।

তরবদি চ্যাঁচাতে লাগলো, "বড়বাবুগো—মরে গেনু,—এট্টু পানি খাবো!"

ছোট দারোগা বলে, "গালে পেচ্ছাব করে' দে শালার। পেচ্ছাব করে' দে। টাকা দিয়ে তুমি মানুষ খুন করাও শালা?"

ওদের মার দেখে ভয়ে কানাই হাউমাউ করে' কাঁদতে থাকে। তাকে তাড়া দেয় দারোগা। লাথি মারে,—"চুপ শালা!"

চুল ধরে টেনে তুলে আছাড় মারে ছোট দারোগা গুলেকে। হাঁটুর হাড় বেরিয়ে পড়ে কেলোর।

তরবদির স্ত্রী ছুটে আসে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে। তার হাত ধরে টেনে সরিয়ে দেয় দারোগা, "ভাগ মাগী! পরের বৌকে যখন গলাটিপে মেরেছিল সে পানি চায়নি? তার স্বামীর কেমন হচ্ছে?"

মার দেখে ছুটে পালায় অনেকে। সরে আসে রতন, তারিণী আর প্রেসিডেন্ট। হঠাৎ হরেন ছাড়া পেয়ে তরবদির ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে গায়ের জোরে টিপে ধরে তার গলাটা। মেরেই ফেলবে সে তরবদিকে। পুলিশরা তাকে টেনে ছাড়াতেই নাজেহাল হয়ে পড়ে।

কাঁচা বাঁশ কেটে খড় দিয়ে বেঁধে একটা খাটুলি তৈরি করা হলো। সিন্দুর কাপড় চাপা লাসটা ওদের দিয়েই তোলালে তাতে। পানি আর বিড়ি খাইয়ে আবার ঘা কতক করে' পিটে নিলে। তারপর ওদের চারজনের কাঁধে তোলালে খাটুলি।

সবাই হৈ হৈ করে' উঠলো : "তরবদি কাপড় খারাপ করে' ফেলেছে মারের ধমকে।" —কে একজন চীৎকার করে' উঠলো, "বলো হরি হরি বোল হরি।"

রতন এসে ইংরেজিতে কি যেন বললে ছোট দারোগাকে। ছোট দারোগা হেসে নমস্কার করলে। তারপর কানাইয়ের ট্যাঁক থেকে পাকানো টাকার বাণ্ডিলটা খুলে নিলে।

জয়নদ্দি বুঝলে এবার ব্যাপারটা।

রতন বললে, "আচ্ছা রগড়! টাকাটা দিতে বললুম, উনি ঝেড়ে দিলেন।"

তারিণী বললে, "নিক্ তো বাবা নিক্। ওই-ই বেশী মেরেচে, ওটা ওর পুরস্কার!"

জয়নদ্দি বলে, "তরবদিকে যা মেরেচে দেখলে চোখে পানি থাকেনে।"

তারিণী বলে, "বিচারে এখন কি হয় ছাখ। সবই টাকার খেলা রে দাদা।"

রতন বলে, "এ-কেশে জামিন দেবেনা খুব সম্ভব। যতদিন না বিচার শেষ হয় এখন হাজতে পচুক। তবে ওরা মেনে গ্যাছে, আর আসামীও সব ধরা পড়েছে। তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা হবে জানিয়েছে বড় দারোগা। জয়নদ্দি-কাকার আর আমার সাক্ষীটা কাটিয়েছি বলে-কয়ে। আর কানাই তো বলছে তরবদি আমাকে মারতে ফাঁস করে' দিইচি সবাইয়ের কাছে। দারোগা কবে চার্জ সিট্ দেয় ছাখো।"

ওরা সকলে যে যার বাড়ী চলে গেল।

জয়নদ্দি হরেনকে ধরে নিয়ে গেল তার বাড়ীতে। জোর করে' চাট্টি মুড়ি খাওয়ালে মিষ্টি দিয়ে। তারপর কাশেম এসে খাওয়ালে খানিকটা তাড়ি। নেশায় ভুলে যাক্ বেচারী সব কিছু!

তারপর কাস্তে নিয়ে তিনজনে চলে এলো ধান কাটতে। যাবার সময় জয়নদ্দির মা হরেনের গায়েমাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, "কি আর করবি বাছা, মনে বোধ দিয়ে সহ্য সবুরি কর। বেটাছেলে—আবার সংসারধর্ম করবি। বৌ গ্যাচে, হাজার বৌ মিলবে। মেয়ের অভাব নেই সমসারে।"

হরেন ভাবে তা হয়তো সত্যি! কিন্তু যে গেল তাকে তো আর পাওয়া যাবে না? তাকে ভুলতে পারে কই?

ওরা ধান কাটছে, এলো পয়রদ্দিরা। উল্লাসের সঙ্গে হেঁকে বললে, "বাঁচালি

দাদা মোদের। শালা, হাতী কাদায় পড়েচে ···খুনটা গাপ্ করে' দিয়ে ছ্যালো এট্টু হলে। শালার জেল হোক—মোরা এখন কিছুদিন মনের সুখে লৌকো-গুলো বেয়ে লিই। শালা যেতি আর জেল থেকে না ফেরে তো খুব ভাল হয়!"

জয়নদ্দি ওদের বিড়ি দেয়। পয়রদ্দি জয়নদ্দির হাত থেকে কাস্তেটা নিয়ে ধান কাটতে লেগে যায় মহা ফূর্তিতে। কি করে' আর কেনই বা সব কথা কানাই ফাঁস করে' দিলে সে সব কথা জয়নদ্দিকে খুলে বলতে বলে সে।

জয়নদ্দি দু'আঁটি বিচলি তুলে নিয়ে আলের ওপরে চেপে বসে সবিস্তারে সমস্ত বলে যায়।

শেষে কাশেম বলে, "তরবদি বল্লে বলেই ক'টা টাকার জন্যে একটা মানুষের জান লিয়ে লিলে ওরা? আমাকে যেতি কারু ঘরে কেউ আগুন লাগাতে বলে লেগিয়ে দোব?"

"চারপো পাপ পুরো হলে মানুষের কি আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে? গেরামটার বদনাম ছড়িয়ে গেল চারদিকে।"—দুঃখ প্রকাশ পায় জয়নদ্দির কথায়।

পয়রদ্দিরা চলে গেল একটু পরেই।

কয়েক দিনের মধ্যে ধান কাটা, 'এঁটোনো' (আঁটিবাঁধা), তোলা-ঝাড়া শেষ করে' আদ্দেক ধানখড় আরিণীদের দিয়ে আসে জয়নদ্দি। নৌকো নিয়ে কখনো সখনো ভাড়ায় যায় নারকেল, খড়, ধান বা পাটের। ভরাকোটালের সময় জালে যায় আজেবাজে কোনোকিছু মাছের লোভে।

পৌষ মাস যায় যায়।

হাড়ে কামড়ানো জাড় পড়েছে এবছরে।

জয়নদ্দি ভেবে রেখেছে সামনের বছরে দু'খানা নৌকো আগাম টাকায় নেবে। পারেতো আর একখানা জাল তৈরি করবে। মাঘ মাস এলে তাদের ইলিশ মারির চরের গাঁঙধারের 'যাতের মেলা'য় বসে শুকটি মাছগুলো খুচরো বেচবে গিয়ে বসে বসে।

গুড়ের জন্তে কয়েকটা খেজুরগাছ মুড়ো দিয়ে কাটছিল সে। কিন্তু রোজই কে রস চুরি করে' খায়। তাই চোরকে জানে শেষ করে' দেবার মতলবে খালধার থেকে গেঁয়োগাছের আঠা আনতে গিয়ে দেখলে করোমচা গাছটার নীচে কিসে যেন পানিকে পাকাচ্ছে মাঝে মাঝে। বিরাট কোনো কিছু নিশ্চয়ই। মাছ, না কুমীর? বসে বসে অনেকখন দেখলে জয়নদ্দি। কিছুই বুঝতে পারলে না। আঠা তোলা ফেলে রেখে সে ঘরে ফিরে এসে বাঁশের জটলাই কেটে মোটা আর খুব শক্ত সুতোয় এক জোড়া কামারে বড়শী খাঁটিয়ে একটা কোলাব্যাঙ গেঁথে বেশ জম্পেশ করে' করোমচা গাছের সঙ্গে বেঁধে 'জাওলা' দিয়ে এলো সন্ধ্যার সময়।

ভোরভোর গিয়ে ভাখে খালের পানিতে বাঁশ জটলাইটাকে টেনে ডুবিয়ে রেখেছে কিসে আর করোমচা গাছটাকে ঝাঁকাচ্ছে মাঝে মাঝে!

সর্বনাশ!

কুমীর নিশ্চয়ই!

গাছে উঠে জাওলাটা একটু টেনে ভাখে, ওরে বাপ! গরুর মতো টান্ মারে যে!

জয়নদ্দি ছুটে এলো কাশেমের কাছে। খবর শুনে ছুটে এলো অনেকে। সবাই আন্দাজ করলে কুমীর।

জয়নদ্দিকে সবাই গাল দিতে লাগলো: "শালা এক কাণ্ড করেচে বটে!"···

ধীরে ধীরে ভাঁটার টান পড়ে খালের পানি কমতে পিঠের কাঁটা জাগলো। তারপর সবাই দেখতে পেলে সেটা কুমীর নয়—'ভেক্‌টি' (ভেকুট) মাছ। জোড়া কাঁটাই আটকেছে তার জোড়া ঠোঁটে। কাবু হয়ে পড়েছে সারারাত টানাটানি করে'। জয়নদ্দি টেনে তুল্‌লে তাকে ওপরে। তারপর নিয়ে এলো বাড়ীতে। পাড়ার সবাই নিতে চাইতে, তিন টাকা সেরে কেটে ভাগিয়ে দিলে জয়নদ্দি। মোট মাছ হলো একত্রিশ সের! অবশ্য কাশেমকে একসের, রতনদের দু'সের মাছ সে এমনি দিলে। কতক দাম পেলে, কতক বাকি রইলো। ঘরে রাখলে তিনসের। তবু তো পঁচাত্তর টাকার মাছ এমনি পেলে সে! সবাই বল্‌লে, জয়নদ্দির বরাত ভাল!···

হঠাৎ খবর শুনলে সকলে, তরবদি ফিরে এসেছে অনেক টাকার জামিন নিয়ে

নাকি! চেহারা একেবারে গলে' গেছে। বাইরে বার হয়নি মোটে। কিন্তু জামিন হতে গেল কে? তরবদির শ্বশুর নাকি?

হরেন শুনে ছুটে এলো জয়নদ্দির কাছে। ভয় হয়েছে তার। যদি তাকেও আবার জানে মেরে দেয়?

জয়নদ্দি বলে, "শালাকে তাহ'লে সাবাড় করে' ফেল্‌বো'ন!"

তরবদি কিন্তু চুপ। কারো সঙ্গে কোনো কথা বলেনা সহজে। দোকানে বসে থাকে আর হুঁকো টানে। মাথার চুল তার উঠে গেছে অধিকাংশই।

মাঘ মাস এলো।

'যাতের মেলা' বসলো। গোটা চর জুড়ে দীর্ঘ একটা মাসের মেলা। যাত্রা, সার্কাস, পুতুলনাচ, ম্যাজিক, নাগরদোলা, মিষ্টি দোকানের সারি, মনিহারি দোকান, জুয়াখেলা, মাছ, কাঁচা আনাজের হাট, চীনে বাদামের রাশি—শানাই বাজনার তোরণ—হাজার হাজার লোক—হাজার রকম চীৎকার! আর এ মেলায় চুলউল্টানো কোনোএক প্রেম-পিয়াসী ছোক্‌রা হয়তো কোনো যুবতীর গায়ে হাত দিয়ে পাঁচজনের হাতের বখ্‌শিস্ খেয়ে নাস্তানাবুদ হয় রোজই।...

হরেনকে নিয়ে রোজই মেলায় শুক্‌টিমাছ বেচতে যায় জয়নদ্দি।

মেলার হাট সেরে ফিরছে, রতনের সঙ্গে একদিন দেখা:

সে বল্‌লে, "রোহিণীর বিয়ে হয়ে গেল খুড়ো!"

"সে কি গো! আমরা কই জানলুমনি, একমুঠো খেতে পেলুমনি তবে!" বলে জয়নদ্দি হাসতে হাসতে।

রতন বলে, "আরে বাবা, সেকি সামাজিক বিয়ে? গোপনে। কোর্ট থেকে লেখাপড়া করে'।"

"তোমার বাপ জানেনে?"

"না!"

"ঐ মাস্টারের সঙ্গে তো?"

"হাঁ। বাবার কাছে কাল ওর সঙ্গে রোহিণীর বিয়ের কথা তুলতে রেগে গিয়ে চুপ করে' রইলেন। আমি বল্‌লাম, বিয়ে তো দিতে হবে, ছেলে কোথা?

নিজেদের জাতের মধ্যে লেখাপড়া জানা ছেলে কই? তাছাড়া প্রদীপ যে রাজী হচ্ছে সেই তো ওর ভাগ্য।"

"কি বল্লে তারিণী-দাদা?"

"কিছু বলেননি। চুপচাপ আছেন। ভাবছেন বোধ হয়, সমাজ কিভাবে নেবে।"

জয়নদ্দি বলে, "লেগিয়ে দও বাবা, লেগিয়ে দও! সমাজের মাথা তো তোমরাই। যে-শালা যা বলবার বলুক-গে। অতো বড়টা মেয়ে ড্যাম্ ড্যাম্ করে' ঘুরে বেড়াবে সহ্য হয়নে দেখতে।"

হাসে রতন। বলে, "বিয়ে তো ওদের হয়েই গ্যাছে। বাবার মত হলে আবার বিয়ের অনুষ্ঠান হবে। নইলে একদিন প্রদীপ রোহিণীকে নিয়ে চলে যাবে। বাবা তখন চ্যাঁচালে বলবো ওদের বিয়ে হয়ে গ্যাছে লেখাপড়া করে'। ব্যাস্!"

"কাল গিয়ে বেটির কাছ থেকে মিষ্টির দাম আদায় করে' আসতে হবে। হাঁ বাবা, তোমার মা মত আছে?"

"ওরে বাবা! প্রদীপ সেদিকে ওস্তাদ আছে। মা ওকে দারুণ ভালবেসে ফেলেছে!"

"তবে আর কি, আমিই ফাঁস করে' দোব।"

"না না। বুঝে সুঝে।"—রতন চলে যাচ্ছিল হাসতে হাসতে। আবার ডাকলে জয়নদ্দি।

বল্লে, "তরবদির 'জাবিন' হবেনে বললে, তবে ফিরে এলো কি করে'?"

রতন বল্লে, "কি জানি বাবা, আইনের কোথায় কি গেড়াকল আছে। তবে কানাইদের ব্যাপার শুনছি, সবাই নাকি মেনে গ্যাছে। সাজা ওদের অনিবার্য। কাল আবার কোর্টে গিয়েছিল তরবদি। নামকরা উকিল দিয়েছে নাকি। বলেছে সে খুন করতে হুকুম দেয়নি। নৌকোর মহাজনী বখরা দেয়নি বলে ওদের মার দিয়েছিল আর সেই রাগে তার নাম বলেছে। তারপর খুব টাকা ঢালছে, কি হয় বলা কঠিন। দারোগার রিপোর্টে ওর সম্বন্ধে কি আছে কে জানে!"—রতন চলে গেল।

ভাবতে লাগলো জয়নদ্দি। ভাল উকিল দিয়েছে। মানে, যে হয়কে নয় করে' দিতে পারে সেই তো হলো ভাল? এদের তিনজনের দিক থেকে কোনো

উকিল-টুকিল দেওয়া হয়নি—এরা যে গরীব—হতভাগ্য—ক'টা টাকার লোভে জীবন দিতে গেল! তরবদির টাকা আছে—তার বল আছে। তার কথা অনেকেই শুনবে।

সারা শীতকালটা যাতের মেলায়, হাটে বাজারে বসে সমস্ত শুক্‌টি বেচা শেষ হলো জয়নদ্দির। মাঝি হয়ে সে মেছোর কাজ করছে বলে অনেকেই তাকে নিন্দে করলে কৃপণ বলে। করুক। পরোয়া করে না জয়নদ্দি ওদের।

পথে সামনাসামনি একদিন দ্যাখা হলো তার তরবদ্দির সঙ্গে।

তরবদি বলে. "কিরে জয়নদ্দি, কি 'ফাস্‌কি' দিলি আমার? তাদের তিনজনেরই তো জীবনভরের সাজা হয়ে গেল।"

"তোমার টাকার জোর আছে. তাই কিচ্চু হলোনি।"—বলে জয়নদ্দি স্পষ্ট কথায়।

"তবে কুন্‌ সাহসে লোকে লাগতে যায় আমার সঙ্গে? এবেরে দেখে ছাড়বো কার কতো বিদ্যে।"

জয়নদ্দি বলে, "চাচার সাহস আছে। জেল-গেল নাইলেও যেরকম মেরে তোমাকে হেগিয়ে ফেলেছ্যালো ভাবলে মোরা হলে আর 'দেখে ছাড়বার' কথা মুয়ে আনতুনি! তোমার ভয়ে তাহালে ঘরের চাল কেটে পালাতে হবে বলো মোদের?"

লালচোখ বার করে' কট্‌মট্‌ করে' তাকায় তরবদি।

জয়নদ্দিও সোজা হয়ে দাঁড়ায়। বলে, "আমার কাছে বেশী রোখ দেখিওনি, আমি তোমার ঘরের মাগ নয়, ভাল হবেনে!"

ভয় পায় যেন তরবদি। মাথা নামিয়ে পাশ দিয়ে চলে যায় হনহন্‌ করে'।

হা হা করে হাসিতে ফেটে পড়ে জয়নদ্দি। আবার ফিরে তাকায় তরবদি। দাঁতে দাঁত ঘষে। জয়নদ্দি আবার হাসিতে ফেটে পড়ে। তার সঙ্গে হরেন এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল, মাতালের মতো গোঁ ধরে। জয়নদ্দি লোকদেরকে বলে, "ওর মাথাটা আজকাল আবার একটু গণ্ডগোলপানা হয়ে গ্যাচে বৌয়ের

কথা ভেবে ভেবে। শুম্ হয়ে থাকে সবসময়।”—জয়নদ্দি শুধোলে, “চিনতে পারলি, কে?”

মাথা কাৎ করলে হরেন। তারপর গম্ভীরস্বরে বললে, “ভগবান নেই! বিচার নেই! আমি বিচার করবো!”

পরদিন থেকে বদ্ধ পাগলামির লক্ষণ প্রকাশ পেলো হরেনের।

হাসে নাচে গড়ায়।

জয়নদ্দি বলে, “শালা মাগ-পাগলা হয়েচে।”—হঠাৎ ন্যাংটো হলে মারে জয়নদ্দি ঘা কতেক।

ছেলেরা লাগে হরেনের পেছনে। কাঁধে চাপে, কাদাধুলো মাথায়।

মাঝে মাঝে হরেন গিয়ে বসে তরবদির দোকানে।

তরবদি তার পিঠে পা ঘষে বসে বসে। হরেন হাসে—গড়ায়। তরবদি ওর গায়ে থুথু দেয়। সেই থুথু নিয়ে হরেন মাথায় মাখে। লোকে হাসে।

তরবদির বৌ ঝাঁটা দিয়ে পেটে গালাগালি করে, আবার দয়াপরবশ হয়ে কখনো বা দেয় চাট্টি মুড়ি। হরেন কথা বলে না, মাঝে মাঝে চীৎকার করে' ওঠে দুর্বোধ্য ভাষায়। তারপর কতকখন ধরে বুক চাপড়ায় পটাস্ পটাস্ শব্দ করে'। ডিগবাজি খায় দুটো তিনটে।

কিন্তু জয়নদ্দি জানে, ও মোটেই পাগল নয়। ওর একটা সাংঘাতিক উদ্দেশ্য আছে। তরবদিকে ও খুন করবে তাল পেলেই। একেবারে শেষ করে' দেবে! একদিন জয়নদ্দি তাকে আড়ালে পেয়ে জিজ্ঞেস করলে, “কি হলো, দেরী করতিচিস্ কেন?”

হরেন বলে, “তালে পাচ্চিনি যে মোটে। সবসময় যে-হোক না যে-হোক থাকে।”

“তোর কষ্টভোগও হচ্চে খুব! এমন ভেল্কি লেগিয়েচিস্ যে কেউ ধরতে পারেনে। জানে শুধু রতন। সে বলে, ‘না না খুনের দরকার নেই।’ আমি বলিচি, ভাখো বাবা, তুমি আর যাই বলো, শুনবো—উ-কথা শুন্‌বোনি। অতোবড়ো পাপ আমরা ক্ষমা করতে পারবোনি। অতোবড়ো অন্যায়কে যে সইবে সেও মহাপাপী হবে। শুনে রতন চুপ।”

হরেন বলে, “কাল তার সাথে ভাখা হয়েছ্যালো। বললে, ‘আচ্ছা

আচ্ছা, আর নাচতে হবে না, খানিকটা সন্দেশ খা।' আমি খানিকটা খেনু আর খানিকটা মাথায় মাখ্‌নু!"

ওরা দু'জনে হাসলে খুব হি হি করে'। জয়নদ্দি গোটাচারেক রুটি দিয়ে চলে গেল।

ঝোপের মধ্যে বসে বসে খেতে লাগলো হরেন। তারপর একটু আরাম করে' শোবার কথা মনে হলো। সেই সঙ্গে মনে হলো ঘরের কথা। ঘর!··· পড়ে আছে ভূতের বাসার মতো। কোনো সন্ধ্যাতেই আর সাঁজবাতি জ্বালে না সিন্ধু! ফুঁ দেয় না শাঁখে। নীরব। অন্ধকার। ভূতের বাসা। হয়তো সিন্ধুর প্রেতাত্মাটা রোজ রাত দুপুরে এসে তার পেটের সন্তানটার জন্যে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে।···হরেনের ভয় করে ওঘরে বাস করতে। রক্ত—কান্না— চীৎকারে ভরা ও-ঘর!

উঠে পড়ে হরেন। খানিকটা ধুলো মাখে গায়ে মুখে। শীত শীত করছে বড্ড; তরবদির গোয়াল ঘরটার পাশে পড়ে থেকে মশার কামড়ে জ্বর ধরলো নাকি? চিত্তোড়ে বাঁধা ছ'ইঞ্চি ফলাওয়ালা ধারালো ছুরিখানাকে হাত লাগিয়ে অনুভব করলে একবার।

তারপর পাগলের ভঙ্গি করে' টলে টলে চলে গেল হরেন তরবদিদের বাড়ীর দিকে। এখন যেন সে সত্যই পাগল।···মন্ত্রের সিদ্ধির বদলে শরীরের পতন হয় হোক।

॥ ১৭ ॥

গালে হাত দিয়ে জ্বলন্ত লম্ফটার সামনে বসে থাকে দুঃখিনী মা আর দুর্ভাগা অকালে কপাল-পোড়ানো মেয়ে। কানাইয়ের বৌ লক্ষ্মী আর মেয়ে মালতী।

দু'জনের চোখেই গড়াচ্ছে পানি। তারি মধ্যে পথ খুঁজছে তারা, কি হবে— কি হবে! ঘরে একমুঠো অন্ন নেই। ছোট ছেলেটা শুকিয়ে শুকিয়ে মারা

গেল ! বুড়ো শ্বশুরটা মরি মরি করেও মরেনা। মেয়েটাকে নিয়ে পড়েছে আরো শোচনীয় সংকটে। কুমারী-গর্ভে তার যে গোপন পাপের বীজ অংকুরিত হয়েছে, দিনে দিনে বড় হয়ে তা এবার বাইরের আলো-বাতাসে মুক্তির দাবি জানাবে।

পাড়ার লোকের মধ্যে কেউ কেউ জানতেও পেরেছে। রূপোর মা নাকি গুণীন, মন্ত্র-বলে বেঁধে রাখবে, ন'মাস দশ দিন হয়ে গেলেও সহজে আর বাচ্চাকে মুক্তি পেতে হচ্ছে না ! সে এক মহাযন্ত্রণা !...

তরবদিও আজকাল আমল দেয় না।

লক্ষ্মী জিজ্ঞেস করে, "তরবদিকে বললে কি বলে ?"

মালতী দুঃখে লজ্জায় একাকার হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে, "সে মোটে স্বীকার করেনে। বলে, তোর বাপের কাজ।"

জলে ওঠে লক্ষ্মী। বলে, "ঐ কথা বলে ! তবে এক কাজ কর। কাল আমার তোলা-করা শাড়ীটা পরে এট্টু ঠাস-ঠমক দেখিয়ে ভোলা যেয়ে। যেই পোড়ারমুখো মিনষে তোকে নিয়ে ন্যাংভ্যাং করবে অমনি ঝাড়বি ভোঁড়ে ছুরি। নাড়ীভুঁড়ি বার করে' দিবি। সুতোকাটা সেই 'ধারানো' ছুরিটা নিয়ে যাবি। জীবনটা তোর তো এমনিই যেতে বসেচে,—ছেলেটা হলে কে তোকে বে' করবে—গেরাম থেকে তেড়ে বার করে' দেবে। পথে পথে ঘুরে না-খেয়ে মরবি। ঐ কালা-মুখোর জন্যে তোর বাপ জেলে গ্যাল। পারবিনি ? লোকে ধরলে পেটের কাপড় খুলে দ্যাখাস—বলিস্ আমার এই সব্বোনাশ করেচে। স্বীকার করেনে আমাকে নেয়নে। পারবিনি ?"

মালতী কান্নাভরা গলায় বলে, "ওযে আমাকে আর ত্যামন-চোখে দ্যাখেনে। ত্যাখন তোমরা ও খারাপলোক জেনে শুনেই তো ওর কাছে আমাকে পাঠাতে ! এ্যাখন আমার কি হবে ! বাবা জানতো বলেই তো তরবদি অমন কথা বলে, 'তোর বাবার কাজ' !"

কর্কশস্বরে গর্জে ওঠে লক্ষ্মী, "তুই তাহলে পারবিনি ?"

ভয়ে এতোটুকু হয়ে গিয়ে কাতরচোখে মায়ের মুখের দিকে তাকায় মালতী। ভয়ে ভয়েইবলে, "পারবো মা, পারবো !"

"পারতেই হবে। ওর জন্যে সবাই গেল। তোর বাপ, গুলে, কেলো,

হরেনের বৌ—আর হরেনও তো যেতে বসেচে পেরায়, তারপর তুই, তোর পেটের ছেলে—সব গেল—সব যাবে। মা হয়ে তোকে বলচি, তুই ওকে মার, পাপ হবেনে, স্বগ্যে যাবি, পুণ্যি হবে। তুই মেয়ে, তোকে আর সবকথা আমার খুলে কি বলবো, ও হলো পাপী দুর্যোধন, ওর ওই রকম মরণই ভাল।”

মাহিন্দ-বুড়ো কতক্ষণ ধরে কাশে। খক্ খক্—খকোর খকোর—খক্ খক্-

শিয়াল ডাকে হুয়াহুয়া স্বরে রাত্রির নৈঃশব্দতাকে চিরে।

রাতচরা পাখীদের ডানার ঝট্‌পটানি শোনা যায় বাঁশবনের মধ্যে।

ঝিল্লী ডাকে ক্রু ক্রু শব্দে একটানা।

আলো নিভিয়ে দিয়ে চুপ করে' পড়ে আছে লক্ষ্মী আর মালতী। মা আর মেয়ে। কারো চোখে ঘুম নেই।

কাকজ্যোৎস্নার ঘোলাটে অন্ধকারে কোদালে-কাটা মেঘেঢাকা চাঁদটাকে কেমন যেন রহস্যময় দ্যাখায়। মাহিন্দ-বুড়ো আবার কাশে। কাঁদতে থাকে।

...“গেলি রে ব্যাটা গেলি, আমাদের মড়া-‘শ্মশনে’ বসিয়ে রেখে গেলি। এই বুড়ো বয়সে আমি কি করবো!” মেয়েদের মতো এবার শুধু কেঁদে চলে বুড়ো একটানা—ভাষাহীন স্বর বা সুর শুধু সে।

অতীত দিনের স্মৃতিগুলো ডিগবাজি খেয়ে চলে লক্ষ্মীর মনে। বলে যায় সে আপন মনেই:

“মিনষে আমার খুন হজম করতে পারলেনে—সেদিন রাত্তিরে এসে কেমন করতে লাগলো—জিগেস করতে বললে, ‘মহাপাপ করিচি—হরেনের বৌ আমার ভাদ্দর-বৌ হয়, তাকে মেরে ফেলে পুঁতে রেখে এইচি খালের নীচে। বলি কি, সব্বোনাশ করে' এয়েচ গো!...সে আর ঘুমোতে পারেনে—ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলো—বলে খালি, মহাপাপ করিচি—চোখ বুজলেই দেখি সিন্ধু-বউ তেমনি বড় বড় চোখ বার করে' বলে শুধু, ‘ওগো বাবারা আমাকে ছেড়ে দও—আমার পেটে ময়না আছে! তারপর মিনষে কি কান্না! অনেক করে' বুঝিয়ে ভয় দেখিয়ে মাথায় জল চাপড়ে তবে ঠেণ্ডা করি। তার পরদিন রাত্তিরে যেতি তরবদি না মারতো—যেতি সব টাকা দিত, এমন কাণ্ডটা ঘটতোনি। সারা-রাত মিনষে দাপাদাপি করলে—মাথায় ‘অক্ত’ চড়লো। হরেনের কষ্ট দেখে তার নাকি বুক ফেটে যাচ্চে—মহাপাপ করেচে সে—শাস্তি না পেলে তার

নিস্তার নেই! ভগবান আছে মাথার ওপরে! কেঁদে বলি, আমাদের কথা ভাবো একবার—মাগছেলের কথা—পাগলামি করোনি। সে বলে সম্সারে কে কার? আমার পাপের ভাগ তুই নিবি? —ভোরবেলাই উঠে কোথা চলে গেল, ফিরলো অনেক বেলায় তাড়ি খেয়ে নেশায় চুর হয়ে! সেই এক বুলি, 'ওদের একশো টাকা দিলে আমার বেলা পঞ্চাশ—খুন করা অতো সহজ? ধরিয়ে দোব শালাকে—নিজের পাপেরও পরাচিত্তে হবে।' মিনষের কি আর জানের ভয়ডর আছে, ধরে রাখতে পারনুনিকো, জয়নদ্দির কাছে যেয়ে সব ফাঁস করে' দিলে!" —আনমনেই বলে যায় লক্ষ্মী, 'কোটেতেও মিন্‌ষে স্বীকার করলে, আর না করেই বা উপায় কি! সিন্ধুর পোঁতা 'নাস' তো ওই তুলে ছ্যালো। মিন্‌সে আমার নিজে গেল আর দু'কূল ভাসিয়েও গেল। এখন আমি মেয়েমানুষ হয়ে কি করি—কোথা যাই—কেমন করে' সব্বাইকে বাঁচাই!"

মালতী এবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলে শুধু একটানা। তার কষ্টে মায়ের বুক হু হু করে। সে যে মা সন্তানের এমন দুঃখ-লাঞ্ছনা কেমন করে' সইবে! মা মেয়েতে জড়াজড়ি করে' অনেকখন কাঁদে। কিন্তু বুকের ব্যথা-ভার এতোটুকুও কমে না।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় মালতী। মায়ের কথাই শুনবে সে। যে তাদের সংসার ভাসিয়েছে—তার জীবনটা নষ্ট করে' দিয়েছে—তাকে সে শেষ করবে—একদম শেষ!

পরদিন সন্ধ্যায় একটু সেজেগুজে তৈরি হয়েই তরবদির দোকানে যায় মালতী। পাড়ার লোক ঘৃণার চোখে তাকায়। বাপ যার জেলে পচছে 'ভাবোন' ঢ্যাখো তার! লজ্জাশরমের মাথা খেয়েছে একেবারে!

তরবদির একটু কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায় মালতী, বলে, "দাদা, একসের চাল দও, খিদেয় মরে যাচ্চি!"

তরবদি তাকায় ওর দিকে। বলে, "ভাগ কেটে পড় এখেন থেকে। তোর বাপ রোজগার করে' 'মাস্তা' বসিয়ে রেখে গ্যাচে বোধ হয় এখেনে?" বিরক্ত মেজাজে উঠে চলে যায় তরবদি সেখান থেকে।

দোকানে বসেছিল হরেন পাগলা। ওর মাথায় কে একটা ঠোঙার টুপি পরিয়ে দিয়েছে। পায়ে দিয়েছে শামুকখুলির নূপুর বেঁধে। হরেন একবার

মালতীর কর্কশ-কঠিন-হয়ে-ওঠা মুখখানার দিকে তাকায়। তারপর হঠাৎ চীৎকার করে' ডিগবাজি খেয়ে উঠে বুক চাপড়াতে শুরু করে পটাস্ পটাস শব্দে।

ব্যর্থমনস্কাম হয়ে মাথা হেঁট করে' বাড়ী ফিরে যায় মালতী।

আবার দোকানে এসে বসে তরবদি।

হরেন পায়ের কাছে শুয়ে পড়ে জিব দিয়ে তার পায়ের ধুলো চাটতে শুরু করে। সবাই হো হো করে' হাসে। বলে, "শালা হরেন পাগলার ব্যাভার ছাখ!"

তরবদিও হাসে খল্‌খল্ করে'। ওর ওপরে কেমন যেন একটু মায়া হয়। মুড়ি খেতে দেয় চাট্টি।

॥ ১৮ ॥

নতুন বছরের জন্যে নৌকো ঠিক করতে গেল জয়নদ্দি তারিণীদের বাড়ী। দু'খানা নৌকো জমা নেবে সে এবছর। টাকা রাখলে হাতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাবে পানির মতো। পাঁচ ছ'মাসের খোরাকী তো আছেই—যাহোক করে' চলে যাবে। আধাআধি বখরায় ভাগচাষের জমি নেবে না সে আর। কোনো লাভ নেই তাতে। খরচটাই যা ওঠে কোনোরকমে—তাও যদি ভাল ফসল ফলে তবে।

বারবাড়ীতে রোহিণীকে দেখে জয়নদ্দি বললে, "কিগো মা, জামাইবাবু কোথা?"

বিস্মিত হলো রোহিণী, বললে, "জামাইবাবু!"

হাসলে জয়নদ্দি। বসে পড়লো রকটার ওপরে। বললে, ' জানি মা জানি, গোপনে গোপনে তোমরা বে' করলে আর"…

"চুপ, চুপ, কাকা! বাবা শুনলে মুশ্‌কিল হয়ে যাবে এক্ষুনি। কাল দাদা অনেক করে' বুঝিয়েছে, তবু রেগে আগুন হয়ে আছেন।"

"তারিণী দাদাও বোকা দেখচি! আরে বাবা, 'যার সঙ্গে যার মজে মন কিবা হাড়ি কিবা ডোম!' ই-দিকে শালা বিয়ে শেষ, শুধু বলে কিনা ঘরকন্নাটাই বাকি—আর"...

হঠাৎ তারিণীকে এসে পড়তে দেখে জিব কাটে জয়নদ্দি।

তারিণী বলে, "কার বিয়ে শেষ জয়নদ্দি?"

জয়নদ্দি আপন মনে বার দুই নিজের কানে পাক খেয়ে বলে, "এই আমার মায়ের কথা বলচি দাদা।"

"তোমার মায়ের বিয়ে মানে? সে তো বুড়োমানুষ! তবে কি নিকে হলো নাকি?"

"হাঁ তারিণী-দাদা। মোদের ইস্কুলের মাস্টারের সাথে। একাকারে 'কোর্ট' থেকে পাকাপাকি দলিল করে'। মায়ের আমার বয়েস হয়েচে, লিজের মতে লিজেই সাদিটা করলে। কার বাপে এখন হটায়।"

"তুই কি বাজে বক্‌বক্‌ কচ্চিস্‌! তুইও কি হরেনের মতো পাগল হলি শেষটা?"

বিপদ বুঝে সরে পড়ে রোহিনী। লুকোয় গিয়ে দরজার আড়ালে।

মাথা নাড়ে জয়নদ্দি: "উঁহু! আর যাই হই, পাগল-হওয়া শালা আমার ধাতে সইবেনে। পাগল হয়েচ তুমি। একাবারে বদ্ধ পাগল। নিরেট পাগল। অন্ধ পাগল। হাজার বোঝালেও বুঝবেনে এমন পাগল!"—নিজের কথায় নিজেই হা হা করে' হেসে লুটিয়ে পড়ে জয়নদ্দি।

দুটো কাঁধ ধরে ওকে ঝাঁকাতে আরম্ভ করে তারিণী, "কি হয়েচে বলতে হবে। বল্‌—বল্‌—!"

"শানাই বাজনা শুনতে চাই দাদা! পোঁ—এঁ্যা—এঁ্যা—এঁ্যা—শানাই।"

"মানে?"

"বিয়ে।"

"কার?"

"তোমার সঙ্গে আমার। হে—হে হে!...দেখি মাথাটা ঠেণ্ডা আছে তো? বললে দম আটকাবেনে তো? রোহিনী মায়ের বিয়ে!"

—"রোহিনীর বিয়ে! কার সাথে?"

"হয়ে গ্যাচে। মাস্টারের সাথে। লেখাপড়া করে'। কোটের দলিলে 'ইস্‌ট্যামপো' মেরে। তুমি তো তুমি, ভগবানের বাবাতেও নড়চড় করতে পারবেনে।"

"এ্যা!" তারিণীকে কেউ যেন ঠেলা মেরে ফেলে দিলে অনেক উঁচু থেকে।

"ভয় নেই দাদা, সবুর। সমাজ, রতন বাবাজীর দিকে। তুমি বাগড়া না দিলেই আমরা প্যাট্ ভরে দুটি খেতে পাই।"

"বিধর্মীর ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে! রতন তার ষড়যন্ত্র করেচে?" —বসে পড়ে বলে তারিণী।

"ধর্মী-বিধর্মীর যুগ এটা লয় দাদা, সে তোমাদের সময় ছ্যালো। এখন কালের চাকা ঘুরে গ্যাচে। তোমাকেও সেই পাকে পড়ে ঘুরতে হবে যদ্দিন বাঁচো"...

তাড়া মারে তারিণী, "থাম্ তুই, আমাকে উপদেশ দিতে এইচিস্।"

"তৌবা—তৌবা!" কানমলা নাকমলা খায় জয়নদ্দি।

তারিণী উঠতে যায়। পা দুটো জড়িয়ে ধরে জয়নদ্দি। বলে, "না, বাড়ীর ভেতরে যেতে পারবেনে। রোহিণীকে তুমি মারবে।"

"ছাড়, তুই পা ছাড়।"—ঝোনা মেরে পা ছাড়াতে যায় তারিণী। বাবার মূর্তি দেখে ভয়ে দৌড় মারে রোহিণী দোরগোড়া ছেড়ে।

"না, কথা দও। শানাই আনবার হুকুম দও।"—দুটো পায়ে চেঁদে ধরে এবার জয়নদ্দি।

"মারবো বলচি।"—চেঁচিয়ে ওঠে তারিণী।

"মেরে ফ্যালো। তবু ছাড়বোনি। মাস্টার ভারি ভাললোক।" ভারি মনে ধরেছে জয়নদ্দির। বন্ধুত্ব হয়ে গেছে বলতে গেলে—তার মনের আশা মেটাবার আদিম আগ্রহ জয়নদ্দিকে পেয়ে বসেছে যেন।

হঠাৎ সেখানে এসে পৌঁছলো রতন আর প্রদীপ। আর ভেতর থেকে মন-ভার-করা রোহিণীকে টেনে আনে তার মা, মেয়েকে কি বলেছে তার কৈফিয়ত নেবার জন্যে।

সবাই অবাক। জয়নদ্দি এমন করে' পা জড়িয়ে ধরে বসে আছে কেন?

জয়নদ্দি ওদের দেখে ভরসা পেয়ে চ্যাঁচাতে থাকে "দও—দও—কথা দও ঐ অ্যাখো দু'জনের মুখের দিকে চেয়ে। কি সোন্দর! ওদের ভাল হবে।"

তারিণী তাকালে রোহিণীর মুখের দিকে। মাথা হেঁট করেছে সে। গোপনে অন্যায় একটা করেছে বটে কিন্তু কি গভীর শ্রদ্ধা! কি গভীর লজ্জা! প্রদীপের মুখের দিকে তাকায়। ভারি সুন্দর দেখতে ছেলেটাকে। মানাবে দু'জনকে। আর বিয়ে তো একরকম তাহলে হয়েই গেছে ওদের। লেখাপড়া শিখে কি বেপরোয়া—বদমাইস্ হয়েছে ছেলেমেয়েগুলো।

তাই সনকার টান অতো প্রদীপের দিকে? রোহিণীও ঘুর ঘুর করে' ফাঁক পেলেই যায় বাগানবাড়ীর দিকে? রতনই হলো এসবের কলকাঠি। আর এখন সে 'না' করলেও হয়তো একদিন পালিয়ে যাবে ওরা। রতনও চলে যাবে হয়তো। সে একলা পড়ে থাকবে এই শূন্য বাড়ীতে? সন্তানের চেয়ে সংস্কার বড় হবে?

আস্তে তারিণী বল্‌লে, "ছাড় জয়নদ্দি, পা ছাড়। বাপের কর্তব্য এখন তোরাই কর। তোদেরই জিৎ হোক। যা খুশী কর। তোদের নিজেদের মান তোরা ঢাক্‌তে চাস্ ঢাক্ আর না-ঢাক্‌তে চাস্ না-ঢাক্। আমার আর কি।"

ক্ষুব্ধমনে তারিণী চলে গেল বাড়ীর ভেতরে। রোহিণী আর প্রদীপ চোখাচোখি হতেই হাসলে দু'জনে।

জয়নদ্দি উঠে পড়ে। বলে, "যাক্ বাবা, বাঁচা গেল।...কি রতন বাবাজী, বোকার মতন দেঁড়িয়ে কেন গো—লোকজন ডাকো—শানাই বাজনা আনো"—

"আনবো কাকা!" খুশী হয়ে বলে রতন।

রোহিণী বলে, "বোসো কাকা, একটু চা-জলখাবার খাও।"

জয়নদ্দি সবলে মাথা নাড়ে, "উঁহু! সন্দেশ, রসগোল্লা, রাজভোগ"...

"বলে যাও চাচা—বলে যাও"—বলতে বলতে প্রদীপ ব্যাগ খুলে পাঁচখানা দশ টাকার নোট বার করে' ধরে তার সামনে।

"দও বাবা দও, বড্ড দরকার। আমার পাওনা ঘটকালির টাকা।" নোটগুলো নিয়ে জয়নদ্দি পাকের পর পাক মেরে খোঁসে নিজের ট্যাঁকে। বলে, "কানাইদের বাড়ী আজ তিনদিন তিনরাত ভাত হয়নে। তাদের এই টাকায়

শুক্‌টিমাছ কিনে ব্যাবসা করতে দোব। কানাইকে যে টাকাগুলো দিলে সেতো দারোগা ঝেড়ে দিলে সে-বেচারী না-বল্‌লে খুনটা গাপ্‌ হয়ে যেতো।"

রতন খুশী হয়ে বলে, "আচ্ছা, বেশ বেশ।—যাও, শানাইওয়ালাদের ডেকে আনো।"

জয়নদ্দি চলে এলো বাড়ীতে।

কানাইয়ের বৌকে ডেকে বল্‌লে, "এই পঞ্চাশ টাকার 'শুকো' কিম্বা ধান কিনে দিলে তুমি ব্যাবসা করে' সংসার চালাতে পারবে বৌদি ?"

কিছু বুঝতে না পেরে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলো লক্ষ্মী। চোখ মুখ তার কোটরে ঢুকে গেছে। কাহিল শরীর। দাঁড়াতে পারেনা—ধপ্‌ করে' বসে পড়ে। শকিনা একটা বস্তা পেতে দেয় বসবার। ভাল করে' সমস্তটা বুঝিয়ে দিতে কেঁদে পায়ে জড়িয়ে ধরতে গেল লক্ষ্মী জয়নদ্দির। টাকাগুলো দিয়ে দিলে জয়নদ্দি। এতোটুকুও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা লোভ নেই তার মনে। শকিনাও মুগ্ধ হয় স্বামীর এই উদারতায়।

কি মন গেল নোটগুলো ফিরিয়ে দিলে লক্ষ্মী, বল্‌লে, "আমার কাছে থাকলে কোথা কি হয়ে যাবে, তুমিই রাখো ঠাকুর-পো, যা কিনতে হয় কিনে দিয়ো। এখন আমাকে গোটা দুই টাকা দও, চাল কিনে আনি, বুড়ো শ্বশুরটা কাঁদচে খিদেয়। ছেলেমেয়েগুলোও মরে যাচে।"—লক্ষ্মীর মনে তবু নানান কিছু সন্দেহ ঘুরপাক্‌ খায়। ওগুলো কি সত্যিই টাকা! চুরির মাল বলে পুলিশ দিয়ে ধরাবেনা তো আবার! নাও যদি হয় তবে? তার ওপরে লোভ? হাসি পায় লক্ষ্মীর। কি আছে তার শরীরে? তাছাড়া জয়নদ্দি সেধরনের লোকও নয়। ওর বৌটা দু'বেলা খেতে পায়—গায়ে গতরে আছে—দেখতেও তার চাইতে ঢের ভাল। মোটে একছেলের মা।…ছেলেমেয়েগুলো কাঁদছে খিদের জ্বালায়। …যত হীনকাজই হোক, এরপর তাকে করতে হতো—হাঁ করতেই হতো পেটের জ্বালায়—পেট যে কাল…কিন্তু ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছে! জয়নদ্দি তোমার ভাল হবে…মনে মনে আশীর্বাদ করে ক্ষুন্নিকাতর লক্ষ্মী।

দুটো টাকা দিলে জয়নদ্দি, ঘর থেকে বার করে' এনে।

শকিনা সভয়ে বললে, "আর মালতীর দশা কি হবে ?"

"আরে ও কুনো ভয় নেই। রূপোর মাকে বললে কালই ঠিক করে' দেবে।

দুটো টাকার ব্যাপার! কালসাপের বাচ্চা প্যাটে পুষে রাখাই পাপ!—চলি এখন আমি, রোহিণীর বিয়ের বাজনা ভাড়া করে' আনি।"

"কার সাথে গো? শোনো শোনো!"—ডাকে শকিনা।

"সেই মাস্টার প্রদীপ আনোয়ারের সাথে।"

"হিঁদু না মোচোনমান?"

"দুই-ই। মানুষ—মানুষ—মানুষ!" বলতে বলতে গায়ের জামাটা কাঁধে ফেলে জয়নদ্দি বেরিয়ে যায় বাড়ী থেকে।

ফিরতে তার বিকেল হলো।

পরেশদের নিয়ে বাঁশ কেটে মঞ্চ বেঁধে দিয়ে তবে এলো জয়নদ্দি।

কাল লগ্ন আছে বিয়ের।

আজ থেকে বাজতে থাকুক্ শানাই। সারারাত মধুর সুরের ইন্দ্রজাল রচনা হোক্ আকাশে বাতাসে আর নবদম্পতির মনে। ওরা সুখী হোক্—দুনিয়ার সবাই—সবাই সুখী হোক্।

জয়নদ্দির মনে আজ বড় সুখ! আনন্দ উছলে পড়তে চায় যেন। কেন তা কে জানে! শকিনাকে আজ খুশী করবে সে।

সন্ধ্যার সময় টাকা নিয়ে চলে গেল বাখরার হাটে। সেখানের বেনেদোকান থেকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে একজোড়া সোনার পারশি মাক্‌ড়ি কিনে এনে পরিয়ে দিলে শকিনার দুটো কানে। খুশীতে আনন্দে স্বামীর বুকের মধ্যে মুখ গুঁজলে শকিনা। পুলকে ভরে উঠলো তার দেহমন। কিন্তু তাই বলে শকিনা অতো স্বার্থপর নয়, সুরেলা গলায় বল্‌লে, "মায়ের জন্যে কিছু আন্‌লেনে?"

জয়নদ্দি হেসে বলে, "এনিচি বইকি! এই যে, কাপড়।" দু'পকেট থেকে দুটো কাপড়ের প্যাকেট টেনে টেনে বার করে জয়নদ্দি। মায়ের থান কাপড়, শকিনার ডুরে শাড়ী আর খোকার লাল পাত্‌লুন। শকিনা খুশীতে যেন হতবাক্ হয়ে যায়। কিন্তু তবু বলে, "আর তোমার?"

জয়নদ্দি ওকে ধরে একটু সোহাগের অত্যাচার করে' নিয়ে বলে, "আমার আবার কি! তোমাদের হলেই আমার হলো। লও, পেঁদো শাড়ীটা—দেখি, কেমন ম্যাথায়।" লজ্জা করে শকিনার। তবু পরে শাড়ীটা। জয়নদ্দি যেন

বোকা হয়ে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। শকিনা হাসে মিট্ মিট্ করে'।

জয়নদ্দি বলে, "খুব ভাল দেখিয়েচে! যেন বেয়ের নতুন কনে!"

শকিনা স্বামীকে অনুরাগের আলিঙ্গনে বেঁধে বলে, "দুষ্টুমি!...চলো ভাত খাবে চলো—রাত হয়েচে।"

নতুন কাপড় পেয়ে খুব খুশী হয় জয়নদ্দির মা। কতো কথা বলে।

খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়ে পড়ে ওরা।

রাত বেড়ে চলে।

খরিশ কেউটের ডাক শোনা যায়: কররররর—কর কর কর—কররররর...

হঠাৎ অনেক রাত্রে লোকজনের হাঁকাহাঁকি শুনে ঘুম ভেঙে গেল জয়নদ্দির। উঠে পড়ে ছুটে বাইরে এলো। হেঁকে জিজ্ঞেস করলে, "কি হয়েচে রে—কি হয়েচে, ও রূপো?"

"তরবদি খুন হয়েছে!"

"খুন! কে করলে রে? বেঁচে আছে তো—না, মরে গ্যাচে?"

"হরেন পাগলা নাকি! একেবারে সাবাড়! নাড়ীভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে।" কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসে রূপো।

"হরেন! সে তো পাগলা? কোথা সে?" শুধোয় জয়নদ্দি।

"সে বসে রয়েছে। বেঁধে রেখেছে।...বাইরে বেরিয়েছিল নাকি তরবদি। তারপর একটা চীৎকার। লোকজন ছুটে এসে ত্যাখে হরেন পাগলা তাকে জড়িয়ে ধরে আঁউ-আঁউ করছে। ছুরিটুরি পাওয়া যায়নি তার কাছে। রক্ত মেখে লালে লাল দু'জনে। নাড়ীভুঁড়ি বেরিয়ে পড়ে তক্ষুনি সাবাড় হয়ে গ্যাছে নাকি তরবদি। তার বৌ বলে রাত দশটার সময় গরুর কাছে ধোঁ' দিতে যেয়ে দেখেছি ঐ হরেন পাগলা গোয়ালের পাশে পড়ে নাক ডাকিয়ে ঘুম দিচ্ছিল—ওরই কাজ। বাঁধো, ওকে মারো—মেরে, মেরে ফ্যালো! ওর বৌকে খুন

করিয়েছিল বলে সেই রাগে পাগলা সেজে থেকে থেকে আজ খুন করেছে! ওঃ! তরবদির বৌ সে কী 'পেরলয়' কাণ্ড করছে! বাঘা মেয়ে বাবা! আর হরেন শুধু গোঁ গোঁ—আঁউ আঁউ শব্দ করছে।"

জয়নদ্দি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে, "যাক্, গেরামটা ঠেণ্ডা হলো! কিন্তু হরেন তো পাগলা! সে মারবে কি করে'? কেউ মেরে পালিয়েচে আর হঠাৎ চীচ্কার শুনে পাগলা দিশেহারা হয়ে যেয়ে জড়িয়ে ধরেচে হয়তো! আর হরেন খুন করলে তো পালাতো?"

"কে জানে বাবা, সবাই তো জানে পাগলা বলে। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে না চাপে।"—বল্লে রূপো।

"তরবদি করো নাম বলে যেতে পারেনে?" চিন্তিত হয়ে শুধোয় জয়নদ্দি।

"না। একেবারে লট্কা মুরগি ঝট্কা, তক্ষুনি সাবাড় যে! কম ছুরি চালিয়েছে!"

মা আর শকিনাকে বাড়ী যেতে বলে' জয়নদ্দি বলে রূপোকে, "চল্—দেখে আসি। হরেনকে নিয়ে আবার কি বিপদ রে বাবা—এ্যা!"

আবার গেল রূপো জয়নদ্দির সঙ্গে। সারা পাড়ার লোক জড়ো হয়েছে সেখানে।

হরেন জয়নদ্দিকে দেখে চুপ করে' তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো কতকখন। তারপর হা হা করে' হেসে উঠে দড়ি বাঁধা অবস্থায় ডিগ্বাজি খেলে একটা।

জয়নদ্দি বললে, "হরেন পাগলার এই কাজ! কে বাঁধলে ওকে?"

একজন বলে, "তরবদিকে ঐ তো জড়িয়ে ধরে ছ্যালো। বাঁধবে তকে কাকে, তোমাকে না আমাকে?"

জয়নদ্দি আর কোনোকথা বলে না।

প্রেসিডেন্ট এলেন। চৌকিদার গিয়ে থানার দারোগা-পুলিশ নিয়ে এলো।

তরবদির রক্তমাখা লাসটা চাপা দেওয়া আছে। একজন কাপড় খুলে ছাখালে।

ইস্! কি ভয়ংকর! ঘেন্নায় গা ঘুরে বমি উঠে আসে বুঝি! দারোগা

সমস্ত দেখে নিয়ে হরেনকে পিট্‌তে থাকলে সে দুর্বোধ্য ভাষায় আঁউ-আঁউ করতে লাগলো শুধু। বাঁধলে তাকে ভালো করে'।

জয়নদ্দির চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। তার অনেকদিনের সঙ্গী। ছেলেবেলার খেলার সাথী। যৌবনের সহকর্মী। তার আজ এই দশা হলো! পুলিশ তাকে নির্মমভাবে মারছে। জয়নদ্দি ভেবে পায়না, হরেন পালালো না কেন!...

তারিণী এলো। রতনও এলো।

দারোগার প্রশ্নে অনেকেই হরেনকে পাগল বলে জানে বলে সাক্ষ্য দিলে। বল্‌লে এখানেই তরবদির দোকানে পড়ে থাকতো সব সময়।

তরবদির বৌ-ছেলে-মেয়ে সব হাহাকার করে' কাঁদ্‌ছে।

লাস তুলে নিয়ে হরেনকে পাকড়াও করে' বেঁধে নিয়ে চলে গেল দারোগারা।

তারিণীও চলে গেল কোনো কথা না বলে।

রতন বল্‌লে, "ঠেলা সামলাও!—চলি খুড়ো। সকালে এসো।"

চলে এলো জয়নদ্দি।

ভোর হয়ে গেল।

একটু পরেই রক্তকরোজ্জ্বল সূর্য উঠলো পুবের আকাশ জুড়ে।

রোহিণীর বিয়ের শানাই বাজছে আজ। চল্‌লো জয়নদ্দি সেদিকে—চোখের পানি মুছতে মুছতে। সিন্ধু হরেন সবাই ভেসে গেল। শুধু ঐ তরবদির জন্যে। যাক্—শয়তানটা যে গেল তাতেই মহাশান্তি। ইলিশ মারির চরের মাটির বুক তবু ঠাণ্ডা হলো।

রতনদের বাড়ী আসতে জয়নদ্দিকে দেখে প্রদীপ মহাউল্লাসে বল্‌লে, "সুস্বাগতম্ চাচাসাহেব।"

জয়নদ্দি হেসে বল্‌লে, "ঠাট্টা হচ্চে বাবাজী! জেলে বলে' কি মানুষ নয়? তবে জেলের মেয়ের রূপে যে ভুল্‌লে?"

প্রদীপ হেসে বল্‌লে, "রোহিণী হলো মৎস্যগন্ধা। ওকে আমি পদ্মগন্ধা করে' নিলাম।"

জয়নদ্দি গল্পটা জানতো। শুনেছিল বিনয় সরদার তরজাওয়ালার কাছে।

বললে, "যাও বাবা, মনের সুখে পাণ্ডব বংশের উৎপত্তি করো যেয়ে। দেখো, খবরদার যেন কুরু বংশের দুর্যোধন তৈরি করোনিকো। তাহালে তার সঙ্গে আবার আমাদের লড়তে লড়তে জীবন যাবে।"

"সাবাস চাচা সাবাস!" জয়নদ্দিকে জড়িয়ে ধরে প্রদীপ।

জয়নদ্দি এতোখানি ছেলেমানুষি পছন্দ করে না। তাই তাকে ছেলে-মানুষের মতোই দু'চার পাক্ ঘুরিয়ে ছেড়ে দেয়। লজ্জা পায় প্রদীপ।...

তারপর সেখানে রতন এলে তার দুটো হাতে চেপে ধরে জয়নদ্দি। আবেগ কাতর কণ্ঠে কান্নাভাঙা গলায় বলে, "বাবাজী, হরেনকে বাঁচাতেই হবে। তাকে না বাঁচাতে পারলে আমি মরে যাবো!"

রতন হতবুদ্ধি মেরে যায়। বলে, "আমি কি করবো কাকা! আমি ছেলেমানুষ, আইনকানুনের কি বুঝি!"

রূঢ় হয়ে ওঠে জয়নদ্দি হঠাৎ অবুঝের মতো: "বোঝনি? তবে বি-এ পাশ করেচ কি করতে?"—আসল জেলের চেহারা বেরিয়ে পড়ে যেন জয়নদ্দির।

আম্‌তা আম্‌তা করে প্রথমে রতন। তারপর সাম্‌লে নিয়ে বলে, "বাবার কাছে যাও কাকা, তাঁর এসব বিষয়ে পাকা বুদ্ধি। কি করতে হবে না হবে সব বলে দেবেন।"

প্রায় ছুটেই যেন অন্দরের মধ্যে গেল জয়নদ্দি। তারিণীর পায়ে জড়িয়ে ধরলে গিয়ে। তারিণী ভয়েই লাফ্ মেরে ওঠে প্রথমে।

জয়নদ্দি বলে, "তোমার ভগবানের দোহাই দাদা, আমাদের রক্ষে করো।"

তারিণী তাকে টেনে তুলে বলে, "কি হয়েচে খুলে বল্, অমন করে' পায়ে জড়িয়ে ধরিস্ কেন?"

রোহিণী আর তার মাকে অবাক্ হয়ে এগিয়ে আসতে দেখে জয়নদ্দি তারিণীর হাত ধরে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে বলে, "হরেনকে বাঁচাতে হবে।"

তারিণী অবাক্ হয়ে বলে, "তার আমি কি করবো!"

রতনও এসে পড়ে। জয়নদ্দি বলে, "তুমি না পারলে, কেউ পারবেনে।"

তারিণী ভাবে কিছুক্ষণ। মাথা নাড়ে। না, অসম্ভব।

জয়নদ্দি বলে, "হরেন, পাগল-লোক ছ্যালো। তয়বদ্দির ওখেনে পড়ে

থাকতো, চীচ্‌কার শুনে দৌড়ে যেয়ে জড়িয়ে ধরেছ্যালো তরবদিকে। সাক্ষীরা তার বেশী খুন করতে কেউ ত্থাখেনিতো!"

তারিণী বলে, "হরেন যদি পাগল সাব্যস্ত হয় তবে তো। সে যে জড়িয়ে ধরে ছ্যালো। অনেক ঝামেলা রে ভাই! অনেক টাকাপয়সা খরচের ব্যাপার।"

"যেতই ঝামেলা হোক্‌, যেতই টাকাপয়সা যাক্—তোমাকে ই-কাজ করতেই হবে। আর, কি হবে তোমার এ্যাতো টাকাপয়সা? কার জন্যে? রতন বাবাজীর জন্যে? সেকি লেখাপড়া শেখেনে? জাল-নৌকো নেই? কতো যাবে? দু'হাজার? সব দিতে হবে তোমাকে। নাহলে আমি কি করবো জানো?"

জয়নদ্দি ভয়ংকর মূর্তি ধরে রুখে দাঁড়িয়ে ত্থাখায় তার সর্বনেশে হাবভাবটা। বলে কর্কশ কণ্ঠে, "তোমাকে আমি ঐ তরবদির মতন আষ্টেপিষ্টে ছুরি মেরে ভুঁড়ি চাক্‌ করে' দিয়ে ফাঁসিতে যাবো! জানের দয়া মায়া নেই আমার!"

শিউরে ওঠে তারিণী। স্তম্ভিত হয় রতন।

কিন্তু জয়নদ্দি আবার পায়ে জড়িয়ে ধরে তারিণীর। কাঁদতে কাঁদতে বলে, "দাদা! আমার দাদা! তুমি হরেনকে বাঁচাও। সে আমার মায়ের প্যাটের ভায়ের চেয়েও বড়। আমার বন্ধু। আমার ছেলেবেলার সাথী। তার কুনো অন্যায় নেই। আমিই তাকে যুক্তি দিয়েছেনু তরবদিকে খুন করবার জন্যে। হরেনের জানের দায়িক যে আমি। জেল হয় হোক্, জানটা যেন বেঁচিয়ে ফিরতে পারে।"

তারিণী দেখলে রতনের চোখ দুটো ছলছল্‌ করছে। তাই আর সইতে না পেরে বল্‌লে, "ওঠ্‌ জয়নদ্দি। আজ একটা শুভদিনে চোখের জল ফেলে তোরা অমঙ্গল ডেকে আনিস্‌নি। যা কথা দিচ্চি আমি, যেত টাকা লাগে সে অভাগাকে বাঁচাতে, দোব আমি। আমার সর্বস্ব পণ তার জন্যে।"

হো হো করে' পাগলের মতন কেঁদে উঠলো আবার জয়নদ্দি। আনন্দের আবেগ সাম্‌লাতে পারছে না সে।

রতন বেরিয়ে গেল সেখান থেকে। বুঝলে সে, জয়নদ্দি খুব বিচলিত হয়ে পড়েছে, মারের ধমকে যদি তার নামটা বলে ফ্যালে হরেন!

তারিণী জয়নদ্দির হাত ধরে তাকে টেনে তুলে নিয়ে বাইরে আসে।

চোখ মোছে জয়নদ্দি। ভাখে, দেবীমূর্তির মতো তার দিকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রোহিণী। জয়নদ্দির চোখ দুটো জুড়িয়ে গেল সে মূর্তি দেখে। মা বলে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে হলো তার রোহিণীকে।

তার মনের সব কথাই বোধ হয় বুঝতে পারলে রোহিণী। হেসে বল্‌লে, "আজ যে তোমার মায়ের বিয়ে কাকা! আমাকে মিষ্টি খাওয়াবে না?"

হাসলে জয়নদ্দি। ধরা গলায় বল্‌লে, "খাওয়াবো বৈকি মা! বিয়েটা আগে হোক্। কেমতন্ন-বাড়ীতে এসে আগেই হাঁ হাঁ করলে লোকেই বা কি বলবে মা!"

হেসে উঠলো রোহিণী। সুখের আনন্দে পাগল যেন আজ সে।

থালায় করে' মিষ্টি এনে জয়নদ্দির সামনে ধরলে রোহিণীর মা। বল্‌লে, "খাও ঠাকুরপো,—বসো। মেয়ের বেয়েতে শানাই বাজনা এনে দিয়েচ মিষ্টি খাবার লোভে। খাও এবারে খুব কষে।"

হঠাৎ জয়নদ্দি আকস্মিকভাবেই ভীষণ জোরে চীৎকার করে' উঠলো:

"তা বলে' এ্যাতো— !"

চম্‌কে গিয়ে রোহিণীর মায়ের হাত থেকে আচম্‌কা থালাটা পড়ে গেল সশব্দে ঝনাৎ করে'।

অট্টহাস্যে ফেটে পড়লো সকলে।

রোহিণীর মা গাল দিয়ে উঠলো চোখ পাকিয়ে, "দূর মুখপুড়ুনে কোথাকার!"

জলখাবার খেয়ে পান চিবোতে চিবোতে বাইরে চলে এলো জয়নদ্দি!

চারদিক থেকে লোকজন আসছে তাদের ইলিশ মারির চরের। রূপোর বোনটা জয়নদ্দির খোকাকে এনেছে সাজিয়ে গুজিয়ে। তাকে কাঁধে তুলে নেয় জয়নদ্দি। ঘোরায় চারদিকে। ভাখায় এটা সেটা। ছেলেটা হাত তুলে নহবৎখানাটা দেখিয়ে বলে, "উ-ই!"

জয়নদ্দি অবাক হয়ে তাকায়। বলে, "হাঁ, বাজনা। তোমার বেয়েতেও ঐ রকম বাজবে।" রতনের বন্ধু-বান্ধবরা এলো। হৈ হল্লা নাচগান জুড়ে দিলে তারা।

বিকালের দিকে প্রদীপের আত্মীয়রা এলো মোটর হাঁকিয়ে। রূপের বন্যায় ইলিশ মারির চর ভাসিয়ে দিলে কয়েকটি মেয়ে। আর প্রদীপের মায়ের শাড়ীখানার ক'হাজার টাকা দাম হতে পারে তাই নিয়ে অনেকেই জল্পনা করতে লাগলো।

মন্ত্রপাঠ শুভদৃষ্টি মালাবদল বিয়ের সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা সাঙ্গ হয়ে গেল রাত্রে।

খাওয়াদাওয়া সেরে জয়নদ্দির বাড়ী ফিরতে ভোর হয়ে গেল। ভাবলে সে, যাক্, দুটি জীবন ওরা সুখী হলো তবু।

॥ ১৯ ॥

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে করতে মামলার দিন এলো অবশেষে।

ভাল উকিল দিলে তারিণী।

ছোট আদালতে মাত্র দু'কোর্ট মামলা হবার পরই সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী, দারোগার রিপোর্ট আর হরেনের ভাবভাবের প্রমাণ দেখে জজ সাহেব বেকসুর খালাস করে' দিলেন হরেনকে 'পাগল' বলে!

তারিণী আর জয়নদ্দি নিয়ে এলো তাকে সঙ্গে করে'।

বাইরে এসে হরেন হাসলে একটু।

তারিণী বলে, "হাসিস্‌নি শূয়ার এক্ষুনি! ফের বিপদ ঘটাবি? দিন কতেক পাগলামো করে' যা এখনো। জয়নদ্দি, ওর মাথায় খালি এখন তেল ঢাল—ছোপ লাগা 'ঘিৎকুমারী'র (ঘৃত কুমারী)। তারপর দিনকতেক পরে সেরে উঠুক ধীরে ধীরে। আচ্ছা পাগল সেজেছ্যালো—আমিও ধরতে পারিনি।"—হাসে তারিণী।

হরেন বলে, "উঃ! বড্ড কষ্ট হয়েচে দাদা। মাঝে মাঝে মনে হতো হয়তো পাগলাই হয়ে গেচি। বারেক বুদ্ধি করে' ছুরিটা ফেঁকে ফেলে দিয়েছেনু পুকুরে।...একদিন তো ওদের সামনে হেগে গায়ে মেখে গন্ধে মরে যাই! হাজতে

শালারা সদাই লক্ষ্য রাখতো আগুন দিয়ে ছ্যাকা দিয়ে দিয়ে গা-হাত কি করেচে ছাখো না !”

তারিণী বলে, “সাক্ষীদের সবাইকে, ‘পাগল ছিল’ বলাতে আমারও কিছু গ্যাচে রে ! শুধু পাগলামি করেই কি বেঁচে গেচিস্ ? যাক্ তোর বাহাদুরী হলো বদমাইসকে মেরে শেষ ক'রিচিস্ । তোর বৌয়ের আত্মাটা এ্যাদ্দিনে শান্তি পেলে । এ্যাদ্দিনে ঠিক বিচার হলো ।”

ওরা তিনজনে ই'লশ মারির চরে নামলো নৌকো থেকে ।

মাল্লামাঝিরা ভিড় করে' ধরলে তাদের ।

পাগলামি শুরু করে' দেয় হরেন ।

তারা সবাই হাসে । অনেকেই অনুমান করেছে বোধ হয় ও পাগল নয় ।

তারিণী অন্যদিক দিয়ে চলে গেল বাড়ীতে ।

হঠাৎ শুয়ে পড়লো হরেন । চলবে না সে আর । তার মুখের ভঙ্গি দেখে হাসি পায় সকলের ।

জয়নদ্দি তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে আসে তরবদিদের বাড়ীর সামনে দিয়ে । হরেন পাগলা নানান শব্দ আর ভঙ্গি করে' দুর্বোধ্য ভাষায় গান ধরে চেঁচিয়ে ; আর মাথায় চাপড়াতে থাকে জয়নদ্দির ।

হৈ হৈ করে' ছেলেমেয়ের দল জোটে তাদের পেছনে ।

মালতীর মা লক্ষ্মী শাঁখ বাজাতে আরম্ভ করে ।

শকিনা ঘড়াভরা পানি এনে ঢেলে দেয় হরেনের মাথায় ।

বলে, “মাথা ঠেণ্ডা করো বেই, তবে আবার ঘরসংসার হবে তোমার ।”

উঠোনের কাদায় গড়াগড়ি খায় হরেন । সত্যিই সে পাগল হলো এতোদিনে !

॥ ২০ ॥

পরদিন ভোর না হতেই শকিনা ডেকে তুলে দিলে জয়নদ্দিকে ।

জয়নদ্দির মা বললে, “আল্লার নাম নিয়ে—বাবা বদরগাজির পায়ে

সালাম করে' যা বাবা, জালে যা ! লোকজন এয়েচে তোর। আজ ইলিশের পয়লা জাল—দুটো নৌকো লিইচিস্—এট্টু বুঝ্ সমুঝ করে' চলিস। নেশা-ভাঁং করে' মারামারি করিস্নি যেন সব।"

মায়ের পায়ে সালাম করে জাল কাঁধে নিয়ে বেরুলো জয়নদ্দিরা। পাঁচজন লোক আজ তার দুটো নৌকোয় খাটবে। ছোটোখাটো মহাজন হয়েছে সে আজ। তাই একটু বুঝেসমঝে চলতে হবে। ভাল ব্যবহার করতে হবে সকলের সঙ্গে। তাদের সুখদুঃখের পানে তাকাতে হবে নিজের সুখ দুঃখের মতোই। তবেই তো মানুষ।

দুটো নৌকোর কাছিই খুলে দিলে জয়নদ্দি। জাল তুলে দিয়ে নৌকোয় সালাম করে' উঠে পড়লো তার মাল্লামাঝিরা।

জয়নদ্দি নৌকায় উঠে আশ্চর্য হয়ে দেখলে তাদের ইলিশ মারির চরের সবুজ গাছপালার মাথার ওপরে দূর পূবদিগন্ত রক্তিম আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে উঠছে নতুন দিনের সূর্য। আর তারই অল্প অল্প আলো এসে পড়ে নাচছে হুগলী নদীর জোয়ারভরা তরঙ্গমুখর ঢেউগুলির মাথায়।

অপূর্ব !

উজান-বেয়ে-চলা নৌকোর দাঁড় পড়ছে ঝপাৎ ঝপাৎ শব্দে।

কল্‌কল্ ছল্‌ছল্ শব্দ চারদিকে।

চরের ধারে ধারে বনঝোপ, ফণীমনসার ঝাড়, খেজুরকুঞ্জ, নলখাগড়া, হুরকোচ, তে-কাঁটাল আর শরখড়ির একটানা সবুজ রেখা। পশ্চিমদিগন্তের বুক জুড়ে থরে থরে পর্বতচূড়ার মতো জমে উঠেছে বৃষ্টিভরা কালো মেঘ। নদীর পানিতে পড়েছে তার প্রতিবিম্ব।

অপূর্ব। অপূর্ব লাগে আজ জয়নদ্দির সব কিছু।

নলদাঁড়ি পর্যন্ত গিয়ে জাল নামায় তারা। তারপর জোয়ারের অনুকূল টানে ভেসে আসতে থাকে। ইলিশমারি পর্যন্ত পৌঁছতেই বৃষ্টি এলো ঝিম্‌ঝিমিয়ে। তার সঙ্গে টানা ঝোড়ো হাওয়া। কিন্তু পুবআকাশে সূর্যের মুখ ঢাকতে পারেনি তখনো মেঘ। অপূর্ব সে দৃশ্য !

ঝড়—বৃষ্টি—রোদ ! অপূর্ব !

এমন তো কোনোদিন মনে হয়নি জয়নদ্দির। চিরচেনা ছবি।

আর সেই চিরচেনা মেয়েমানুষটা আজ যেন নতুন হয়ে ওঠেনি? শকিনা? অচেনা নতুন এক মধুরসে ভরে ওঠেনি তার মনপ্রাণ দেহযৌবন? ভোরবেলা গাহাত ধুয়ে এসে যখন নামাজ পড়ছিল বসে বসে একমনে, জয়নদ্দি ঘুমের ভান করে' ওড়ে থেকে সেই যে দৃশ্যটা দেখে এসেছে, ঘরের নানান-কাজে-পাগল-হয়ে-থাকা মলিন-কাপড়-পরা জেলে-বৌ শকিনার সঙ্গে সেছবির তো কোনো মিল নেই! অথচ কতো সহজ কতো সত্য তা। প্রতিদিনের জীবনের মধ্যেই একটু পবিত্র হয়ে বাঁচা—নতুন হয়ে বাঁচা। হোকনা সে জেলে ডোম কিংবা মুচি মেথর।...

শকিনা! অচেনা নতুন এক মধুরসে ভরে উঠেছে তার মন প্রাণ দেহ যৌবন!...

নাকি, জয়নদ্দিই মরে গেছে তার আগের সেই জীবন থেকে? আবার নতুন করে' জন্মাচ্ছে সে? কাঠ ফেটে বেরুচ্ছে একটা কুসুম-কুঁড়ি। সে ফুল যখন পরিপূর্ণভাবে ফুটে উঠবে ইলিশ মারির সমস্ত মানুষের বুক ভরে যাবে তার সুমধুর গন্ধে।

জয়নদ্দি ভাবে, আজ তার কেউ শত্রু নেই—সবাই বন্ধু - মহা অপরাধী যে তাকেও ক্ষমা করতে পারে সে আজ।

কিন্তু শকিনা যে গতরাত্রে তার গলা জড়িয়ে ধরে অতো করে' বললে, "ওগো তুমি আমাকে বাপের বাড়ী যেতে দও—মোটে দিন সাতেকের জন্যে"—জয়নদ্দি কি মত্ দিতে পেরেছে?

বলেছে, "না। তোকে ফেলে একলা আমি থাকৃতে পারবোনি। সাগরে যেয়ে কুম ভোগান্তিতে মরিচি—আবার সেই!"

তবু শকিনা নাকি সুরে অনুনয় করেছে, "হঁা, মোটে দিন সাতেকের জন্যে!..."

"না—না—না। একদিনের জন্যেও লয়। আমার খুব কষ্ট হবে। আমি পাগল হয়ে যাবো।"

শকিনার বুক ভরে উঠেছে তার স্বামীর এই ভালবাসায়। ভুলে গেছে সে বাপের বাড়ীর কথা।

হাসি পায় জয়নদ্দির। একটু অভিনয় না করলে কি মেয়েরা সন্তুষ্ট

হয় ?…আর সে দেখেছে, জগতে সবাই—সকলেই ভালবাসার কাঙাল। সত্যি, ভালবাসা না পেলে বাঁচবে কি নিয়ে মানুষ! বাঁচবে কি করে' জয়নদ্দি, শকিনার ভালবাসা না পেলে ?

আবার চেপে এলো বৃষ্টিটা।

আনন্দের উল্লাসে গান ধরলে জয়নদ্দি তারস্বরে ঝোড়ো হাওয়ার দোলায় দীর্ঘায়িত সুরের লহরা লীলায়িত করে':

"আমি যদি পাখী হইতাম রে—
তোরে লয়ে যাইতাম রে ভিন দেশে।
হাড় কালো হইল আমার তোরে ভালবেসে।
তোরে ভালবেসে রে—তোরে ভালবেসে ॥"…

মহাফুর্তিতে চীৎকার করে' উঠলো কাশেমরা: "দারয়ার পাঁচপীর, বদর বদর।"

সমাপ্ত